বাংলা

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা

বহুমাত্রিক চেতনায়

মেদিনীপুর সিটি কলেজ ও দি গৌরী কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত
সপ্তম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে নির্বাচিত গবেষণা প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ

১

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল ● দীপঙ্কর মল্লিক
রাকেশ জানা ● অভি কোলে

দিয়া পাবলিকেশন
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

Bangla Samaj-Sanskriti-Sahityacharcha : Bahumatrik Chetanay

Vol. I

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik
Rakesh Jana ● Abhi Kole

Published by

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com ‖ diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

Collaboration with

Midnapore city college
Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Pachim Medinipur
&
The Gouri Cultural & Educational Association
Social Welfare Organisation & Research Institution of
Society, Culture & Education
Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

ISBN : 978-93-87003-46-0

প্রথম প্রকাশ : ২.০৬.২০২৩

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৪৯৯/-

সূ | চি | প | ত্র

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ১-৮১

চর্যাপদে নারী-ভাবনা : সমকালীন সমাজে নারীর স্থান ও ভূমিকা
বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আলোচনা
লুসী মণ্ডল
১

নন্দনতত্ত্বের আলোকে বৈষ্ণব পদাবলী
দীপঙ্কর মল্লিক
৭

সমাজ-দর্শন-ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্বিতীয় যুগনায়ক : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
গীতিকা পণ্ডা
১৯

নবজন্মতত্ত্বে 'লোকপুরাণ' : মনসামঙ্গালকেন্দ্রিক নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য
সৃজন দে সরকার
২৭

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' : প্রসঙ্গ শৈলীগত অনুধাবন
সন্দীপ দাস
৩১

ধর্ম সমন্বয়ের কাল ও চিহ্ন : প্রসঙ্গাত দক্ষিণ রায় ও গাজি খাঁ'র আখ্যান
অরিন্দম অধিকারী
৩৮

মহুয়া গীতিকা : পাঠকের পাঠপ্রতিক্রিয়ায়
বৈশাখী পাঠক
৪৫

মৈমনসিংহ গীতিকায় উল্লিখিত মধ্যযুগের অলংকার : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ
অজয় কুমার দাস
৫০

কবিগানে বৈষ্ণব ভাবনা : একটি পর্যালোচনা
সুবীর ঘোষ
৬০

বস্তুবাদ ও দেহবাদ : প্রসঙ্গ বাউল গান
অন্তরা ব্যানার্জি
৬৮

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ
আকবর আলি শাহ
৭৩

বাংলা সাহিত্যচর্চা : বহুমাত্রিক চেতনায় অনুবাদ সাহিত্য
শিপ্রা ভট্টাচার্য
৭৮

লোকসাহিত্য..... **৮২-১৬০**

বাঙালি-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা
মকর মুর্মূ
৮২

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে লাঠিখেলা
দয়াল চাঁদ সরদার
৮৮

ছড়ার রূপ ও রূপান্তর
রাজু ভুঁই
৯৬

ব্রতকথা : নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে
অর্জুন কুমার দাস
১০০

রাঢ়ের প্রবাদ দর্পণে ভাষার আনুষঙ্গিকতা
অর্পিতা চৌধুরী
১০৬

বাংলা প্রবাদ ও ট্যাবুর পরম্পরায় স্বচ্ছতা : করোনা অতিমারির অভিজ্ঞতা
পর্ণা মণ্ডল
১১৩

বিশ্বায়ন ও লোকক্রীড়া: সংকটের প্রশ্নে লোকক্রীড়া ডাংগুলি
সার্থক লাহা
১১৭

লোকসংগীত বিবর্তনের ধারাপাত ও গাজন গান : প্রেক্ষিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
সুচন্দন মণ্ডল
১২২

মুর্শিদাবাদ জেলার বিলুপ্তপ্রায় লোকগীতি কাহিনিগান
টুকটুকি হালদার
১৩৩

উত্তর ২৪ পরগনার ব্রতকথা : অন্য ভাবনায়
পুষ্পেন্দু মজুমদার
১৪১

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে বাঁকুড়ার লোকশিল্প
দশরথ রজক
১৪৫

বঙ্গো গাজন উৎসব
স্বপন হাজরা
১৫১

ব্রতকথা ও পাঁচালি : বাংলার সম্পদ
সুস্মিতা সাহা
১৫৭

কবিতা **১৬১-২২৬**

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অধ্যাত্মভাবনা
মন্দিরা দে
১৬১

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় আঙ্গিক ভাবনা
গুরুপদ অধিকারী
১৬৭

জীবনানন্দের কবিতায় আত্মসমীক্ষণ : অনন্বয় থেকে সমন্বয়ের অভিমুখে যাত্রা
সৌরভ মজুমদার
১৭৪

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে পাশ্চাত্য পুরাণের আখ্যান
দিবাকর বর্মন
১৮২

ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী কবি জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা
কাজী সাকেরুল হক
১৮৮

'শিকার' : নাগরিক লোভ-লালসা-লোলুপতা এবং একটি মৃত্যুর কাহিনি
মৈত্রেয়ী বিশ্বাস
১৯৮

যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ : বিষ্ণু দে-র কবিতা
সুরজিৎ প্রামাণিক
২০১

শামসুর রাহমানের কবিতা : প্রবহমান জীবনের মন্তাজ
সুস্মিতা সাহা
২০৭

কবি মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় বিষণ্ণতাবোধ
শোভনলাল বিশ্বাস
২১১

নিশীথ ভড়-এর কবিতার বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ
শুভম চক্রবর্তী
২১৬

'শতভিষা' : বাংলা কাব্যজগতের একটি উত্তরণ
ঋদ্ধি পান
২২২

চর্যাপদে নারী-ভাবনা : বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আলোচনা

লুসী মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। যার বর্তমান বয়স কম বেশি প্রায় হাজার বছর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে ৩য় বারের প্রচেষ্টায় (১৯০৭) চর্যার পুথি আবিষ্কার করে, ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে— "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশ করলেন। সেখান থেকে আমরা মোটামুটি ৫০ জন সিদ্ধাচার্য (মতান্তরে ৫১) ও ২৩-জন পদকর্তার (মতান্তরে ২৪) সন্ধান পাই। যেমন—'লুইপা', কুক্কুরীপা', 'বিরুআপা', 'কাহ্নপা', 'ডোম্বীপা', 'শবরপা', 'টেণ্টনপা' প্রমুখ। শাস্ত্রী মহাশয় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর যে খণ্ডিত পুথিটি প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে ছেচল্লিশটি গোটা গান ও একটি গানের ভগ্নাংশ ছিল। সেই সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যাগীতির মধ্যে অন্তত সতেরোটি চর্যায় নারী-বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছে সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের রূপকার্থে।

চর্যাপদের মহিলা কবি হিসেবে অনেকেই কুক্কুরীপাদের নাম করেছেন। কিন্তু তিব্বতীয় ঐতিহ্যে কুক্কুরীপাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি একটি নেড়ি কুকুর পুষিতেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, নামটি আসলে সংস্কৃত 'কুক্কুটিপাদ' শব্দের বিকৃতি—

যেসব পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি সবরকম শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিতেন তাহাদের উপহাস করিয়া বলা হইত কুক্কুটপাদ অর্থাৎ মুরগীর মত যাহারা এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের আঁচড় দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড)

চর্যাগীতিতে প্রতিফলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও গোষ্ঠী-জীবন ছিল নিম্ন-শ্রেণিভুক্ত; অর্থাৎ চণ্ডাল, শুণ্ডিনী, ডোম, শবর, ধীবর ইত্যাদি অন্ত্যজশ্রেণি দ্বারা গঠিত।

তাদের বসবাস ছিল নগরকেন্দ্রিক আর্য-সমাজের বাইরে; শহরের প্রান্তভাগে। নারীদেরকেও লোকবসতি থেকে বহুদূরে উঁচু পাহাড়ের টিলায়, জঙ্গালে কিংবা মালভূমিতে বাস করতে হত। এরূপ ব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ্য-শ্রেণির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত; নিম্নবর্ণের ছায়া-মাড়ানো কিংবা স্পর্শজনিত দোষ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য। তৎকাল সমাজে এই বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার যে ভেদরেখা ছিল তার সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা দৃশ্যে। যেমন—ব্রাহ্মণরা একদিকে অঅন্ত্যশ্রেণির নারীদের অস্পৃশ্য বলে বিধান দিলেও, নিঃসংকোচে ইচ্ছামতো তাদের পূর্ণ-যৌবনের মধুর-স্পর্শ পেতে প্রতিরাত্রে শয্যাসঙ্গী হতে চাইত। এতদ্বারা সেকাল-সমাজে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির দ্বিচারিতা ও ব্যভিচারিতার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উল্লেখ্য কাহ্নপা'র ১০নং চর্যা—

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মনাড়িআ।। (১০)

বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত নারীগণ অনেকবেশি স্বাধীন ছিল। বর্তমান সময়ের মতো ডোম-নারীরা গ্রামের প্রান্তভাগে একাকী বাস করত কারণ তাদের পেশা ছিল মড়া পোড়ানো। যদিও তারা আরও বিভিন্ন ধরনের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেমন নৌকার মাঝি, তাঁতবোনা, চাঙ্গাড়ি তৈরি করা ও বিক্রি করা ইত্যাদি। নদীতে পারানি নিয়ে যাত্রী পারাপার করা, অনেক সময় যাত্রীগণ কারসাজি করে ডোমনিকে ফাঁকি দিয়ে বিনেপয়সায় নদী পার হত। ফলে সেখানেও দেখি নারীকে তুচ্ছ-দুর্বল ভেবে ঠকানোর দৃষ্টান্ত। এছাড়া প্রমাণ ডোম্বীপা'র ১৪নং চর্যা—

গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই।
তহিঁ চড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।। (১৪)

১০নং পদে কাহ্ন ডোম্বীকে তাঁত ও চাঙ্গাড়ির কাজ করতে বারণ করেছে—"তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না চাঙ্গেড়া।/তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া।।" (১০) সেকাল-সমাজে মদ্যপান ও মদ-বেচা সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিনোদনের একটি অঙ্গ ছিল। শুধু তাই নয় শুড়িঁখানায় নারীরাও এই মদ উৎপাদন ও বিক্রির কাজে নিযুক্ত থাকত। দৃষ্টান্ত : বিরুআপা'র ৩নং পদ— "এক সে সুন্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।/চীঅন বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।" (৩) বর্তমান সময়ে বৃত্তি-নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজ যত উন্নত হয়েছে, মানুষের শিক্ষার হার যত বেড়েছে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন নতুন বৃত্তির সংস্থান হয়েছে। এমনকী একবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এমন অনেক বৃত্তি বা পেশা ছিল যেখানে শুধুমাত্র পুরুষদের অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেইসমস্ত পেশায় নারীরাও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছ, শুধু তাই নয় পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান তালে কাজ করে চলেছে। বহুক্ষেত্রে তো পুরুষদেরকে পিছিয়ে নারীরা নিজেদের আরও যোগ্য প্রমাণিত করেছে। এমন দৃষ্টান্তও নেহাত কম নয়।

সেকাল-সমাজে বিভিন্ন ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপন হত নানা কারণে। যা ছিল আমোদ-প্রমোদের একটি বিশেষ অঙ্গ। সেই উৎসবে নারীরাও পুরুষদের সঙ্গে একই সারিতে বসে হাঁড়িয়া খেয়ে মত্ত হয়ে নাচ-গান করত। যেমন—বীণাপা'র ১৭নং চর্যায় দেখি, বুদ্ধ নাটকের অভিনয় চলাকালীন পুরুষ বজ্রধর নাচ করে ও নাচের তালে মত্ত হয়ে নারী-দেবী গান গাইতে শুরু করেন—"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।/বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।।" (১৭) অন্যদিকে দেখি তারা

নৃত্য পটিয়সী-পারদর্শীও ছিল। ১০নং পদে কাহ্ন বলে—"এক সে পদমা চৌসটী পাখুড়ী।/তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।" (১০) হাজার বছর আগে চর্যাপদের সমকালে নারীদের সৌন্দর্যচর্চা সত্যিই আমাদের মুগ্ধ করে। তখন এত প্রসাধানী দ্রব্যের ব্যবহার ছিল না, ফলে তাদের সাজসজ্জা-সৌন্দর্য সবটাই ছিল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। সেখানে কোনো মেকিত্বের স্পর্শ ছিল না। শবরপা'র ২৮নং চর্যা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শবরী-বালিকা লোকালয় বা জনবসতি থেকে বহু দূরে পাহাড়ের-টিলায় বাস করত। তার পরিধানে রয়েছে ময়ূরীর পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা, কানে শোভা পাচ্ছে কুণ্ডল আর কণ্ঠে ধারণ করে আছে বজ্র। শবরী-বালিকার এই সৌন্দর্য দেখে প্রেমিক শবর উন্মত্ত হয় এবং এটা ভুলে যায় যে, এই বালিকা আর কেউ নয়, তার নিজের ঘরণী-সহজসুন্দরী—

উঁঞা উঁঞা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।(২৮)

বর্তমান সময় বিভিন্ন ধরনের বাজার চলতি বিদেশি সৌন্দর্যবর্ধক প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহার বেড়েছে যা, মুহূর্তের মধ্যেই ব্যক্তির প্রকৃত রূপ পরিবর্তন করে তাকে অপরূপ/অপরূপা বানিয়ে দিতে পারে। এমনকী উন্নত প্রযুক্তিগত চিকিৎসা-বিদ্যার কারণে কসমেটিক্স-সার্জারি, প্লাস্টিক-সার্জারি ইত্যাদির দ্বারা ব্যক্তির মুখের সম্পূর্ণ বদলে ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

অস্পৃশ্য ডোমনিকে কুলীন-ব্রাহ্মণরা সেবা করে তুষ্ট করার প্রস্তাব দিত, নিজেদের কামনা চরিতার্থ করার গোপন অভিপ্রায় থেকে। ডোম্বীও অসামান্য চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে একদিকে স্বেচ্ছায় কুলীনদের প্রস্তাব স্বীকার করে সমাজে উচ্চ-বর্ণের মধ্যেও আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত, এমনকি ব্রাহ্মণ ও কাপালিক-২ বর্ণের মানুষকে শয্যাসঙ্গী রূপে গ্রহণ করে চাহিদা মেটাত। এর দ্বারা ডোম-নারীদের চরিত্রের স্বেচ্ছাধীন জীবন-যাপনের চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রমাণ—কাহ্নপা'র ১৮নং চর্যা—

কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝেঁ কাবালী।।" (১৮)

একাল সমাজে এই ব্যাপারটি লুপ্ত হয়েছে এটা বলার দুঃসাহস মনে হয় না কারও আছে। বরং এখন এই বিষয়ের গোপনীয়তা অনেক বেশি কারণ এখন মানুষ শিক্ষিত-ভদ্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই চর্চার যুগের নারীরা খোলাখুলি যেভাবে তাদের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেছে; বর্তমানে শিক্ষিত-ভদ্র সম্প্রদায়ের মনে একই অভিসন্ধি থাকলেও তাদের প্রকাশের ধরন ভিন্ন, ভাষা অনেকটাই আলাদা। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

শুধুমাত্র অবিবাহিত নারীরা নয়, গৃহস্থ্য-বধূরাও কামার্ত অবস্থায় গৃহত্যাগী হয়েছে তার প্রমাণ চর্যায় রয়েছে। যে বধূটি দিনেরবেলা কাকের ভয়ে ভীত হয়, সে রাতেরবেলা পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মিলিত হওয়ার জন্য সকলের অগোচরে ঘরের বাইরে নিশাভিসারে যায়। যদিও সেকাল-সমাজে নারীদের সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা থাকলেও সামাজিক অনুশাসন যে একেবারেই ছিল না তা বলা যাবে না। প্রমাণ—কুক্কুরীপা'র ২নং পদ—

সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।/কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।।/দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।/রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ।। (২)

বিষয়টি লক্ষণীয়, সে-সময় গৃহবধূরা আপন ইচ্ছানুযায়ী যখন-তখন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে পারত না। তাকে পারিবারিক-অনুশাসন সামাজিক-বন্ধন মেনে চলতে হত। তাই গভীররাতে

সকলে ঘুমিয়ে পড়লে লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন অভিসারে যেত। সেইসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট, গৃহবধূরা আপন ইচ্ছাকে প্রতিহত করত না যে-কোনো ধরনের সামাজিক বিধি-নিয়ম-সংস্কার কিংবা বন্ধনের চাপে পড়ে। সুতরাং সে-সময় নারীদের নির্ভীক দৃঢ় মানসিকতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় মেলে।

বর্তমান সময়ে এই বিষয়টি একটি বৃহৎ সমাজিক ব্যাধি হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন গণমাধ্যম, সাহিত্যের পাতা কিংবা খবরের কাগজ—সমস্ত জায়গাতে সারাদিনের বিভিন্ন খবরের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্স কিংবা বিচ্ছেদের ঘটনা। আসলে মানুষ এখন অনেক সভ্য হয়েছে, তাদের চিন্তাচেতনা বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু তারপরেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীমাত্রই নিরাপত্তাহীন, শোষিত, অত্যাচারিত, ধর্ষিত। নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যক্তিগত-স্বার্থে ব্যবসার-স্বার্থে কোম্পানির-স্বার্থে। এমন অনেক বিজ্ঞাপন-সংস্থা, স্পন্সর কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানি আছে যারা নারীকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছে। নারীরা নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে দাবি করলেও সচেতন নয়। একদিকে শৃঙ্খলবদ্ধ জীবন ভেঙে মুক্তির স্বাদ পেতে অন্য আরেকটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে নিজেরই অজান্তে। স্বাবলম্বী হতে গিয়ে তাদের নারীত্বের মর্যাদা, সম্ভ্রম যে তাদের লুণ্ঠিত হচ্ছে তা বুঝতেও পারে না। যেনতেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জনই তখন মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

চার্যায় বর্ণবৈষম্য বিভিন্ন জীবিকার পাশাপাশি উঠে এসেছে গৃহস্থ জীবনীর উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। পরিবার ছিল যৌথ ও একান্নবর্তী। বধূ শ্বশুর শাশুড়ি ননদ সবাই মিলে একসঙ্গে দিনযাপন করত। প্রমাণ—কুক্কুরীপা'র ২নং পদ, গুণ্ডরীপা'র ৪নং পদ—"সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।" (৪) বর্তমান সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের ধারণা লুপ্ত হয়ে তৈরি হয়েছে ছোটো ছোটো পরিবার। তার মূল কারণ হিসেবে বলা যায় পারিবারিক অন্তর্কলহ অন্তর্ঘাত অথবা সন্তানদের নিয়ে পিতা-মাতার মাত্রাতিরিক্ত অনৈতিক দুশ্চিন্তা যে, যেহেতু আমার ছেলে কিংবা মেয়ে ছোটো পরিবারে থেকে অভ্যস্ত তাই সে যৌথ-পরিবারে একাধিক মানুষজনের সঙ্গে তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকতে অপারক। প্রবাদ আছে—"সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে।"—কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষিত হাল-ফ্যাশনের নারীরা মাত্রাহীন স্বাধীনতা ভোগের অভিলাষে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের বিভিন্ন রকম সাংসারিক বাধা-নিষেধ বিধি-নিয়ম ইত্যাদি প্রতিকূলতাকে লঙ্ঘন করতে উদ্গ্রীব। তাদের স্বপ্ন ছোটো পরিবারের। যেখানে থাকবে না অপরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, যুক্তি-পরামর্শ মানিয়ে চলার প্রশ্ন। তবে ব্যতিক্রমও অনেক আছে। যেমন, জীবিকার তাগিদে, সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় প্রায়শই যৌথপরিবার থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। সেখানে কোনোরকম স্বার্থ কিংবা অপার স্বাধীনতা ভোগের লালসা থাকে না; থাকে একরকম নিরুপায়তা।

যুবতী-ডোমনীকে বিবাহ করার আশায় কাহ্ন নিজের শাশুড়ি ননদ শালী, এমনকি গর্ভধারিনী মাকেও হত্যা করে কাপালিক হতে চেয়েছে। উদাহরণ—কৃষ্ণাচার্যের ১১নং পদ—

মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে সালী।
মাঅ মারিঅ কাহ্ন ভইঅ কবালী।। (১১)

চর্যার এই পদটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক বলে আমার ব্যক্তিগত মত। কারণ, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নতুন নতুন ধরনের ক্রাইমের জন্ম হচ্ছে। কাহ্ন পরনারীকে বিবাহ করার জন্য কেবলমাত্র মনের মধ্যে আপন পরিবারবর্গকে

হত্যাকরার অভিপ্রায় পোষণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সাইবার ক্রাইমের বাস্তবায়িত ভয়ংকর রূপ আমাদেরকে স্তব্ধ করে দেয়। চর্যাপদে গৃহস্থ্য জীবনের নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ এসেছে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। যেমন—১৮নং পদে কাহ্ন ডোম্বীকে সম্বোধন করেছে 'চ্ছিণালী'-এর বাড়া, 'কামচণ্ডালী' রূপে কারণ ডোম্বী চতুরতা করে কাহ্নর কাছে ধরা দিচ্ছে না। পরিবর্তে একদিকে কাপালিক কাহ্নকে অন্যদিকে বামুনকে প্রসন্ন করছে। তার প্রতীক্ষায় কাহ্ন সময় নষ্ট হচ্ছে। কুলীন বামুনরা নীচু জাত বলে নিন্দা করলেও মনোরঞ্জনের সময় ডোমনিকে কণ্ঠে ধারণ করেন—

কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুললিণজন মাঝেঁ কাবালী।। (১৮)

আবার, ১৯নং চর্যায় কাহ্ন ডোমনিকে বিবাহ করতে যায় ঢাক, মাদল, কাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, বরযাত্রা সহযোগে। এখানে বিবাহানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে জৌতুক-প্রথা বাসররাত-জাগা প্রভৃতি বিভিন্ন লোকাচারের পরিচয় পাই। যা, সেকাল সমাজে আমোদ-প্রমোদের একটি অঙ্গ হিসাবে গণ্য হত—

ভবনির্বাণে পড়হমাদলা।/মণপবণ বেণি করণ্ড কসালা।।/ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।/জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।। (১৯)

বিবাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সেকাল-সমাজে 'সাঙ্গা' প্রথাটিও যে প্রচলিত ও সমাজস্বীকৃত ছিল তার প্রমাণ মেলে, ডোম্বীর ১০নং পদে—

আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গা।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ।। (১০)

বর্তমান সময়ে বিবাহানুষ্ঠান আরও অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় এক রাতের অনুষ্ঠানে। যদিও সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের লোকাচার, স্ত্রী-আচার পালন করা হয়। কুক্কুরীপা'র ২০নং পদে সংসারের প্রতি স্বামীর উদাসীনতার কথা বলা হয়েছে। স্বামীর এইরকম উদাসীন চিত্ত হলে সেই সংসারে নারীর কোনো সুখ থাকে না। তাই সে আক্ষেপ করে বলে—"জা এথু চাহাম সো এথু নাহি।" (২০)

অর্থাৎ স্ত্রী চায়, তার স্বামী-সন্তান গৃহাভিমুখী হোক। কিন্তু স্বামী উদাসীন আর সন্তান বাউল প্রকৃতির। এছাড়াও এই পদে কুক্কুরীপা' নারীর প্রসব যন্ত্রণার প্রসঙ্গ এনেছেন। প্রসবের সময় নবজাতকের জীবনবিপন্ন হওয়ায় আশঙ্কায় মাতৃ-হৃদয়ের হাহাকারের চিত্রটিও এখানে সুস্পষ্ট।

বর্তমান সময়ের দিকে তাকালে, এখনো হিন্দু-নারীদের প্রায় প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছনা এটাই—সমাজে সন্তান যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বামীরা বিনা কলহে স্ত্রী'র সঙ্গে সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করে। সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবি ফুটে উঠে শবরপা'র ৫০নং চর্যায়। বৃক্ষের অন্তরালে উঁচু পাহাড়ের টিলায় প্রেমময়ী গৃহিণী ঘরে শান্তিপূর্ণ গৃহে প্রেমিক শবর বাস করে। সদ্য নতুন ধান ওঠার আনন্দে ঘরে অন্নাভাব মিটেছে। কাপাস (কার্পাস) ফুল ফুটেছে ফলে বস্ত্রাভাব মিটে যাবে। মনের সব দুঃখ দুর্দশা অন্তর্হিত করে এক স্বর্গীয়সুখ তারা অনুভব করছে। তারা দাম্পত্য জীবনের উন্মত্ত মিলন সুখেই আজ নিযুক্ত হতে পেরেছে।

আবার ২৮নং চর্যায় পাই, উন্মত্ত শবর, পাগল শবর যৌবনবতী শবরীর সঙ্গে মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, তার সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধ যে, নিজের ঘরণী-সহজসুন্দরীকে চিনতে পারছে না।

সুতরাং 'চর্যাপদের যুগে নারীর স্থান ও ভূমিকা' বর্তমান সময়ে প্রেক্ষিতে আলোচনা করলে সেখানে দেখি উনবিংশ শতাব্দীতে একাধিক সামাজিক বিধি-নিয়মের অনুশাসন দ্বারা নারীদের জীবনকে স্বাধীন-অধিকারকে বাঁধা হয়েছিল। যার ফলে বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়ের মতো মনীষীরা স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, পুরুষের বহু-বিবাহ রদ ইত্যাদি একাধিক ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বিংশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীদের স্থান-অধিকার-স্বাধীনতা সমাজে অনেকখানি উন্মুক্ত হওয়ার অবকাশ পায়। তাদের স্বাভিমানবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ বিভিন্ন সময়ে পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, নারীত্বের সম্মান রক্ষার জন্য মুখর হয়েছে, এমনকি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেও বাধ্য করেছে। যাকে সাহিত্যের ভাষায় 'নারীচেতনাবাদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। একবিংশ শতকে সমাজে নারীদের স্বাধীনতা আরও অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে নারীরা পেশা কিংবা জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে অনেকবেশি স্বাধীন। সম্মান রক্ষা কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা সমগ্র পরিবার, সমাজবদ্ধ সাংসারিক জীবনের বিধি-নিয়মের গণ্ডী ত্যাগ করে নির্দ্বিধায়। যেমনটা দেখতে পাই সমরেশ মজুমদারের 'সাতকাহন', সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন'-এর মতো একাধিক উপন্যাসে।

৫০টি চর্যাগীতির মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হল, যেখানে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে চর্যার যুগে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অসংখ্য চর্যাগীতিতে প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মূল নিবন্ধে।

তথ্যের সন্ধানে

১. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
২. নির্মল দাশ : 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নন্দনতত্ত্বের আলোকে বৈষ্ণব পদাবলী

দীপঙ্কর মল্লিক

তাত্ত্বিক এবং রসিকের মধ্যে পার্থক্য হলো রসাবেদন সম্পর্কিত উপলব্ধির ক্ষেত্রে। তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাত্ত্বিক, অন্যদিকে রস নিয়ে আত্মমগ্ন থাকেন রসিক। তাত্ত্বিক অনেক সময় হয়ে ওঠেন রক্ষণশীল। কারণ তাঁকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে খুব হিসেবি হতে হয়। রসিক সেক্ষেত্রে অনেকখানি সংবেদনশীল । কারণ তাঁকে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে সহনশীল হতে হয়। অবশ্য সাদৃশ্যের ক্ষেত্র এখানে যে, এঁরা দু'জনেই গুণী ও বোদ্ধা। বিষয়টি এভাবে আমরা বলতে পারি, প্রকৃতির কোনো গহন রাজ্যে একই সঙ্গে প্রবেশ করতে পারেন ভ্রমণরসিক ও শিকারি। প্রথমজনের মনে সৌন্দর্যবোধ, দ্বিতীয়জনের মনে শিকারের লালসা। দু'জনেই পরিতৃপ্ত হতে চান। একজন হরিণীর সংবেদন দু'টি চোখের সৌন্দর্যে অভিভূত, অপরজন হরিণীর সুপুষ্ট দেহ দেখে আনন্দিত। দু'জনেই খুশি । কিন্তু পার্থক্য এখানে যে, ইন্দ্রিয় সুখ-নিরপেক্ষ না হতে পারলে সেই আনন্দের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক থাকে না। তাহলে বলতে হয়, সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক।

শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে পাঠকের নিবিড় সম্পর্ক রচনা করে দেওয়া। এই সৌন্দর্য উপভোগের নাম আনন্দ। আনন্দের মধ্যেই তো নিহিত শিল্প-সাহিত্যের মহত্ব। বলাবাহুল্য, যা রস-সঞ্চারী তাই আনন্দ। এই আনন্দের সঙ্গে কাব্যের গভীর সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় রঙ্গলাল বলেছেন, কবিতা 'সকল রসের নিদান'। মধ্যযুগের অন্তিম লগ্নের কবি ভারতচন্দ্র অনুরূপে জানান—'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে'। 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং'—এই উক্তিকে চরম সত্য বলে মেনে নেন রবীন্দ্রনাথও।

কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাতে গিয়ে 'উত্তর রামচরিত'-এ বঙ্কিমের বক্তব্য এমন—'অতএব সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য'। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের সম্পর্ক ব্যক্ত করে পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তব্য—'দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু

মঙ্গালসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন'। বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যবোধ কল্যাণের সঙ্গে সমীকৃত। আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'সৌন্দর্য জগতের অনুকূল' এবং 'যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে।' প্রেমের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক শাশ্বত। আবার প্রেমের সঙ্গে সত্যের নিত্য সম্পর্ককে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুরূপে জন কিটস্ অন্বেষণ করেছিলেন সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্যের গভীর সখ্যতা। লিখেছিলেন 'All beauty is truth.' একই অনুভূতি থেকে ক্রোচে জানান, সকল প্রকাশই সুন্দর। বলতে দ্বিধা নেই যে, এমন সুন্দরের সার্থক প্রকাশ বৈষ্ণব পদাবলীতেও অনুসন্ধান করা যায়। এ সৌন্দর্য অবশ্য 'ক্রিটিক অব জাজমেন্ট' গ্রন্থে কান্ট কথিত বিশ্বজনীন সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা আস্বাদন নির্ভর।

ধারাবাহিক রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকথার সূচনা বয়ঃসন্ধি বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী থেকে। বয়ঃসন্ধির পদগুলিতে শৈশব ও প্রাপ্তযৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে রাধার দৈহিক ও মানসিক পটপরিবর্তনের চকিত ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, বয়ঃসন্ধি এমন এক কালপর্ব যে সময়টাকে শিশু কিংবা পূর্ণবয়স্ক কোনো পর্যায়ে বিন্যস্ত করা চলে না। মনোবিদ্ ডরোথি রোজার্স (Dorothy Rogers) বলেছেন—

> Adolescence, thus viewed as a socioculture phenomenon is the period in his life when society ceases to regard a person as a child but does not yet accord him full adult status role and function.

দৈহিক ও মানসিক হঠাৎ পরিবর্তনের এই কালকে কোনো কোনো মনোবিদ চিহ্নিত করেছেন 'ঝড়-ঝঞ্ঝার' কাল (Stage of storm and stresses) বা 'উৎকণ্ঠা এবং দ্বন্দ্ব'-এর (strain and strife) কাল রূপে। এই সময় যৌন অঙ্গের বিকাশ এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি (Endocrine gland)-র দ্রুত বিকাশ ঘটে। বয়ঃসন্ধি সময়ে রাধার দেহের পরিবর্তনে বিদ্যাপতি দেখান—

১. রাধার স্তনযুগল মুকুলিত।
২. নিতম্ব সুগভীর।
৩. মুখের লাবণ্য মনোহর।
৪. ওষ্ঠ ও অধর অপূর্ব।
৫. চক্ষুদ্বয় যেন মধু পিয়াসি স্থির ভ্রমর।
৬. ভ্রূ-যুগল যেন মদনের কামধনু।
৭. রাধার হাসিতে মুক্তা ঝরে।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থের ৬১০ ও ৬১৯ সংখ্যক পদে রাধার দৈহিক পরিবর্তনের এই ইঙ্গিত উপলব্ধি করেন প্রথমে রাধা নিজে এবং পরে সখী ও দূতি এবং তারও পরে রসিক নাগর কৃষ্ণ। রাধা নিজের মুকুলিত দেহ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেন 'আওল যৌবন শৈশব গেল।' যৌবন যে শ্রীমতী রাধার দ্বারে এসে কৌতুকের হাসিটি হাসছে, তার প্রমাণ রাধার নিজেরই অঙ্গভঙ্গিমার মধ্যে ধরা পড়েছে। বিদ্যাপতি রাধার দেহ-মনের পরিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন—

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ।।

খনে খনে দশন-ছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস।।[১]

এই পদে বয়ঃসন্ধির চাঞ্চল্য ধরা পড়েছে যে অঙ্গভঙ্গির মধ্যে তা হল—

১. আড়চোখে সবকিছু দেখে নেওয়া।
২. বসনের ধূলিতে দেহ ভরে যাওয়া, অথচ সেদিকে খেয়াল না রাখা।
৩. শুভ্র হাসির দ্যুতিতে কুন্দকুসুমের মতো দন্তরাশির প্রকাশ হওয়া।
৪. লজ্জায় কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা।

এভাবে শারীরিক পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে অনভিজ্ঞা রাধা কখনও বুকে কাপড় দেন, কখনও বা কাপড় দিতে ভুলেও যান। শ্রীমতীর অঙ্গে শৈশব ও যৌবন এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, উভয়ের মধ্যে কার প্রাধান্য বেশি তা বুঝে ওঠা যায় না। সদ্য যুবতি রাধার শৈশব ও যৌবনের দ্বন্দ্বের চিত্র বিদ্যাপতি তুলে ধরেছেন এভাবে—

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।/দুহু দলবলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল।।
কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।/কবহু ঝাঁপয় অঙ্গা কবহু উঘারি।।...
চঞ্চল চরণ, চিত চঞ্চল ভান।/জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান।।[২]

শৈশব ও যৌবনের দ্বন্দ্বে বিদ্যাপতি শৈশবের ভ্রূক্ষেপহীন নিরুদ্বিগ্নতার কথা বলেন এভাবে—

১. কখনও রাধা কেশ বাঁধেন।
২. কখনও কেশ খুলে রাখেন।
৩. কখনও তিনি অঙ্গা আবৃত রাখেন।
৪. কখনও বা অঙ্গ অনাবৃত রাখেন।

শৈশবের এই সারল্যের পাশেই বিদ্যাপতি যখন জানান, রাধার চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথা, তখন আমরা দেখি—এই নায়িকার চরণ দুটি চঞ্চল, মনও চঞ্চল। তাঁর মনের গুহায় ঘুমন্ত পাখি যখন ডেকে ওঠে তখন এই রাধা শৈশব উত্তীর্ণা এক কিশোরী বধূ। বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে মনেরও। তাই তাঁর চঞ্চল মন বড়দের গোপন কথা শুনতে আগ্রহী—

সুনইত রস-কথা থাপয় চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সংগীত।।[৩]

অরণ্যচারিণী প্রাণীর সঙ্গে রাধা-চিত্তের তুলনা করে কবি-বিদ্যাপতি মনস্তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম সূত্রকে তুলে ধরেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অমর সৃষ্টি 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি জয়দেব গোস্বামী যতখানি ব্যস্ত, ততখানি শ্রীরাধার সৌন্দর্য বর্ণনায় অনুরাগ প্রকাশ করেন না। তাছাড়া এই কাব্যে রাধা-কৃষ্ণ হলেন 'দম্পতি',[৪] ফলে পরকীয়াবাদের স্বরূপ[৫] অনুল্লেখিত। তাই সেখানে মুগ্ধ কৃষ্ণ শ্রীরাধার 'বালিকা থেকে নারী হয়ে ওঠার মানবিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনতে আগ্রহী নন। বিদ্যাপতির কিছুদিন আগের অগ্রজ কবি বড়ু চণ্ডীদাস বড়ায়ির মুখে রাধার 'পরিবর্দ্ধমানা' সৌন্দর্যের কথা শোনান, কিন্তু সেখানে বালিকার শরীর ও মনের কমনীয় সৌন্দর্য পুরুষের উদগ্র দেহবুভুক্ষায় লাঞ্ছিত। অনিচ্ছুক সেই বালিকা তীব্র দেহমিলনের মধ্যে দিয়ে প্রেমের আনন্দ-যন্ত্রণাকে অনুভব করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই বয়ঃসন্ধির বয়সটুকু সেখানে আছে, নেই তার বিকাশমান সৌন্দর্যের মুগ্ধঅনুভব। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ সৌন্দর্যরসিক নন। দেহমিলনের উদগ্র কামনা তাঁকে নেশার মতো ছুঁয়ে থাকে বলে তিনি রাধার অপূর্ব সৌন্দর্যকে রসিকের চোখ দিয়ে দেখতে পারেন

না। প্রেম সে সকাম হোক বা নিষ্কাম হোক, প্রেমের গভীর সমুদ্রের মধ্যেই জেগে থাকে সৌন্দর্যের দ্বীপ। এজন্যে প্রেমানুভূতি হলো সৌন্দর্যবোধের উৎস।[৬] এই বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—'সৌন্দর্য প্রেম জাগায় এবং প্রেম সৌন্দর্য জাগাইয়া তুলে।'[৭] যার হৃদয়ে প্রেমের স্থান যতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তাঁর সৌন্দর্যানুধ্যান ততখানিই প্রসারিত। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বস্তুত, 'সুন্দরের অনুভূতি একান্তই আত্মিক' এবং 'সুন্দর সম্পূর্ণত দৈহিক গুণাগুণের ঊর্ধ্বে।'[৮] প্লেটো মনে করেন—

> It is an incorporeal quality which pleases. What pleases is attractive, and what it attractive is, in short, beautiful.[৯]

প্লেটোর 'সুন্দর' সম্পর্কিত ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে 'স্বর্গীয় সুন্দরের' বর্ণনায়। সুন্দরের বস্তুনিরপেক্ষ ধারণাকে ব্যক্ত করে কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর 'ক্রিটিক অব জাজমেন্ট' গ্রন্থে জানান 'সৌন্দর্য আনন্দদায়ক' তবে 'এই আনন্দ নির্লিপ্ত মনের আনন্দ।' 'নির্লিপ্ত মন' নিয়ে সুন্দরের দেহে হাত রাখার কাজটি সহজসাধ্য নয়। কারণ 'মন'কে 'নির্লিপ্ত' রাখা বোধহয় সবথেকে দুরূহ কর্ম। এই কর্মটি করতে পেরেছিলেন কবি বিদ্যাপতি। যদিও রাজসভাকবির পক্ষে 'নির্লিপ্ত মন' নিয়ে বসে শুধুমাত্র সুন্দরকে দূর থেকে দেখা এবং নতুন করে তাকে আবিষ্কার করার বিষয়টি অভাবনীয়। তথাপি রাজসভাকবিকে কখন যেন বহুদূর অতিক্রম করে গিয়েছেন সৌন্দর্যরসিক কবি। তাই রাধার বিকশিত পদ্মের মতো রূপলাবণ্য দেখে বিদ্যাপতির কৃষ্ণ মুগ্ধ। কিন্তু মুগ্ধ মাধব পদ্মের পাপড়ি খসাতে চাননি? কি লাভ পাপড়ি খসিয়ে! সে তো কামনাদগ্ধ মানুষের কাজ। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কামমুগ্ধ পুরুষ নন, কামজয়ী সৌন্দর্যরসিক তিনি। অধ্যাপিকা সত্যবতী গিরি কালিদাস ও বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির যে রাধা তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভবের তাপসী উমার দেহসৌন্দর্যের কথা বলেছেন—''দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা/লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।/পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষাণ/জ্যোৎস্নান্তরানীব কলান্তরানি।।''[৯] কালিদাসের উমার যৌবনসমাগমের এই বর্ণনার পাশে তুলনীয় বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির রাধার এই অনুভূতি—

আজ দেখলিসি কাল দেখলিসি
আজি কালি কত ভেদ।।
সৈসব বাপুড়ে সীমা ছাড়ল
জউবনে বাঁধল ফেদ।।
সুন্দরি কনক কেআ মুতি গোরী।
দিনে দিনে চান্দ কলা সঞে বাঢ়ালি।
জউবন শোভা তোরী।।[১০]

এই দুটি অংশের তুলনাত্মক বিশ্লেষণে দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অধ্যাপিকা সত্যবতী গিরি যে মন্তব্য করেন, তা যথার্থ—

> কালিদাস সশ্রদ্ধভাবে পার্বতীর রূপ নিরীক্ষণ করেছেন। অন্যদিকে বিদ্যাপতি সস্নেহে ও মুগ্ধতায় রাধারূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। আজ দেখা আর কাল দেখার মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য তা একই সঙ্গে রাধার সৌন্দর্যের ক্রমবর্ধমানতা এবং কবির সানুরাগ ও সহিষ্ণু মিলন প্রতীক্ষাকেই প্রকাশ করেছে। বিদ্যাপতির এই বয়ঃসন্ধির রাধা ভারতীয় সাহিত্যের এক অনন্য সৌন্দর্যপ্রতিমা।[১১]

এই সৌন্দর্যপ্রতিমাকে দেখে আপ্লুত হন রসিক কৃষ্ণ। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের মতো দেহবিলাসী নন। তিনি কোনোরূপ বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী নন। বরং তিনি রাধার রূপে মুগ্ধ হন। এই জাতীয় পদে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় দিয়েছেন বিদ্যাপতি। কৃষ্ণ রাধারূপের সৌন্দর্য বর্ণনায় লেখেন—

জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরঈ।/তহিঁ তহিঁ সরোরূহ ভরঈ।।
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।/তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ।।[১২]

এই অপূর্ব সুন্দরী যেন কৃষ্ণের মনের মধ্যে তাঁর বাসভূমি নির্মাণ করে নিয়েছেন। কৃষ্ণের রূপানুরাগকে, 'প্রেমের তৃষ্ণাতুর অতৃপ্তি'কে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকারের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি—

সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল।
মেঘ-মাল সয়াঁ তড়িত-লতা জনি।
হিরদয়ে সেল দঈ গেল।।[১৩]

ভালো করে যাঁর দেখার সুযোগ হলো না; তাঁর সম্পূর্ণ বিবরণ কৃষ্ণ দেবেন কীভাবে? সুতরাং অর্ধেক সৌন্দর্য বর্ণনায় মুগ্ধ কৃষ্ণ বলেন—

১. রাধার কাপড়ের আঁচল খসে পড়েছে।
২. মুখে মৃদু হাসি লেগে রয়েছে।
৩. চোখের অদ্ভুত দীপ্তিতে মন পূর্ণ হয়েছে।
৪. অগোছালো হয়েছে তাঁর বেশবাস।
৫. অর্ধ পয়োধর অনাবৃত হয়েছে।

রাধার সম্পূর্ণ রূপ দেখলে কৃষ্ণ হয়তো খুশি হতেন, কিন্তু অর্ধেক রূপ দেখে যে তৃষ্ণা সেই অপরিমিতি রূপতৃষ্ণার বর্ণনার যে সৌন্দর্য তা সত্যি আস্বাদ্যময়। রূপ দেখে মন না ভরার মধ্যে যে 'Tragic pleaser' থাকে, তার পরিচয়ে রসিক বিদ্যাপতি বলেন—

বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পুরল আশা।।

বিদ্যাপতি জানেন, কৃষ্ণ যদি রাধার সম্পূর্ণ দেহ-সৌন্দর্য না দেখেন, তবে না পাওয়ার বেদনামিশ্রিত অম্ল-মধুর রেশ থেকে যাবে। অতএব আশা পূরণ না হওয়ার মধ্যে যে অতৃপ্ত বেদনা; সেই বেদনা তার মধ্যেও রয়েছে। বয়ঃসন্ধিতে কৃষ্ণ দেখেন, রাধার অতুলনীয় রূপমাধুর্য, আর পূর্বরাগে কৃষ্ণরূপমাধুর্য দেখে রাধার নয়ন তৃপ্ত হয় না। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সখীকে কৃষ্ণরূপের আস্বাদনের কথা জানিয়ে রাধা বলেন—

এ সখি পেখলি এক অপরূপ।/সুনইত মানবি সপন-সরূপ।।
কমল জুগল পর চাঁদক মাল।/তারপর উপজল তরুণ তমাল।।
তাপর বেঢ়লি বিজুরি-লতা।/কালিন্দী তীর ধীর চলি জাতা।।
সাখা-সিখর সুধাকর পাঁতি।/তাহি নব পল্লব অরুণক ভাঁতি।।
বিমল বিম্বফল জুগল বিকাস।/তাপর কীর থির কর বাস।।[১৪]

আপাদমস্তক দেহ সৌন্দর্য বর্ণনা লোকসাহিত্যের একটি প্রিয় বিষয়। রূপসন্ধানী কবি বিদ্যাপতি এমন বর্ণনায় প্রকৃতিলোকের দ্বারস্থ হয়ে রূপক এবং অতিশয়োক্তি অলংকারে কৃষ্ণরূপকে বিশ্বরূপের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই রূপ দর্শনের প্রলোভনে রাধা তাঁর কণ্ঠে দোল খাওয়া বহুমূল্যের

মোতির হার ছিন্ন করেন। সখীরা মুক্তো তুলতে ব্যস্ত থাকলে সেই ফাঁকে কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যাশী রাধা আড়চোখে দেখে নেন কৃষ্ণকে —

তঁহি পুন মোতি হার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুঁটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম-দরশ ধনি নেল।।[১৫]

রূপক অলংকারে শ্রীমতী রাধার নয়নকে চকোরের সঙ্গে অভেদ আরোপ করে বিদ্যাপতি লেখেন—

নয়ন-চকোর কাহ্ন-মুখ-শশিবর
ক-এল অমিয়-রস-পান।

অমিয়-রস-পানের আনন্দে রীতিমত আপ্লুত রাধা। সেই গর্ব প্রকাশে বিদ্যাপতি রাধার মুখে বসিয়ে দেন একের পর এক অলংকার। 'হাথক দরপণ'[১৬] শীর্ষক পদটিতে দেখা যায় কৃষ্ণ রাধার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝাতে গিয়ে রাধা বলেন—

১. কৃষ্ণ হলেন রাধার হাতের দর্পণস্বরূপ।
২. কুঞ্চিত চুলের মধ্যে শোভিত ফুলের মতো সুন্দর হলেন কৃষ্ণ।
৩. রাধার চোখের কাজলের মতো দৃষ্টিনন্দন তিনি।
৪. রাধার মুখের তাম্বুলের মতো তিনি সৌন্দর্যবিস্তারী।
৫. হৃদয়ের মৃগমদের মতো অনিন্দ্যসুন্দর হলেন কৃষ্ণ।
৬. গলার হারের মতো চমৎকার মনোমুগ্ধকর।
৭. রাধার মন-প্রাণ দেহের সর্বস্ব হলেন কৃষ্ণ।
৮. শ্রীরাধার গৃহের সর্বস্ব হলেন কৃষ্ণ; এমনকি জগতের সার তিনি।

এই পর্যন্ত বলেও রাধার কাছে কৃষ্ণ কতখানি আপনার; তা যেন বলা শেষ হয়ে ওঠে না। অবশেষে রাধার সিদ্ধান্ত—

পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীব হাম ঐছে জানি।।

পাখি, মাছ ও জীব এই তিনের অপরিহার্য হল পক্ষ, জল ও জীবন। রাধার কাছে অনুরূপ অপরিহার্য হল কৃষ্ণ। অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁর সকল অস্তিত্বের কারণ। কিন্তু এত বলার পরেও রাধা পুনশ্চ প্রশ্ন তোলেন 'তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুঁহুঁ মোয়।' রোমান্টিক কবিরা প্রেমের মধ্যে দেখেন অতৃপ্তিবোধকে। এই গভীর অতৃপ্তিবোধ অনুরাগের এই পদে ধরা পড়েছে। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণদর্শনে এতটাই বিভোর যে, তিনি অন্যত্র নয়ন নিক্ষেপ করতে পারেন না। কৃষ্ণদর্শনে রাধা বিমুগ্ধ। সেই বিমুগ্ধ রাধা কৃষ্ণের ভুবনজয়ী হাসি দেখে সবকিছু ভুলে যান। সিদ্ধান্ত নেন—

জাতিকুল শীল সব তিয়াগিঞা
হইব কানুর দাসী।[১৭]

রূপদর্শনে বিস্মিতা রাধার মনে হয়, এহেন কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে যুবতির ধর্মরক্ষা তো ভার। রূপদর্শন ও কৃষ্ণনাম শ্রবণ—এই দু'য়ের প্রতিক্রিয়ায় শ্রীমতী রাধা 'যে করে কানুর নাম ধরি তার পায়।' শ্রবণজাত বিহ্বলতা রাধার মনকে এতটাই অস্থির করে তোলে যে, ততক্ষণে তার মনে প্রশ্ন জাগে 'কেমনে পাইব সই তারে।'[১৮] শ্যামকে কাছে পাওয়ার আকুলতায় শ্রীমতী রাধা বারবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বাইরে।[১৯] চণ্ডীদাস এই রাধা সম্পর্কে লেখেন—

১. শ্যাম অদর্শনহেতু রাধার মন অস্থির হয়ে ওঠে।
২. তাঁর দ্রুত নিঃশ্বাস পতিত হয়।
৩. সবসময় কদমগাছের দিকে তাকিয়ে থাকেন।
৪. সখীদের ধারণা কোনো দেবতায় বুঝি ভর করেছে।
৫. তিনি বসনাঞ্চল সম্বরণ করতে পারেন না।
৬. তিনি হঠাৎ চমকে ওঠেন।
৭. দেহের অলংকার খুলছেন, পরক্ষণে আবার পরিধান করেন।

কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর প্রেম রাধার এই চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ। স্বজন-পরিবার-পরিজন কেউ এই চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ বোঝে না। রাধা অবশ্য তাঁর মনের কথা কাউকে বলতে পারেন না—

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত।।[২০]

শ্রীমতী রাধা গুরুজনের সামনে দাঁড়াতে পারেন না, তাঁর দুটি চোখ পদ্মপাতায় জল পড়ার মতো টলমল করে। 'পুলকে আকুল' মনে তিনি যেদিকে তাকান, সেদিকে 'সব শ্যামময়' দেখেন। এমনকি, সখীর সঙ্গে জল তুলতে গিয়েও তিনি চমকে ওঠেন। কারণ সেখানে—''যমুনার জল করে ঝলমল/তাহে কি পরাণ রয়।।"

ভাষার যে 'Simplicity' বা আড়ম্বরশূন্যতার কথা বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী'তে, সেই আড়ম্বরহীন সারল্য চণ্ডীদাসের শৈলী নির্মাণের বৈশিষ্ট্য। শিল্পী শুধু Craftsman নন্, তার অতিরিক্ত কিছু; এই অতিরিক্ত কিছু হল 'Aesthetic intuition'। আত্মিক অনুভূতির প্রকাশ যখন কবিতা এবং তা যখন সহৃদয় সামাজিকের কাছে আস্বাদ্যমান হয়ে ওঠে, তখন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হল 'Language of communication'। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, 'শিল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে।'[২১] গ্রামীণ কবি চণ্ডীদাস নাগরিক কবি বিদ্যাপতির মতো বাহ্য সৌন্দর্য বিষয়ে কুশলী নন, অন্তরের ভাবৈশ্বর্যের দিকে তাঁর লক্ষ্য অধিক, তিনি যে রাধাকে দেখান আমাদের চোখের সামনে, সেই রাধাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। চণ্ডীদাস বাস্তবে দেখা কোনো এক গাঁয়ের বধূর ফোটোগ্রাফ দেখাননি, তবে পঞ্চদশ শতকের সমাজ-শাসনে বন্দিনী নারীর অসহায় আত্মসমর্পণের ছবি এঁকেছেন। বহুখ্যাত কলা-সমালোচক রোজার ফ্রাই 'আর্ট' সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়, 'Art is the expression of imaginative life'। চণ্ডীদাসের রাধা তাঁর প্রেম সম্পর্কিত যে অনুভব ব্যক্ত করেন, তা আমাদের কাছে অনেকখানি মিস্টিক। অবশ্য ভাবের স্পর্শে, কবির বাচনিক ভঙ্গিতে পাষাণী অহল্যাও জেগে ওঠে। চণ্ডীদাস সৌন্দর্যপ্রতিমা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। করেছেনও, কিন্তু সেই সৌন্দর্যপ্রতিমার সর্বাঙ্গ অলংকারে ভূষিত করার মতো ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। চণ্ডীদাস তাঁর পদগুলিকে করতে চেয়েছিলেন সহজবোধ্য ও আন্তরিক। বস্তুত, সরলতা ও স্পষ্টতা তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। যথার্থ লেখকের সিদ্ধি কোথায় সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।[২২]

রচনার এই বৈশিষ্ট্যে বঙ্কিমের দৃষ্টিকোণ থেকে চণ্ডীদাস 'শ্রেষ্ঠ লেখক।' গৃহবন্দিও কৃষ্ণহীন জীবন রাধার কাছে নিতান্তই অর্থহীন। তাই অন্তরের মধ্যে উপশমহীন চাপা ব্যথা অনুভব করেন। চণ্ডীদাস এই অন্তর্বেদনার কারণ নির্ণয় না করে নাটকীয় ভঙ্গিতে রাধার মনোবেদনার সূত্রগুলিকে তুলে ধরেছেন একের পর এক—

১. রাধা একাকী বসে থাকেন।
২. তিনি কারও কথা শোনেন না।
৩. শ্যাম-ঘন মেঘ দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।
৪. রাধা আহার ত্যাগ করেন।
৫. যোগিনীর মতো তিনি রক্তিম বসন পরেন।
৬. ফুলের গাঁথনি সরিয়ে নিবিষ্ট মনে কৃষ্ণবর্ণ কেশ দেখেন।
৭. রাধা আপন মনে আপনি হাসেন।
৮. শ্যামলঘনকান্তি মেঘের দিকে দু'খানি বাহু বাড়িয়ে কি যেন বলেন আনমনে।
৯. ময়ূর-ময়ূরীর নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ কণ্ঠ নিরীক্ষণ করেন।

রাধার মানসিক বিপর্যয়ের কারণ উল্লেখ না করে চণ্ডীদাস সূত্র পরম্পরায় তাঁর মানস-বৈকল্যের চিত্র উপস্থাপন করে একেবারে পদটির শেষে জানালেন—

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে।।[২৩]

এখানেই চণ্ডীদাসের নিজস্ব 'স্টাইল', তিনি রাধার ভাবান্তরের কারণ জানালেন শেষের ত্রিপদীতে এসে এবং 'নব পরিচয়' এতখানি গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পরিচয় কখনও পুরোনো হতে জানে না। 'অনুরাগ' পর্যায়ে কবিবল্লভ এই অনুভূতিকে প্রকাশ করেন এভাবে—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।[২৪]

চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাসের পদে রূপারতি আছে ঠিকই, কিন্তু তা অনেকাংশেই চণ্ডীদাসের রাধার মতো রূপপিপাসার্ত নয়ন দুটি বেদনায় অশ্রুসিক্ত —

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।[২৫]

অনলংকৃত ভাষায় ধ্বনি ও ভাবের যে অপূর্ব সমন্বয় এ পদে ধরা পড়েছে তা এক কথায় বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনারই পরিচয়। অনুভূতির অতলস্পর্শী গভীরতা এবং 'প্রেমমগ্নতার এমন মোহময় আবেশ' জ্ঞানদাসের পদের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণরূপ দু'নয়ন ভরে দেখেও জ্ঞানদাসের রাধার মনে হয় 'রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।' তিনি শ্যামনাম শুনে অত্যন্ত পুলক অনুভব করেন। ঘরের প্রত্যেকে তাঁকে নিয়ে আলোচনা-রসালোচনা-সমালোচনা করেন। কিন্তু তাতে কী যায় আসে রূপানুরাগিণী রাধার। জ্ঞানদাস অবশ্য রাধা-পক্ষ অবলম্বন করে বলেন 'লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি।' সত্যিই তো, লজ্জার ঘরে আগুন না দিলে কৃষ্ণধনকে কি অন্তর্লোকে পাওয়া যায়? রাধা যদি জানতেন

কদম্বতলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কৃষ্ণ; তাহলে তিনি সে পথে যেতেন না। কেননা, কৃষ্ণ 'নাগর ছলে' রাধার চিত্ত হরণ করে নিয়েছেন। অংশটি মনে করিয়ে দেয় কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের দুষ্মন্তের কথা; যিনি ব্যাধরূপে প্রেমের পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন সজল নয়না হরিণী শকুন্তলাকে। নাগর কৃষ্ণের রূপ দর্শনের পরিণাম—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।।[২৬]

কেবল রূপক অলংকারে উপরের প্রথম দুটি চরণের প্রথমটিতে 'রূপ' উপমেয়, 'পাথার' (সাগর) উপমান এবং দ্বিতীয়টিতে 'যৌবন' উপমেয়, 'বন' উপমান। 'যৌবনের বনে' 'মন হারাইয়া গেল'—ভাবব্যঞ্জক এ বর্ণনায় সচেতন কবি জ্ঞানদাসের প্রতীক নির্মাণের সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত পদের এই অংশটুকু বিশ্লেষণে সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন—

> যে রূপ নয়নে লাগিয়া ও দর্শনকারিণীর সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিয়া তাঁহাকে অমৃতরসে ডুবাইয়া দেয়, উহাকে রূপের পাথার কিংবা সাগর না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? যে যৌবনের চির-নূতন শ্যামল শোভা দর্শনকারিণীর চিত্তকে সৌন্দর্যের গোলকধান্ধায় চিরকাল ঘুরাইয়া ফিরায় ও উহা হইতে বাহির হওয়ার পথ দেয় না, তাহাকে যৌবনের গহন বন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?[২৭]

জ্ঞানদাস ব্যবহৃত অলংকার-অভিনব। গোবিন্দদাসও অজস্র উপমায় সমৃদ্ধ পদ রচনা করেছেন, যেগুলি কাব্যবাণীর পরিপোষক অলংকার নিঃসন্দেহে। বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণকারী গোবিন্দদাস প্রধানত লক্ষ করেছেন কৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটায় মদনও যেন—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরুছা পায়।।[২৮]

গোবিন্দদাসের রাধা যতটা রূপাসক্তি প্রকাশ করেন, মনের বিহ্বলতা ততখানি প্রকাশ করেন না। শ্রীরাধা যেমন শ্যাম অঙ্গের লাবণ্যে চোখে অন্য কিছু দেখতে পান না, চোখে ধাঁধা লাগে, অনুরূপে শ্রীকৃষ্ণও রাধারূপে এতখানি অনুরক্ত যে, তাঁর মনে হয়েছে শ্রীমতী তাঁর 'জীবন' নিয়ে খেলা শুরু করেছেন—

দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি।।[২৯]

একাধিক উপমা অলংকারে কবি এই পদটিকে সজ্জিত করেছেন। যেমন—

১. রাধার অঙ্গের জ্যোতি = বিদ্যুতের ঝলক।
২. রক্তাভ চরণ = স্থলকমলদল।
৩. চঞ্চল ভ্রূ = যমুনার তরঙ্গ-ভঙ্গী।
৪. কাজল টানা চোখ = নীল উৎপল।
৫. মধুর হাসি = প্রস্ফুটিত কুন্দ কুমুদ।

কাব্যদেহে অলংকারের স্থান কখনো সংযোগ সম্বন্ধে যুক্ত নয়, সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত থাকে। 'সমবায়' সম্বন্ধকে ওয়াল্টার পেটার নির্দেশ করেন structural রূপে—'Ornament being far most part structural or necessary'। অলংকারের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্র বিশ্লেষণে ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন—

> কাব্যালংকারকে কাব্যের পক্ষে structural বা organic হতে হবে, কারণ কবি-ব্যবহৃত ভাষার লক্ষ হবে 'long brain wave' সৃষ্টি করা।[৩০]

গোবিন্দদাসের অলংকার প্রয়োগ ও ভাষার নির্মাণ কৌশল এ দিক থেকে সার্থক। তাঁর অলংকৃত বাক্‌বিন্যাস কষ্টার্জিত কবিকল্পনার রুগ্ন ফসল নয়। এই কবির দৃষ্টি রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন তুলে আনার ক্ষমতা রাখে বলেই রাধার পক্ষে এমন বক্তব্য বলা সম্ভব—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গা।
মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনয়ে আন পরসঙ্গা।।[৩১]

রূপে দৃষ্টি ভরা—এই উপলব্ধি তাঁর পক্ষেই সম্ভব সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ ধারণা যার মধ্যে আছে। পূর্বরাগে মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। শুধু শারীরিক ও মানসিক ব্যাকুলতাই পূর্বরাগের প্রধান লক্ষণ। যাকে চাওয়া যায় তিনি অপ্রাপণীয়, তবুও তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি মিথ্যা নয়। পূর্বরাগে আশঙ্কা আছে; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো সমীকরণ সেখানে নেই। তাই জ্ঞানদাসের রাধা কৃষ্ণকে কাছে পাওয়ার আত্যন্তিক ইচ্ছায় অপেক্ষমান। রাধার অনুভূতি 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে/প্রতি অঙ্গ মোর।' এই বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'দেহের মিলন' কবিতায়—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।।

কিন্তু প্রেমের প্রকৃত অবস্থান দেহে নয়, মনে। শেলি অনুভব করেন, 'When passion's trance is overpassed' তখনই প্রেমের পূর্ণতা। পূর্বরাগে রাধা ও কৃষ্ণের বিরহ লক্ষণীয়। ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই হল 'কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা' প্রেমকে পূর্ণ করা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ—তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরল নির্মল বেশে কল্যাণের শুভ্রদীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।[৩২]

'কল্যাণের শুভ্রদীপ্তিতে কমনীয়' হয়ে ওঠে বলে ভালোবাসায় রয়েছে 'ত্যাগের সাধনা'। তাই 'প্রেম' বৈষ্ণবদের পরিভাষায় 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা।' আবার ফিরে আসা যাক রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটি শব্দের চল আছে, ভালোলাগা আর ভালোবাসা।... যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে; যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধনা।[৩৩]

প্রেমের দুটি স্তর রয়েছে—একটি হলো প্রেমের প্রসাধন কলা, অপরটি প্রেমের সাধনাবেগ। ১৩৩৪-এর আশ্বিন থেকে ১৩৩৬'র শ্রাবণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'যোগাযোগ' ও 'শেষের

কবিতা' উপন্যাস, 'মহুয়া' কাব্য এবং 'তপতী' নাটক ('রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত রূপ)। চারখানি গ্রন্থেই 'প্রেম' সম্পর্কে রবীন্দ্রানুধ্যান ব্যাখ্যাত হয়েছে। রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্বের রসগ্রাহী সমালোচক লক্ষ করেছেন—

> দেহকেন্দ্রিক এবং দেহোত্তীর্ণ প্রেমের যে-দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' ও 'তপতী'তে দেখিয়েছেন, 'মহুয়া'য় তাকেই বুঝিয়েছেন 'প্রসাধন কলা' এবং 'সাধনবেগ' কথা দুটির দ্বারা।... 'শেষের কবিতা'তেও প্রেমের এই সাধনবেগ লাবণ্য-অমিতের প্রেমকে দিয়েছিল বিশিষ্টতা।[৩৪]

'প্রেম' এমনই আত্মভোলা পথিক, যে কখনও কামনার রুদ্ধ গৃহে বাস করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন—

> স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্বৃত্তটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কামনা নয়, প্রেমের ঐশ্বর্য নানা বর্ণে-নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এটাও দেখার যে, প্রেমের প্রাপ্তিস্বরূপ যে দুটি ফল—আনন্দ ও বিরহ—তার মধ্যে বিরহ এখানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। আসলে প্রেমের পরিপূর্ণতার কারণে বিচ্ছেদের গুরুত্বকে অস্বীকার করি কেমন করে? 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—বিয়েতে প্রেমের অপমৃত্যু বলে প্রেম যেখানে গভীর সেখানে বিচ্ছেদ অপরিহার্য। তাহলে বিচ্ছেদের হোমাগ্নি থেকে প্রেম উঠে আসে বিশুদ্ধ মূর্তিতে। বৈষ্ণব পদাবলীতে তীব্র দেহাশ্রয়ী প্যাশনের কোনো স্থান নেই, আছে দিব্য অনুভূতির (sublime) স্পর্শ। যে কথা বৈষ্ণব কবি ভক্তির গাঢ়তায় ব্যক্ত করেন, তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এভাবে মূর্ত করেন—

> ভালোবাসো প্রেমে হও বলী
> চেয়ো না তাহারে
> আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

তাই পূর্বরাগ থেকে রাধা ও কৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কে যতই উন্মুখ হয়ে উঠুন না কেন, মিলন সেখানে দূরস্থিত। বরং দু'প্রান্তে অবস্থান করে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁরা মগ্ন। তাঁরা একে অপরকে বুঝতে চান এবং তার জন্যে দুটি প্রাণের মাঝখান দিয়ে অনবরত বিরহের অশ্রু লবণাক্ত সমুদ্রের প্রবাহ বিস্তার করতে হয়। আর তখনই বলা সম্ভব হয়ে ওঠে—"Oh love! let us be true/To one another."[৩৫]

উৎসের সন্ধানে

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'বিদ্যাপতির পদাবলী', পদ সংখ্যা ৬১০
২. ঐ, পদসংখ্যা, ৬১৩
৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ', দে'জ পুনর্মুদ্রণ, দ্বাদশ সর্গ, চতুর্দশ শ্লোক
৪. তদেব, পৃ, ৪০
৫. সত্যবতী গিরি : 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ', ১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ১১০
৬. অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়ে নিতে পারেন বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য বিবেক' গ্রন্থের 'সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ' প্রবন্ধটি।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আলোচনা' থেকে উদ্ধৃত।

৮. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'সাহিত্য বিবেক', ১৯৯৯ খ্রি., দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৫
৯. Sears Reynolds Jayne অনুদিত : 'Commentary on Plato's Symposium'. Fifth Speech. Chapter, III.
১০. কালিদাস : কুমারসম্ভব; ১/২৫
১১. বিদ্যাপতির পদাবলী, পদ সংখ্যা, ১৮
১২. সত্যবতী গিরি : 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ', ১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ১১২
১৩. বিদ্যাপতির পদাবলী, পদ সংখ্যা ৬১৯
১৪. ঐ, পদ সংখ্যা, ৬২৪
১৫. ঐ, পদ সংখ্যা, ৬৩০
১৬. বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ খ্রি. পদ সংখ্যা ১২
১৭. ঐ, পদ সংখ্যা ১৫
১৮. বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', পদ সংখ্যা : ১ (চণ্ডীদাসের পদাবলী সংক্ষেপে চ. প. ধরা হবে)
১৯. চ. প. ২২২
২০. বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৪৩, পদ সংখ্যা, ২০
২১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৩
২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'
২৩. চ. প. ৬
২৪. বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৪৫, পদ সংখ্যা ২২
২৫. ঐ, পৃ. ৪০, পদ সংখ্যা ১৬
২৬. ঐ, পৃ. ৩৩, পদ সংখ্যা ৭
২৭. 'শ্রীশ্রী সোনার গৌরাঙ্গ', (পূর্বরাগ), দ্বিতীয় সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৩
২৮. বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত : 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ', পদ সংখ্যা ২১০ (সংক্ষেপে গো. প. ধরা হবে)
২৯. ঐ, পদ সংখ্যা ২২৪
৩০. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় : 'সাহিত্য বিবেক', দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৭
৩১. গো. প. পদ সংখ্যা ২৬৭
৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'প্রাচীন সাহিত্য', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', পৃ. ৫১২ (বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড)।
৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি'
৩৪. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৬১-২৬২
৩৫. ম্যাথু আর্নল্ড : 'ডোভার বিচ'

সমাজ-দর্শন-ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্বিতীয় যুগনায়ক : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

গীতিকা পণ্ডা

রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মনৈতিক এক অস্থিরতা—অসময় সেসময় : প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা উজ্জ্বল আলোক দান করে। অন্ধকারের বিভীষিকার বিরুদ্ধে সে এক প্রজ্বলন্ত প্রতিবাদ। কিন্তু সলতে পাকাতে হয় অনেক কষ্টে এবং ধৈর্য্যে। কত যুগ পেরিয়ে যায় সলতে পাকিয়ে তেলের সন্ধান করতে। চতুর্থ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী এ বিস্তৃত কালপর্ব ছিল সেই সলতে পাকানোর যুগ। তবে সঠিক সন্ধান করলে খোঁজ মেলে বিন্দু বিন্দু আলোককণার। হয়তো সম্মিলিত জ্যোতিপুঞ্জ সৃষ্টির গৌরবে তারা অসমর্থ, তবু অস্তিত্বটুকু তো ছিল। সে যুগে সেটুকুও অনেকখানি প্রাপ্তি। প্রমাণস্বরূপ বিষ্ণুচারণার ক্ষনিক ঝলক শিলালিপি, মন্দির গাত্র, ধ্বংসস্তুপে উৎকীর্ণ আছে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে খোদিত রয়েছে রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপি। সময়কাল চতুর্থ শতাব্দী। সপ্তম শতাব্দীর এক শিলালিপিতে আছে চন্দ্রবর্মা চন্দ্রস্বামীর কথা। একাদশ শতাব্দীর ভোজবর্মণের শিলালিপি কিংবা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্রশাসন একটি দিকেই বিশেষ ইঙ্গিত দান করে এই নরপতিরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। অজস্র লীলাময় রূপের স্বাক্ষ্য বহন করছে নানান পুরাকীর্তি। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এক গ্রন্থ। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচিত 'শ্রীগীতগোবিন্দম্'। কেবল বিষ্ণুর অবতার রূপ বর্ণন নয়, এক অজেয় প্রেম কথা রমণীয় মূর্তিতে ধরা দিয়েছে সে কাব্যে। যার ঔজ্জ্বল্য, মাধুর্য, মহনীয়তা প্রশ্নাতীত।

এ তো গেল সলতে পাকানোর কথা। কিন্তু কেমন ছিল প্রেক্ষাপট। কতখানি হতাশা আর নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘিরে ফেলেছিল জনমন শান্তি নয়, স্বস্তি নয়, শুধুই হাহাকার। সময়টা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। বাংলা সাহিত্যে যা 'অন্ধকারময় যুগ'। সময়ের ধুলাবালি, ঝড় হয়ে গ্রাস করেছে সব। বন্ধ্যা করেছে

সবকিছু। সর্বত্র রাজনৈতিক অস্থিরতা। তুর্কী আক্রমণে পর্যুদস্ত জনজীবন। হিন্দু প্রশাসককে হঠিয়ে ক্ষমতার দখল নিচ্ছে মুসলিমরা। ফলে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, অত্যাচার, নিপীড়নের লজ্জা গ্রাস করছে একটা যুগকে। পাশাপাশি মঠ, মন্দির ধ্বংস হচ্ছে। জোরজুলুম, ধর্মান্তরীকরণ চলছে জোরকদমে। সমাজের সর্বত্র যথেচ্ছাচারের মাৎস্যন্যায়। সাহিত্যে ধরা আছে সে নগ্নতা—

ধরি আন এ বাঁঙন-বড়ুআ। মথাঁ চড়াব এ গাইক চুড়ুয়া।
ফোট চাট জনউ তোড়। উপর চড়াব এ চাহ ঘোড়।।
ধোআ উড়িধানে মদির সঁধ। দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।[১]

মিথিলার মতো বাংলাতেও চলত এ কদাচার। প্রমাণ আছে ইবন বতুতার বর্ণনায়—"হবঙ্কের অধিবাসীরা বিধর্মী, তারা 'জিম্মা'র (রক্ষণ ব্যবস্থা) অধীন। যে শস্য তারা উৎপাদন করে, তার অর্ধেক নিয়ে নেওয়া হয়।"[২]

এ চিত্র আকস্মিক নয়। যুগে যুগে দুরাচারী শাসকরা এভাবেই আধিপত্য বজায় রেখেছে। তবে ইলিয়াসশাহী সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে এ অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। তার পেছনে কারণও ছিল। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের অধীনতা অস্বীকার করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেছিলেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। অনিবার্যভাবে আক্রমণ করেন ফিরোজ শাহ। কিন্তু হিন্দু জমিদাররা ইলিয়াস শাহকে সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর পৌত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে (প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বা 'ওয়ালি' পদে) বহাল করেন। ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ 'আমীর' পদও লাভ করেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন চলল না। মুজাফফর শামস বলখি নামে এক ধর্মনিষ্ঠ, দরবেশ কোরাণ, হাদিসের বাণী উল্লেখ করে গিয়াসুদ্দিনকে সতর্কবার্তা দেন তাঁর এই হিন্দুপ্রীতি ধর্মবিরোধী এবং গর্হিত। ভবিষ্যতে এই কারণেই মুসলিম প্রজাবিক্ষোভ হতে পারে। ভয় পেলেন সুলতান। দ্রুত হিন্দুদের সমস্ত প্রশাসনিক পদ থেকে বিতাড়িত করেন। তাদের মর্যাদা হ্রাস পায়। অসম্মানজনক ব্যবহারের পাশাপাশি গিয়াসুদ্দিনের পুত্র সিকন্দর শাহ যথেচ্ছভাবে হিন্দুদের মঠ, মন্দির ধ্বংস করতে থাকে। আদিনা মসজিদে বহু মন্দিরের রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে।

বিরূপতার বাতাবরণে অসন্তোষ ক্রমে ধূমায়িত হতে থাকে। আগুন জ্বলে ওঠে হিন্দু জমিদার গণেশের নেতৃত্বে। গোপন গভীর ষড়যন্ত্রে খুন হয়ে যান সুলতান গিয়াসুদ্দিন। বাংলার মসনদ দখল করেন হিন্দু রাজা গণেশ। কিন্তু অত বড়ো অপমান সহজে ছেড়ে দেবে কেন দরবেশরা। তাঁরা শায়েস্তা করার জন্য ডাক দিল জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে। ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হল গোপনে। সে দলে অভাবনীয়ভাবে যোগ দিল গণেশের পুত্র যদু। ধর্মান্তরিত হয়ে সে নাম নিল জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। তার লোভ সিংহাসনে। পেলও পুরস্কারস্বরূপ সিংহাসন। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। অযোগ্যকে হটিয়ে আবার দখল নিলেন গণেশ। উপাধি নিলেন 'দনুজ-মর্দনদেব'। মুদ্রা চালু করলেন নিজের নামে। তাতে চণ্ডীদেবীর লোগো। হিন্দু করবার জন্য শুদ্ধি করলেন পুত্রকে। কিন্তু তাঁর অকালপ্রয়াণ ঘটল। অতঃপর হিন্দু উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রদেব বসল সিংহাসনে। কিন্তু যদু ওরফে জলালুদ্দীন তাকে অচিরকালের মধ্যেই সিংহাসনচ্যুত করল। এরপর অত্যাচার উঠল চরমে। স্বজাতীয়রা এখন বিজাতীয়। নিজেকে মুসলিম প্রমাণ করার তাগিদে হিন্দু মন্দির ধ্বংস, ব্রাহ্মণদের পূজাপাঠ নষ্ট, উপবীত আক্রমণ এইসব দুষ্কর্ম মাত্রা ছাড়ালো। ধর্মনাশ এড়াতে

এবং অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সাত্ত্বিক হিন্দু দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। জলালুদ্দীন নিজেকে 'আল্লাহ্র খলিফা' ঘোষণা করল। মুদ্রা প্রবর্তন করল। আর মক্কা মদীনায় উপঢৌকন দিতে তোষাগার শূন্য করতে লাগল। তার মৃত্যুর পর বালকপুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ সিংহাসনে বসে। কিন্তু অনতিকাল পরেই আততায়ীর দ্বারা খুন হয়ে যায়। এবার উষ্ণীষ চড়ল নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহর মাথায়। পরে সুলতান হন পুত্র রুকনুদ্দীন বরবক শাহ। তুলনায় ইনি ছিলেন পরমতসহিষ্ণু এবং উদার। ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যোগ্য মানুষের মদত করতেন। কিন্তু শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ পিতার নীতি অনুসরণ করেননি। তিনি ছিলেন একে ধর্মান্ধ, অন্যদিকে দস্যুবৃত্তিসম্পন্ন। তবে নিজের কুর্সীর প্রতি ছিলেন যত্নবান। তারজন্য হিন্দুদের বহু মন্দির তিনি অপবিত্র ও ধ্বংস করেন। উত্তরসূরী জলালুদ্দীন ফতেহশাহ ছিলেন আরও উগ্র এবং ধর্মান্ধ। সেসময় গুজব রটে নবদ্বীপের কোনো এক ব্রাহ্মণ গৌড়ের রাজা হবেন। অত্যাচারের অভিমুখ সঙ্গে সঙ্গে একমুখী হল। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর চলল অকথ্য অত্যাচার, উৎপীড়ন, খুন এবং ধর্মান্তরীকরণ। বন্দিও করে রাখা হয়। 'নদীয়া উচ্ছন্ন' নামে এক মিশন নেন তিনি। বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয়। রাজ্যের উত্তর সীমান্তের হিন্দুরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু অভাবিতভাবে ভৃত্যের হাতে খুন হন নবাব। ভৃত্য বরবক 'সুলতান শাহজাদা' নাম নিয়ে সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু ফতেহশাহের আমীর আন্দিল তাকে কিছুকালের মধ্যেই খুন করে নিজে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শা নাম নিয়ে সুলতান হন। তারপর কুতুবুদ্দীন মাহমুদ শাহ এবং পরে শামসুদ্দীন মুজাফর শাহ রাজা হন। তিনি ছিলেন ক্রূর ও হিংস্র। বহু জমিদারকে হত্যা করেন। ফলে সমবেত জনরোষে তিনি নিহত হন। তখন তাঁর প্রধান উজীর সৈয়দ হোসেন, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এই সুলতানের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেবের কর্মলীলা। তাই এই আমলটি ইতিহাসে গুরুত্বের দাবি রাখে।

ক্রমাগত শাসক পরিবর্তন, রাজনৈতিক পরিবর্তন, বিশ্বাসহীনতা এবং ধর্ম সংকট এক অমানবিক যন্ত্রণায় ফেলেছিল বাংলার জনজীবনকে। হত্যা, গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্রে বারে বারে কুর্সী বদল হয়েছে। ঘৃণ্য সে খেলায় সামিল হয়েছে কখনো শাসকদের আত্মজন কিংবা পরিচিতজন। বিশ্বাসভঙ্গের এক প্রেতচ্ছায়া মসীলিপ্ত করেছে মানবিক ধর্মকে। এই আগ্রাসনের কথা আছে সাহিত্যে—

হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।[৩]

এইরকম এক যুযুধান কালপর্বে বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটল চৈতন্যদেবের হাত ধরে। পূর্বেও বাঙালি বৈষ্ণবেরা ছিলেন। জীব গোস্বামীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ পদ্মনাভ, মহাপণ্ডিত রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, কবি মালাধর বসু, শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য, নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিত। কিন্তু কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব। সেই অপ্রাপ্তির পরিসরে বৈষ্ণব ধর্ম ঘনবদ্ধ রূপ লাভ করল ষোড়শ শতাব্দীর মাহেন্দ্র মুহূর্তে। এলোমেলো জনমন এক হরিনামের মাহাত্ম্যে লাভ করল যূথবদ্ধ সংঘশক্তি। লোভ-লালসা-ঘৃণাকে জয় করল সহিষ্ণুতা আর নমনীয়তার মানবধর্মে। অস্পৃশ্যতা অন্তর্হিত হল। হিন্দুধর্মের আন্তরমুক্তি ঘটল সেই মহান ভাবনার স্পর্শে। এক নতুন মানুষ এল। এক নতুন যুগ নিয়ে। তাঁর দেহের সঙ্গে মন একাত্ম হতে চাইল। চিনতে চাইল নিজেকে। আত্মাকে ছুঁতে চাইল বিশ্বাত্মবোধে। কৃষ্ণময় এক অনুভব। শ্রীরাধার ব্যাকুলতা ভেঙে দিল এতকালের সব জীর্ণ আবর্জনা। ধর্ম নয়, কাম নয়, অর্থ নয়, ক্ষমতা নয়, প্রেম। তারই মুখর তন্ময়তা।

চৈতন্যময় মহাপ্রভু—অপূর্ব ধর্মবিপ্লবের মহানায়ক : সময়টা ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। নবদ্বীপ সারা বাংলার বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে তখন প্রতিষ্ঠিত। এখানেই শাস্ত্রজ্ঞ, সাত্ত্বিক পণ্ডিত 'পুরন্দর' জগন্নাথ মিশ্রের বাস। ধর্মপত্নী শচীদেবী জ্যোতিষাচার্য নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা। আটটি কন্যা সন্তানের অকাল বিয়োগের পর শচীদেবীর কোলে এল বিশ্বরূপ। মেধাবী, বিনয়ী, বিদ্যানুরক্ত। তার দশ বছর পর ১৪৮৬ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণ কালে গর্ভাবস্থার দ্বাদশ মাস পূর্ণ করে জন্ম নিল নবজাতক—

প্রথমে প্রভুর জন্মকর্ম সুপ্রকাশ
ফাল্গুন মাসে রাহু চন্দ্র সর্বগ্রাস।[৪]

চাঁদকে রাহুর গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য চতুর্দিক তখন হরিধ্বনিতে মুখরিত। হরিনাম কানে নিয়ে এল সে দিব্য শিশু। নাম বিশ্বম্ভর। মা নিমগাছের তলায় জন্মের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নাম রাখলেন নিমাই। গৌরকান্তি এক প্রাণচঞ্চল শিশু। অবাধ্যতায় মুখর শৈশব। প্রতিবেশীরা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু পুথিপাঠে অত্যন্ত মনোযোগী এই দুরন্ত বালক। অসাধারণ ধীশক্তি এবং মেধা। শ্রুতিধরও বটে। অল্প বয়সেই বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে। পাণ্ডিত্য অলংকৃত, অহংকৃত করে। নামডাক আশপাশ থেকে বহু দূর অব্দি। বিদ্বান পুত্রের গার্হস্থ্য ধর্মও আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না। ঘরে আসে লক্ষ্মীপ্রিয়া পরমা রূপবতী কন্যা। খুশি খুশি মন বিপুল উৎসাহে মগ্ন হয় শাস্ত্রপাঠ-শাস্ত্রালোচনায়। কিন্তু ছন্দপতন ঘটে। অকালমৃত্যু হয় স্ত্রীর। অভাবিত আঘাত। বেদনা, হতাশা, যন্ত্রণা বেপথু করে দেয় স্বাভাবিক জীবন। বাধ্য হয়ে মাতা দ্বিতীয় বিবাহে বাধ্য করেন। বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া কমনীয় মাধুর্যময়ী। কিন্তু ততদিনে গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ দিতে গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্মে হৃদয় অর্পন করেছেন গৌরাঙ্গ। ফিরেছেন হৃদয়ে কৃষ্ণনাম, আর নয়নে বিহ্বল অশ্রু নিয়ে। গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। হৃদয় কোনো এক সুদূরকে ছুঁতে চায়। এক পরম রম্যকে লাভ করার ব্যাকুলতা নিয়ে সন্ন্যাস নিলেন ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত কেশব ভারতীর কাছে। কৃষ্ণভক্তি তাঁর চেতনায়। সে মাধুর্যে পূর্ণভাবে প্রভাবিত শরীর-মন। নাম নিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। চৈতন্য মহাপ্রভু। অসংখ্য নিপীড়িত মানবের আশ্রয়স্থল।

ষোড়শ শতাব্দী পেল এক অলৌকিক মানবকে। জ্ঞানের গরিমা, বিদ্যার অহংকে খোলসের মতো ছুঁড়ে ফেলে জন্ম নিয়েছে এক নতুন মানুষ। গৌর দেহখানি ঘিরে রাধাভাবের মহিমা যেন ধ্যানমগ্ন। অন্তরে কৃষ্ণপ্রাপ্তির হাহাকার। 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতমকৃষ্ণস্বরূপম'। পথে নেমে এসেছেন তিনি। নেমে এসেছে অসংখ্য অনুরক্ত অনুগামী। পথই হয়ে উঠেছে সাধনক্ষেত্র। পুরাণের বৈধীভক্তির জটিলতাকে বন্ধনমুক্ত করে তাকে নৃত্য-গীত ও সংকীর্তনের মাধ্যমে সর্বজনীন মাত্রা দান করলেন। যেন অসংখ্য সখী পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী লীলা। সকলেই সমান। সবার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা। বিধর্মী হরিদাস সহযাত্রী হয়। দুর্বৃত্ত জগাই মাধাই মজে গৌরাঙ্গের চৈতন্যবোধে। যেন এক মহোৎসব। জাতপাত নেই, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ নেই, ধনী-দরিদ্র নেই সবাই কৃষ্ণপ্রেমী হরিভক্ত। নিত্য বৃন্দাবন লীলায় নেমে এসেছে পথে। ঊর্ধবাহু আকাশের পানে। মুক্তির সীমানার খোঁজে। চৈতন্যের উদ্বোধনে। এ এক নিত্যযাত্রা। অনিত্যের যাত্রী সব তবু বিন্দু বিন্দু অমৃতের খোঁজ। সংকীর্তন রীতির ভক্তিপ্রবাহে বহু মানুষ আকৃষ্ট হলেন। মূলত পাঁচ ব্যক্তির যোগদান আলাদা মাত্রা যোগ করল। এঁরা নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, গদাধর পণ্ডিত এবং যবন হরিদাস। (প্রসঙ্গত গান্ধীজীর হরিজন শব্দ সৃষ্টির কথা উল্লেখ্য।) ভক্তিপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীবাসের গৃহে প্রাত্যহিক

সৎসঙ্গের আয়োজন হত। অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর ধরে অবিরাম চলত নামগান। কীর্তন গান নামে জন্ম নিল এক ভক্তি সংগীত। সমবেত সেই সংগীতের অভাবনীয় আকর্ষণ। ভক্ত সংখ্যা বাড়তে লাগল দিনের পর দিন। নগরসংকীর্তনে খোল, করতাল সহযোগে নৃত্য-গীত চলত। সর্বত্রই এক ভক্তিবিহ্বলতা। প্রেমের জোয়ার। মধ্যমণি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

চমকে উঠল প্রশাসন। জনমনের এমন স্বতস্ফূর্ত ঢল পূর্বে দেখেনি কেউ। একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, ধর্মকর্ম নির্বিশেষে সর্বকার্যে একত্র অংশগ্রহণ। এ তো টলিয়ে দিতে পারে যে কোনো প্রশাসনকে। কাজেই শুরু হল ক্ষমতার দুর্বৃত্তায়ণ। ধরপাকড়, শাস্তি, নিষেধাজ্ঞা, শারীরিক নিগ্রহ। অতিষ্ঠ করে তুলল জনজীবন। প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, হরিদাসের সাথে সঙ্গে চৈতন্যদেবও বাদ গেলেন না। কিন্তু হৃদয় যার কৃষ্ণনামে ধৌত, মন যার বৃন্দাবনের রাখাল রাজার সাথে ক্রীড়া করে, তাকে কি কোনোকিছু ভয় দেখাতে পারে? মনোমুগ্ধকর সংকীর্তন দেখতে এসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন শাসক চাঁদ কাজী। চৈতন্যের ভাববিভোর রূপে দর্শন করলেন এক অলৌকিক সম্মোহক ভক্তি। ভুলে গেলেন তাঁর বর্ণ, জাতি, পদমর্যাদা। শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। শিষ্যত্ব নিলেন কাজী হোসেন শাহও। শাস্ত্রজ্ঞ রায় রামানন্দ, বেঙ্কট ভট্ট চৈতন্যের প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে পরম ভক্তে পরিণত হন। কিন্তু পণ্ডিত বাসুদের সার্বভৌম চৈতন্যের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁকে অদ্বৈত বেদান্ত পড়ানো আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছু পরেই চৈতন্য পুরাণের প্রমাণ দিয়ে শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের মতামত খণ্ডন করেন। ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম স্তব্ধ হয়ে যান। সেসময় চৈতন্যের মুখমণ্ডলে খেলা করছিল এক দিব্য আলো। তৎক্ষণাৎ সার্বভৌম 'গৌরাঙ্গাষ্টক' লিখে চৈতন্যের স্তুতি করেন।

যেখানেই গেছেন জনমন জয় করে নিয়েছেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রদেব চৈতন্যের নগর সংকীর্তনে অনুভব করলেন এক অলৌকিক ভাব। বিষয় সম্পদ পরিত্যাগ করে শিষ্যত্ব নিলেন তিনি। দাক্ষিণাত্যের মৎস্যতীর্থ, কচারা, সত্যগিরি প্রভৃতি জায়গায় ঘোরেন। ভাবের আদান-প্রদানের জন্য শিখে নেন তামিল ও মালয়ালাম ভাষা। রায় রামানন্দ নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তের সাথে আলাপ হয়। যে সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ আছে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। গৌড় দেশে ঘটে আর এক অদ্ভুত ঘটনা। হুসেন শাহের মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন দুই ব্রাহ্মণ। কিন্তু নাম পরিবর্তন করে তাঁরা হন সাকর মল্লিক ও দবীর খাস। তাঁরা মহাপ্রভুর লীলায় আবিষ্ট হয়ে চাকরি ত্যাগ করে শিষ্যত্ব নেন। তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা ও সাহিত্যানুরাগ দেখে মহাপ্রভু তাঁদের নাম দেন সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অংশ হিসেবে যাঁরা আজও সমাদৃত। কাউকে উপদেশ নির্দেশ দেননি মহাপ্রভু, তাঁর কর্মই বাণী। সকলকে সমান অধিকার দিয়ে ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি গৌতম বুদ্ধ বা মহাত্মা গান্ধীরই মতো। তাই দেশ, কাল, জাত এবং ধর্মের ঊর্ধ্বে তিনি হয়ে গেছেন সর্বদৈশিক, সর্বকালিক। তাই রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন—"সৌন্দর্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি ব্যাকুলতা উঠে। পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার গান ওঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।"[৫] চৈতন্যের মাধ্যমেই এইভাবে স্বর্গ-মর্ত্যের কথাবার্তা হতে দেখা যায়। এ যেন কেবল এক মানবের আখ্যান নয়, একটা যুগ। যুগের ব্যথা-কথা, প্রাণস্পন্দন একটি মানবের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। যুগ থেকে যুগে সঞ্চারিত সেই 'অভিনব হেম কল্পতরু'। তিনি গৌরাঙ্গ, তিনি চৈতন্য, তিনি মহাপ্রভু। অপূর্ব ধর্ম বিপ্লবের মহানায়ক।

স্বকৃতকৃত পদ, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, জীবনী ও পদাবলী : বাঙালির সমাজমানসে ও সাহিত্যে একটি মাত্র মানুষের এমন একক প্রাধান্য প্রায় বিরল। (উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত)। যদিও চৈতন্যদেব নিজে বিশেষ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। (এ ব্যাপারে তিনি বুদ্ধদেবের মতোই)। শিষ্যদের জন্য 'শিক্ষাষ্টক' এবং কতকগুলি 'জগন্নাথ স্তোত্র' ছাড়া। এমনকি বুদ্ধদেবের মতো মতবাদ নির্দেশকও কোনো গ্রন্থ তিনি রচনা করেননি। তাঁর 'শিক্ষাষ্টক' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত হল—

১. ন ধনং ন জনং সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ ন কাময়ে মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।[৬] (শিক্ষাষ্টক : ৪)

২. তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনয়ঃ সদা হরিঃ।[৭] (শিক্ষাষ্টক : ৩)

৩. তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে
শারঙ্গাধর তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে।[৮]

বৃন্দাবন দাস এই পদটি সম্পর্কে বলেছেন—"চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্তন।"[৯]

সমাজ বিপ্লবের পাশাপাশি বৈষ্ণব সাহিত্যেও ঘটেছে নিঃশব্দ বিপ্লব। পদাবলী সাহিত্যে স্পষ্টতই দুটি বিভাগ লক্ষ করা যায়। এক. পূর্ব চৈতন্যযুগ, দুই. পরচৈতন্যযুগ। মাঝখানে চৈতন্যদেব নিজেই একটি যুগ। পূর্ব চৈতন্যযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় দুই কবি চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি। এই দুই কবির পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাপতির পদে মূলত রূপ নির্মিতির প্রাধান্য। তাঁর মাথুরের পদেও বিষয় সৌন্দর্যের পারিপাট্য। তুলনায় চণ্ডীদাসের পদে অন্তর্মুখী বেদনার নিবিড় একান্ততা। তবে শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ এখানে জীবাত্মা-পরমাত্মা। সখীসাধনার একাত্মতা এখানে অনুপস্থিত। বিষয় এবং বিষয়ী পৃথক। নির্দিষ্ট পথে অনন্তের উদ্দেশ্যে সাধকের যাত্রা।

চৈতন্যদেবের রাগোন্মত্ততা, ভাবাবেশ, মূর্ছা এবং কৃষ্ণের প্রতি তদ্গতভাব নৈষ্ঠিক সাধকের সাধন পথে বিচিত্রতা নির্দেশ করল। গৌরাঙ্গদেবকে বলা হল বিপ্রলম্ভের (বিরহের) মূর্ত বিগ্রহ। পূর্ব যুগের সাধকরা বৈষ্ণব ছিলেন না। বিদ্যাপতি ছিলেন পঞ্চোপাসক, চণ্ডীদাস বাশুলী সেবক। ফলে তাঁদের রচনায় গৌড়ীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব থাকার কথা ছিল না। কিন্তু চৈতন্য সমসাময়িক এবং চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের মধ্যে সে তত্ত্ব প্রকাশ লাভ করল। তার মধ্যে বিষয় কল্পনায় বৈচিত্র্য এনে দিল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্তনের আবহ নির্মাণ গাথা। তার সঙ্গে যুক্ত হল গরাণহাটী, মনোহরশাহী, মান্দারিণী, রেনেটি প্রভৃতি বিচিত্র কীর্তনের ধারা। বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ উত্তরচৈতন্য কবিরা তাঁদের কাব্যে আনলেন সর্বসমতা। যার নাম সখীসাধনা। লীলাদর্শনকারী তাঁরা 'লীলাশুক', মঞ্জরীভাবের সাধক। ভক্তিমার্গের স্থলে অভিষিক্ত হল প্রেমভাব। শান্ত, দাস্যের করজোড় বন্দনা মুক্তি পেল শতধায়। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর বিচিত্র সম্পর্কের নিবিড়ত্ব। সাধারণী, সমঞ্জসার স্তর পেরিয়ে সমর্থা রতিতে মধুরের রস নিষ্পত্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, জীবের কৃষ্ণভক্তি স্বতঃসিদ্ধ নয়, সাধনলব্ধ। পরম্পরা ক্রমে প্রথম স্তর হল বৈধীভক্তি। শ্রীজীব গোস্বামী 'ষটসন্দর্ভ' গ্রন্থে নানান তত্ত্বের আলোচনা করেছেন কৃষ্ণতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, রাধাপারম্যবাদ, প্রেমবিলাসবিবর্ত প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ লীলাশক্তি স্বরূপ, তটস্থা এবং মায়াশক্তি। স্বরূপও ত্রিবিধ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ।

সৎ রূপে সন্ধিনী, চিৎ রূপে সম্বিৎ এবং আনন্দ রূপে হ্লাদিনী। শ্রীরাধা হ্লাদিনীর সার, মহাভাবরূপা—"হ্লাদিনীর সার অংশ তার নাম প্রেম/আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান/প্রেমের পরমভাব মহাভাব জানি/সেই মহাভাবরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।"[১০] কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমের লীলা বিস্তারিকা হলেন সখীরা। তাঁরা বৈচিত্র্য, তাঁরা আবহ, তাই তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম—"কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়/নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়।"[১১]

তবে এ প্রেম লৌকিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রসঙ্গে এসে যায় অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের কথা, যা দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের প্রতিমূর্তি। তিনি যে একাধারে রাধাশ্যামের যুগল বিগ্রহ—"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ/লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।"[১২] তারপর যখন মগ্নতার নিবিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছন তখন মনে হয়—"ন সো রমন, ন হাম রমনী/দুঁহু মন মনোভাব পেষল জানি।"[১৩]

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম পর্যায়ের মতো চৈতন্যলীলারও বিবিধ পর্যায় আছে—১. শ্রীচৈতন্যের রূপ ও মহিমা বিষয়ক, ২. নদীয়া-নাগরীভাব দ্যোতক, ৩. শচীমাতার বাৎসল্য বিষয়ক এসবই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। আর পালাকীর্তনে আবহ সৃষ্টির জন্য ভাবানুযায়ী পূর্বরাগ-অনুরাগ বিরহ-অভিসার বিষয়ক পদ, যা গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) নামে পরিচিত "গৌরচন্দ্রিকা ব্রজলীলার পরমান্নে একবিন্দু কর্পূরের কাজ করে। এই এক বিন্দু কর্পূরে সমগ্র লীলার মাধুরী সম্পূটই সুবাসিত হয়।"[১৪] এই পদগুলি সুর, তাল, লয় যোগে কীর্তন গান আকারে পালায় পরিবেশিত হয়। মহোৎসব হয় চৈতন্যভাবকে সঙ্গে নিয়ে। বৈষ্ণব ভক্তদের ঘটে মহাসম্মেলন। 'খেতুরীর মহোৎসব' তেমনই এক মহাসম্মেলন।

চৈতন্যদেবের মহতী জীবন নিয়ে জীবনীকাররা নানান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলি ইতিহাসে চৈতন্যজীবনীসাহিত্য নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রথম চৈতন্যচরিত সাহিত্য রচিত হয়—১. মুরারি গুপ্তের 'কড়চা'। ২. স্বরূপ দামোদরের 'কড়চা'।

বাংলায় প্রথম চৈতন্যচরিত গ্রন্থ লেখেন বৃন্দাবন দাস। গ্রন্থনাম চৈতন্যভাগবত'। এছাড়া লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গাল', চূড়ামনি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়', জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গাল', গোবিন্দদাসের 'কড়চা' উল্লেখ্য। সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। গ্রন্থটিতে কাব্য, দর্শন ও ইতিহাসের ত্রিবেণী সঙ্গাম ঘটেছে। এছাড়া বৃন্দাবনের 'ষড়গোস্বামী' চৈতন্যদেবের লৌকিক রূপের অলৌকিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। জীবন যখন জীবনী হয়ে যায়, তখন তার মূল্য অমূল্য। এগুলি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নবিশেষ।

অপূর্ব এক মানব। অনিন্দ্যকান্তি, সুরভিত তনু। দৃষ্টিতে আবেশ, হৃদয়ে অনন্ত বিস্তার। সৌষ্ঠবে সমর্পন, সর্বাঙ্গে কৃষ্ণরতি। তাঁর জীবন হয়ে যায় জীবনীকাব্য, আচরণে ফুটে ওঠে আশ্চর্য চর্যা। কর্ম হয়ে যায় ধর্ম, ধর্ম হয়ে ওঠে তত্ত্ব, তত্ত্ব জন্ম দেয় দর্শনের। মানব হয়ে যায় মহামানব। অনন্ত তার পথ। অন্তহীন ইশারা।

উৎসের সন্ধানে

১. বিদ্যাপতি : 'কীর্তিলতা'
২. ইবন বতুতা : 'ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত'

৩. বৃন্দাবন দাস : 'চৈতন্যভাগবত'
৪. জয়ানন্দ : 'চৈতন্যমঙ্গাল'
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সাড়া', বৈষ্ণব কবির গান, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫ খণ্ড, বিশ্বভারতী
৬. শিক্ষাষ্টক : শ্রীচৈতন্য
৭. তদেব
৮. বৃন্দাবন দাস : চৈতন্য ভাগবত
৯. তদেব
১০. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ, ১২৩ সংখ্যক পদ
১১. তদেব : মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ, ১৬৮ সংখ্যক পদ
১২. তদেব : আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৮৫ সংখ্যক পদ
১৩. তদেব : মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ, ১৫৩ সংখ্যক পদ
১৪. তদেব : মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ, ২৫৫-২৫৬ সংখ্যক পদের সরলার্থ

তথ্যের সন্ধানে

১. সুখময় মুখোপাধ্যায় : 'চৈতন্যদেব জীবনী', কালক্রম, পরিমণ্ডল, প্রিয়মণ্ডল-ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা
২. স্নাতক বিজয়েন্দ্র চৈতন্য মহাপ্রভু এক জীবনচিত্র ভিস্যুয়াল পাবলিসিটি, নিউ দিল্লি
৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্যটীকা', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা
৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : 'বৈষ্ণব পদাবলীর রূপরেখা', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা
৫. দিলীপকুমার দত্ত : 'বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে' অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ১৫ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা

নবজন্মতত্ত্বে ‘লোকপুরাণ’ মনসামঙ্গলকেন্দ্রিক নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য

সৃজন দে সরকার

ভারতীয় সাহিত্য ধারায় মৌখিক সাহিত্যের পরম্পরা আবহমান কাল হতে বিরাজমান। সেই সূত্রেই এসেছে পরবর্তীকালের লিখিত সাহিত্যের প্রেক্ষাপট। সেখানে অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়েও অনেক সময়ে আমরা ফিরে যেতে সক্ষম হই—সেই প্রাচীন মৌখিক সাহিত্যের পটভূমিকায়। অর্থাৎ, এটি একটি দ্বিমুখী বিষয়। যেখানে, একটি উৎসমুখ যেমন বিষয়টির পালিত রূপকে প্রকাশ করে দেয়, তেমনই তার নবনির্মিত লিখিত বা শিষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সেটিকেই প্রকাশিত হতে দেখা যায় আবার। এভাবেই, একটি চলমান সাংস্কৃতিক বিষয়ের ধারাবাহিক পর্বান্তর চলতে থাকে। এখানেই, একটি সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে তার সজীবতার লক্ষণ। আমাদের আলোচনাতে দেখানোর চেষ্টা থাকবে কীভাবে একটি মৌখিক সাহিত্য বিষয় বা তার উপাদানমূল, একটি সময়ের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করতে করতে এগিয়ে চলতে থাকে এবং শুধু তাই নয়, সে তার নিজের অবস্থানের ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের পরবর্তী সময়ের বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে পরিবর্তিত করে নিতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে, আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের অভিমুখটিকে বুঝে নিতে মনসামঙ্গলকেন্দ্রিক কাহিনির একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী দিককে সামান্য পর্যালোচনা করে দেখা চলে। সেখানে সহজেই চোখে পরে—সর্পদেবী হলেও মনসা নিজে সাপ নন। তিনি সর্পের দেবী এবং অনেক জায়গায়—তাঁর ধ্যানমন্ত্রে ও পূজার উপাদানের ভিত্তিতে তিনি সর্পের অবস্থান্তরের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই ধারণাটি অত্যন্ত সুপ্রাচীন এবং মোটামুটি ৮০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে মিশরীয় সভ্যতায় এই ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তারপরে এটি পরিভ্রমণ তত্ত্বের নিরিখে নানা দেশে পরিভ্রমণের সূত্রে চলে এসেছে

ইয়োরোপীয় দেশ, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতে। তারপরে এটি আসে—পলিনেশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ অঞ্চল হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসহ অস্ট্রেলিয়াতে, এভাবেই এই ধারণাটি ছড়িয়ে যায় সারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে। এখানেই শেষ নয়, সকল স্থানেই হয় সাপকে, অথবা সাপের প্রতীক হিসেবে কোনো একটি টোটেম বা মূর্তিকে পূজা করা হয়ে চলেছে আজও। সেই সূত্রেই পূজার প্রয়োজনে দেখা দিয়েছে কাহিনি। সেখান থেকেই 'লোকপুরাণ'।

কিন্তু, 'লোকপুরাণ'-এর ধারায় এই কাহিনিকে কীভাবে আনা যায়! সাপের প্রতি মানুষের ভয় ও ভীতি পৃথিবীর আদি লগ্ন থেকেই বিদ্যমান। সেই ভয়কে জয় করতেই নানা সময়ে মানুষ নিজ ইচ্ছায় নানা কাহিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেখানে থেকে মানুষের বংশ পরম্পরায় সেইসব কাহিনি প্রচলিত হয়ে এসেছে—মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা কিংবা নিজের শোনা সেইসব কাহিনিকে নিজের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শুনিয়ে বিষয়টির প্রতি সম্ভ্রমবোধ জাগানোর চেষ্টা করেছেন। সেই সূত্রেই কাহিনিতে এসেছে পাঠভেদ। এই পাঠভেদ যুক্ত কাহিনিগুলির মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে নানা অতিপ্রাকৃত ও অতিবাস্তব বিষয়ের সম্ভাবনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে। মানুষ নিজের জীবনধারণের স্বার্থে মেনে নিয়েছে—সেই সকল বিষয়, আর সেই ভীতি ও ভয়ের সঞ্চারণ থেকে জাগ্রত হয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে সে পূজা দিয়েছে। এই কাহিনিগুলোর মধ্যে যখনই কোনো বিষয় কালোত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী সময়ে বেঁচে থেকে নতুন সময় ও সমাজের কাছে নিজের অন্তরে বাহিত বাণীকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা দেখা গেছে, তখনই তাতে 'লোকপুরাণ'-এর লক্ষণ দেখা দিয়ে গেছে। সেগুলি তখন মানুষের নিজের প্রয়োজনে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে তার কাছে। অর্থাৎ, সে নিজে যে বিষয়টিকে নিজের ভয় কাটানোর জন্যে তৈরি করে নিয়েছিল—এবারে তা দিয়েই সে নিজে বিষয়টি জয় করে ও তার বাস্তব অবস্থানের প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের সময় এবং সমাজকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

'লোকপুরাণ' হয়ে ওঠার সার্বিক দিকটি এখানেই সহজে পরিস্ফুট করে নেওয়া যায়। এরপরে, মনসাকেন্দ্রিক কাহিনির সূত্র ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে প্রাচীন হলেও, বাংলার ঐতিহাসিক অবস্থানের বিচারে তা মোটেই সুপ্রাচীন নয়। তবুও, মনসা মঙ্গাল গানের লিখিত সংকলনের সময় থেকে বিচার করলে এটি একটি অন্যতম প্রাচীন শাখা হিসেবে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম। তবে, ভারতীয় ক্ষেত্রে গুগাপীর (পাঞ্জাব), নাগেশ্বর (বেনারস), নাগ ডিও (মধ্য ভারত), থ্যালেন (অসম), মরী বা মুদাম্মা (মহীশুর), নাগাম্মা (অন্ধপ্রদেশ), খিচিঙ্গেশ্বরী (উড়িষ্যা), মঞ্চাম্মা (তেলেগু) প্রভৃতির দেখা মেলে। এঁদের সঙ্গে মনসা স্বলক্ষণে উপস্থিত থাকলেও, নিজে পরবর্তীতে প্রকাশমান হয়েছে নানা স্মৃতিশাস্ত্রে, অর্বাচীন পুরাণে কিংবা পূজা পদ্ধতির গ্রন্থে।

'লোকপুরাণ'-এর যে নতুন করে নতুন কালের কাছে জন্মলাভের দিকটিকে তুলে ধরা গেল, সেটিকে বিশ্লেষণের জন্যে এবারে একটি সংক্ষিপ্ত সর্পিল ধারণার সাহায্য নিতে হবে। সেখানে, একটি সাপের মুখ থেকে তার লেজ পর্যন্ত কল্পনা করা হয় সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে। এই ধারণাটি মুখ্যত গ্রিস থেকে আগত। সেখানে পর্যায়ক্রমিক ভাবে আসে আণবিক পদার্থ, পরমাণু, অণু, কোশ, মানবদেহ, জীব বৈচিত্র্য, পৃথিবী, গ্রহতারা, ছায়াপথ ইত্যাদি। এভাবেই, সূক্ষ্ম থেকে এক বৃহতের দিকে চলে এই 'লোকপুরাণ'-এর যাত্রা। সেখানে বলা প্রয়োজন, সেই 'লোকপুরাণ' সব দেশে, সব ক্ষেত্রে একভাবে নিজেকে প্রকাশিত করে না। বা আরও, তার নিজের কোনো না কোনো আংশিক

প্রকাশবহ রূপ সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। বাকিটা তার অন্য কাহিনির সূত্রে সুপ্ত থাকে। এভাবেই, একটি বা একাধিক কাহিনি মূলের সূত্রে একটি সম্পূর্ণ 'লোকপুরাণ' নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে চলে। 'লোকপুরাণ'এর নবজন্মতত্ত্ব হিসেবে পৃথিবীতে নানা তাত্ত্বিক প্রস্থানের জনপ্রিয়তা রয়েছে। আমরা সেখানে সর্পিল আকারে 'লোকপুরাণ' কীভাবে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে—সেটি সামান্য আলোকপাত করতে চেষ্টা করব। সেই সূত্রে নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে কিছু শিষ্ট সাহিত্যের উল্লেখ করে বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই, একটি সর্পিল সমান্তরাল আবর্তনকে কল্পনা করে নেওয়া যায়। যেখানে, একেবারে প্রথম ও ওপরের বিন্দুটি হবে যে মানুষটি প্রথম এই কাহিনির বীজটিকে নিজের মনে তৈরি করেছিলেন তার অবস্থান। তার সঠিক পরিচিতি না পেলেও সেটিকেই প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে মান্য করতে হবে। এই স্তরটি না থাকলে কখনই এটির সমৃদ্ধিমান রূপকে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠত না। এর ঠিক পরেই আসবে একটি সর্পিল আবর্তনের ফলে সৃষ্ট এটির দ্বিতীয় সমান্তরাল স্তর। সেখানে এসেই এর একটি সামগ্রিক না হলেও পরিপক্ক রূপ পরিণত হয়ে আসবে। সেখানে অবশ্যই এটির সামাজিক মান্যতা, বাস্তবিক প্রয়োগ ও ধর্মীয় আচার বিধির প্রাধান্য দেখা যাবে। এভাবেই, তৃতীয় স্তরে এসে যখন সর্পিল আবর্তিত চক্রটি উপনীত হবে—তখনই বলা যায় প্রায় কাহিনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক, পাঠভেদ সমন্বিত রূপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এভাবেই, প্রায় তিনটি বা চারটি স্তর অতিক্রম করে সর্পিল আবর্তনের মধ্যে দিয়ে কাহিনিটি গড়ে উঠবে।

এখানে এসে কাহিনিকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে পরবর্তী স্তরে যাত্রা করার জন্যে। সেখানে পরবর্তী স্তরে আর কিন্তু স্বাভাবিক স্পষ্ট রেখায় স্তরটি চিহ্নিত হবে না। তাকে চিহ্নিত করতে হবে বিন্দু দ্বারা। কারণ, এতে আর কোনোভাবেই নতুন করে কাহিনির সৃষ্টি হতে থাকার সম্ভাবনা থাকে না। সে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে না উঠছে—ততক্ষণ তাকে রেখায় চিহ্নিত করে যেতে হবে। যখনই সে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে প্রকাশিত করে নিয়েছে—তখনই সেখানে বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত রেখায় সেটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

আলোচ্য, স্তরের ক্ষেত্রেও বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত হবার মধ্যে একটি একটি করে কাহিনির নতুন নবজন্মের সূত্র হ'তে প্রাপ্ত কাহিনিকে দেখানো হবে। সেগুলির অবস্থান এই বিষয়টির ওপরেই নির্ভর করবে, পাশাপাশি কাহিনির বিচ্যুতি কিংবা তার পরিগ্রহণের দিকটিকেও স্পষ্ট করে তোলার জন্যে এটি সামগ্রিক পর্যায়ে সহায়তা করবে।

মনসাকেন্দ্রিক কাহিনির ক্ষেত্রে প্রাথমিক দু'টি স্তরে যদি নানা লৌকিক পূজা ও ব্রতকথার স্তরে থাকা কাহিনিকে চিহ্নিত করা যায়। তবে, এর দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে আসবে নানা মঙ্গালজ্ঞান রচয়িতার রচিত বা লিখিত পুথি নির্ভর মঙ্গালকাহিনি। এই কাহিনির নানা পাঠভেদ মেলে, সেই বিষয়টি থেকেই একটু একটু করে বেরিয়ে এসে সময়ের অপেক্ষায় বিশ শতক বা একুশ শতকে দাঁড়িয়ে নতুন পর্যায়ে রচিত হয়ে চলেছে কাহিনি। সেগুলির মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় কাহিনিসূত্রের দেখা মেলে—উপন্যাস হিসেবে দীনেশচন্দ্র সেন-এর লেখা 'বেহুলা', সেলিনা হোসেন'-এর লেখা 'চাঁদবেনে', অমিয়ভূষণ মজুমদার'এর লেখা 'চাঁদবেনে', অভিজিৎ সেন'-এর লেখা—'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উল্লেখযোগ্য। নাটক হিসেবে মীর মোসারফ হোসেন'-এর লেখা 'বেহুলা গীতাভিনয়', হরনাথ রায়'-এর লেখা 'বেহুলা', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর লেখা 'চাঁদ সদাগর',

মন্মথ রায়'-এর লেখা 'চাঁদ সদাগর', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর লেখা 'সওদাগরের নৌকো', শম্ভু মিত্র'-এর লেখা 'চাঁদ বণিকের পালা', দেবেশ চট্টোপাধ্যায়'-এর লেখা 'চাঁদ মনসার কিসসা' উল্লেখযোগ্য। ছোটোগল্পের মধ্যে অবশ্যই মহাশ্বেতা দেবী, বিমল কর, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখা গুরুত্বপূর্ণ ছোটোগল্পের মধ্যে দিয়ে এই কাহিনির নবজন্মের ইঙ্গিত। অন্যদিকে, কবিতাতে দেখা যায় কালিদাস রায়'-এর লেখা 'চাঁদ সদাগর', জীবনানন্দ দাশ'-এর লেখা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'-এর লেখা 'লখিন্দর' শীর্ষক একটি সমগ্র কাব্যগ্রন্থের অসংখ্য কবিতা, বিষ্ণু দে'-এর লেখা 'এবং লখীন্দর', শঙ্খ ঘোষ'এর লেখা 'হেতালের লাঠি', জয় গোস্বামী'-এর লেখা 'ডিঙ্গা' শীর্ষক কাব্য। অন্যদিকে, চিত্রকলায় মেলে এই 'লোকপুরাণ'-এর নবজন্ম লাভের প্রসঙ্গটি। সেখানে বিবেচনা করা চলে গণেশ পাইন, কে জি সুব্রহ্মণন, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, শিভানু ভট্ট, মনোতোষ বসাক, তপন সিদ্ধান্ত প্রমুখের চিত্রকলা।

আলোচ্য এই সাহিত্য ও চিত্রকলায় প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক স্তরের সবগুলির মধ্যেই সেই তৃতীয় স্তরের ভিত্তিমূলক 'লোকপুরাণ'-এর ঐতিহ্যগত পুনরাবর্তনকে খুঁজে নেওয়া যায়। সেই সঙ্গে সন্ধান করে নেওয়া যায়, সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে কীভাবে সেই কাহিনির সূত্রটি জায়মান থাকছে, কীভাবেই বা নিজেকে নবজন্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই সজীবতাই একটি 'লোকপুরাণ'-এর প্রবহমান হয়ে থাকার লক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গালকেন্দ্রিক কাহিনিসূত্রের নবজন্মের সর্পিল রেখাচিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই সূত্রগুলিকে শুধু অনুসন্ধান করা গেল—সেগুলিকে প্রায়োগিক দিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখলে অবশ্যই মনসামঙ্গাল কাহিনির আধুনিক সময়ের জটিল অবস্থায় পরিগ্রহণের দিকটিকে স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব হবে। সম্ভব হবে, নিজের সময় ও সমাজে দাঁড়িয়ে প্রাচীন 'লোকপুরাণ'-এর 'অন্ধকার থেকে আলো'তে আগমনের আখ্যানমূলকে আপন প্রেক্ষিতে বিচার করে নিজেদের জন্যে অর্পণ করার। সেখানেই 'লোকপুরাণ'-এর সার্থকতা।

উৎসের সন্ধানে

১. Dr. Pradhut Kumar Maity : 'Historical Studies of the Cult of the Goddess Manasa' Punthi Pustak, Kolkata, 1966

২. স্বামী শংকরানন্দ : 'মনসা চরিত', প্রকাশনী অনুল্লিখিত, কলকাতা, ১৯৫৭

৩. Sukumar Sen : 'Manasa Vijaya', Ed. The Asiatic Society, Kolkata, 1953

৪. Dr. Asutosh Bhattacharjee : 'The Sun and the Serpent Lore of Bengal', Firma KLM Pvt. Ltd. Kolkata, 1977

৫. The One-Eyed Goddess : A Study of the Manasa Mangal, W.L.Smith, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1980

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গাল’ প্রসঙ্গ শৈলীগত অনুধাবন

সন্দীপ দাস

পাশ্চাত্য মডেলীয় পরিভাষা ‘Style’ থেকেই বাংলায় শৈলী কথাটি এসেছে। আবার এই শৈলীকে জানা ও চেনার তাগিদে শৈলীবিজ্ঞানের (Stylistics) জন্ম। দুটি ভিন্ন বস্তু হলেও, একে অপরের সঙ্গো সম্পৃক্ত। বিশ শতক ও বর্তমানের সাহিত্য সমালোচনায় এই শৈলীবিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ, সাহিত্য যে আদতে একপ্রকার ভাষাশিল্প, সেটা বর্তমানে মানুষ নতুনভাবে উপলব্ধি করার সঙ্গো সঙ্গো, তাই ভাষাকেন্দ্রিক সাহিত্য সমালোচনার অগ্রগতিও দ্রুততার সঙ্গো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই কারণে, কবিতা কিংবা গদ্যের ভাষার বিশ্লেষণ এবং ‘text analysis’ বা অন্তর্বয়ন বিশ্লেষণ বর্তমান ভাষা-গবেষকদের অন্যতম দায়িত্ব হয়ে পড়ে। এখন সাধারণত প্রশ্ন উঠতে পারে এই শৈলীবিজ্ঞান বিষয়টি কী উত্তরে বলা যেতে পারে, যেমন ভাষার বিজ্ঞানমুখী চর্চা থেকে ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম, তেমনি সাহিত্যের অন্তর্বয়নের বা টেক্সটের বস্তুমুখী ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকেই শৈলীবিজ্ঞানের উদ্ভব। তবে ভাষাবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞান একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে বিস্তর আবার মৌলিক দু-একটি ধারণার সঙ্গো তর্কও আছে সমানতালে। ভাষাবিজ্ঞান যেমন টেক্সটের ভাষাকেই গুরুত্ব দেয়; বিশ্লেষণ করে তার নানা ব্যাকরণভিত্তিক সাংগঠনিক দিক। তার উপাত্ত হয় শুধু ভাষার সংগঠন। কিন্তু শৈলীবিজ্ঞান শুধু একজন লেখকের সাহিত্যের ভাষার সংগঠনই দেখে না, তাঁর রচনার কৌশল, কাল ও সমাজকেও গুরুত্ব দেয় সমানভাবে। পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে শৈলী ও শৈলীবিজ্ঞানের একটি সহজ সংজ্ঞা খোঁজার চেষ্টা করা যাক। তারপর প্রবন্ধের মূল বিষয় ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গাল’র অন্তর্বয়নের মধ্যে লেখক ও বিষয়ের শৈলীর অনুধাবন করা হবে।

সমস্যা হল, শৈলীর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা’ই নেই। কারণ, শৈলীর অর্থ-তাৎপর্য বড়ো বিচিত্র। লেখকের ব্যক্তিত্ব, রচনার বিষয় এবং শ্রেণি, কালসীমা,

লেখক-পাঠক সম্পর্ক প্রভৃতি মাত্রানুসারে শৈলী বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়।'[১] ফলে স্টাইলের এই বিস্তৃর্ণ পরিসরের সংজ্ঞা নির্ধারণ বেশ দুরূহ হয়ে পড়ে। এই কারণেই হয়তো আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী ক্রিস্টাল ও ডেভি মন্তব্য করেছেন, শৈলী আমাদের কাছে অতিপরিচিত শব্দ হলেও একাধিক সংজ্ঞা এর অর্থ দুর্বোধ্য করে তুলেছে।[২]

তবুও শৈলীর একটি সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ ক'রে পবিত্র সরকারের মতো, শৈলী হল কোনো লেখকের দ্বারা সচেতনভাবে অথবা তাঁর অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত ভাষাগত উপায়, যার সাহায্যে স্রষ্টা ও পাঠকের অভিপ্রেত যোগাযোগ সম্ভব হয়। আবার অন্যদিকে, শৈলীবিজ্ঞান লেখকের রচনাশৈলী বিশ্লেষণের অন্যতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যা সাধারণত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করে।'[৩] ঠিক এই কারণে সিম্পসন তাঁর Language through Literature' গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন—"The brench of language study which is principally concerned with this integration of language and literature."(১৯৯৭: ২)।[৪] অর্থাৎ সমালোচকের ব্যক্তিগত অনুভূতির মূল্যায়ন নয়, রচনার তন্ময় এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণই শৈলীবিজ্ঞানীর লক্ষ্য।[৫]

এবার আসা যাক্ প্রবন্ধের মূল আলোচনায়। শৈলী কী এবং শৈলীবিজ্ঞানই-বা কী বস্তু? সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নেবার পর, আমরা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের শৈলীগত নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করব নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে। তার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া ভালো। শৈলী যেহেতু একজন লেখকের রচনা সার্ফেসের নির্বাচন প্রক্রিয়া, সেহেতু লেখকের সমগ্র সাহিত্য জীবনের শৈলী কখনই এক হতে পারে না। অর্থাৎ একথাও বলা যায়, শৈলীর উপর কোনো সময় বা যুগের প্রভাব বর্তায়। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাস বা ছোটোগল্পের সার্ফেস স্ট্রাকচার যেমন ছিল, পরবর্তী 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ' কিংবা 'দেনাপাওনা' ও 'মধ্যবর্তিনী'তে এসে সেই অধিবাচনিক সাংগঠন আমরা আর পাই না। এ প্রসঙ্গ 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের আলোচনায় আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ, মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্যের রচনা নির্মাণ শুরু হয় চতুর্দশ শতক থেকেই; একটি নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে। কি সেই অভিপ্রায়? না, উদ্দিষ্ট দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করা। মধ্যযুগের শেষ মঙ্গালকাব্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল'। তাই এর কাব্যশৈলী নির্মাণে ভারতচন্দ্রের ওপর পড়েছে মূলত তিন ধরনের প্রভাব—

১. যুগের প্রভাব। অর্থাৎ সমকালীন সমাজব্যবস্থা, রাজার আনুগত্য, দারিদ্র্যতার লাঞ্ছনা, এবং পুরাতন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিকীকরণের দ্বন্দ্ব। যা তাঁর কাব্যে স্পষ্ট। তবে পুরাতনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না করলেও নতুনকে গ্রহণ করেছেন তিনি অকাতরে।
২. পূর্ব মঙ্গালকাব্যের লেখক ও রচনাশৈলীর প্রভাব। তার ফলে কাব্যের সার্ফেস কাঠামো হয়েছে, ওই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক থেকে চলে আসা মঙ্গালকাব্যের ছাঁদে। তার ভাব, কিছুটা ভাষা নির্বাচন, ও প্রকরণগত নির্মাণ অনেকটাই একই। যেমন, কাব্যের শুরুতেই বন্দনা অংশ। আট প্রকার দেবদেবীর চরণবন্দনা দিয়ে কাব্যের বন্দনাখণ্ড নির্মাণ। তারপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, ও শেষে প্রচলিত দুই সার্ফেস, 'দেবখণ্ড' ও 'নরখণ্ড'। যেন কাব্য কেন লিখলেন কবি, সেটা বলে দেওয়া তাঁরই দায়! এটা যুগপ্রেক্ষাপটের প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩. প্রাচীন ও অর্বাচীন যুগসন্ধির প্রভাব। ভাষায়-ভাবে, বাক্যনির্মাণে, কিংবা শব্দ নির্বাচনে। তাই অন্নদামঙ্গালে সহজেই চোখে পড়ে একদিকে আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য ও অন্যদিকে সমানতালে লৌকিক শব্দের প্রাচুর্য।

'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের শৈলী নির্ধারণ করতে শৈলীবিজ্ঞানের কয়েকটি প্যারামিটারের কথা উল্লেখ করতে হবে; এবং সেই উপাত্ত ভিত্তিতেই প্রবন্ধ মধ্যস্থিত কাব্যের শৈলীগত অনুধাবনের কাজটি যথাসম্ভব সম্পন্ন হবে। মূলত সাতপ্রকার শৈলী উপাদান দিয়ে দেখার চেষ্টা করব এই প্রবন্ধে, অন্নদামঙ্গালের সার্ফেস এবং লেখকের শৈলীর পরিকাঠামো। যথা নিম্নে ক্রমশ আলোচ্য—

মিল ও পুনরুক্তি : কবিতার শৈলী বিচারে মিল কিংবা পুনরুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এই মিল বা পুনরক্তি যথাসম্ভব একজন কবির সচেতনভাবে কাব্যিক শরীর গঠনের সুষ্ঠ প্রকৌশল। কখনো শব্দের স্তরে, আবার কখনো-বা এক বা একাধিক বাক্যের কিংবা পদগুচ্ছের স্তরেও এই মিল বা পুনরক্তি ঘটিয়ে থাকেন কবিরা। কিন্তু এই মিল কাব্য-শরীরের যে স্তরেই ঘটুক-না কেন, একর্থে তা ধ্বনিগত মিল বা পুনরক্তির আওতায় পড়ে। শৈলী বিচারে এর গুরুত্ব কোথায়? গুরুত্ব আছে! একটা কবিতা কীভাবে কবিতা হয়ে ওঠে কিংবা গদ্য থেকে নিজের জেনারকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে, কিংবা শ্রোতার কাছে একধরনের শ্রুতিগত সংবেদনার বাহকের কাজ করে এই মিল বা পুনরক্তি। লিচ এই কারণই পুনরক্তিকে বলেছেন—'ECHOIC aspect of literary language' (১৯৮৪ : ৭৩)।[৬] আসলে একটি কবিতায়-তো ধ্বনির পুনরাবর্তন গড়ে তোলে মিলের প্যাটার্ন, যার সুমিত ও সংযত প্রয়োগের ফলে রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন, মিল বলতে যে শুধুমাত্র চরণান্তে একই ধ্বনির কিংবা সমবর্গের ধ্বনির পুনরাবৃত্তি তা-তো নয়, মিল ঘটতে পারে একই চরণের পর্ব, উপপর্ব, পর্বাঙ্গ কিংবা দলের মধ্যেও। যাকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় অনুপ্রাস বা alliteration বলা হচ্ছে। এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রচুর। অল্পপরিমাণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে।।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জলে
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।।(২৫৪)

এখানে শৈলীগত মিল বা পুনরাবৃত্তির বিভিন্ন প্যাটার্ন ভারতচন্দ্রের প্রকৌশলে সৃষ্ট হয়েছে। প্রথমত চরণান্ত্য মিল। দ্বিতীয়ত, চারটি চরণে চোদ্দো বার 'ল' এবং প্রথম চরণে পাঁচ বার 'ক' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি, যা কাব্যপাঠে একটি শ্রুতিগত সংবেদন সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, একই চরণে ধ্বনিকেন্দ্রিকতার (ফোনোসেন্ট্রি সিটি) অর্থাৎ একই পদের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে, 'কমল' ও 'পরিমল' শব্দবন্ধের মধ্যে (মল শব্দের পুনারাবৃত্তি), আবার চতুর্থ চরণে 'উছলে' ও 'কূলে' শব্দে একই প্যাটার্ন পরিলক্ষিত হয়। এই মিল আবার চরণের আদিতেও ঘটতে পারে—"আই আই আই/ওই বুড়া কি/এই গৌরীর বর লো। কিংবা 'ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আদি সাঁদি'।"(২২৯)

এবার 'অন্নদামঙ্গাল'-এর চরণান্ত মিলের আধিক্যে ভারতচন্দ্রের সফলতার কথায় আসা যাক। এখানেও কবি সিদ্ধহস্ত। চরণের শেষে ধ্বনিপুঞ্জের পুনরাবৃত্তের ফলে সৃষ্ট হয় পাঠকের মনে এক

প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা হল, একই ধ্বনির প্রত্যাবর্তন। যেমন—'ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যা পান ঠাকুর/তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর' কিংবা 'লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা/ছলচ্ছল টলট্টল কল কুল তরঙ্গা'(২৭৫) ইত্যাদি।

'অন্নদামঙ্গাল'-এ শুধু ধ্বনি নয়, শব্দ কিংবা বাক্যিক স্তরেও পুনরাবর্তনের প্রয়োগ চোখে পড়ার মতো। সেক্ষেত্রে সমান্তরাল সংগঠনে (Parallel structure) সাহায্য করেছে সর্বনামীয় পদের পুনরুক্তি। বিশেষত, অনির্দেশক বা প্রশ্নসূচক সর্বনামের পুনরাবর্তন প্রায় ক্ষেত্রেই একটি অনুকরণীয় লক্ষণ হয়ে উঠেছে। 'কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া বাপ/কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ/কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল...(২৭৮) ইত্যাদি। আবার অনেক সময় অন্নদামঙ্গালে বাক্য গঠনে ক্রিয়ার পুনরাবর্তন বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির মধ্যে সংলগ্নতার (cohesiveness) সৃষ্টি করেছে। হংস পৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি/...গণসহ গণেশ আইলা গজানন/...ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ। (২৮৪) যদিও প্রবন্ধে আগে আলোচিত, তবুও বিশেষভাবে আরেকবার উল্লেখ্য একই বাক্যে পদের পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে কাব্যের বিশিষ্ট ভাব কখনো কখনো প্রমুখিত (Foregrounding) হয়ে উঠতে দেখা গেছে অন্নদামঙ্গালে—"কমল আসন/কমল ভূষণ/কমলমাল ললিত/কমল-চরণ/কমল বদন/কমল নাভী গভীর।"(২৪৬) অর্থবহ শব্দের মতোই সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহারে পুনরক্তি দেখি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে।

চারি বেদে তব গুণগান করিবারে/ চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে/ চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত। কিংবা 'দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন...'(২৭২) ইত্যাদি। আরও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, বিভিন্ন ব্যাকরণিক গঠনগত উপাদানের (উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতি) পুনরক্তির মাধ্যমেও মিলের বিন্যাস গড়ে তুলেছেন ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে—"অচক্ষু সর্বত্র চান/অকর্ণ শুনিতে পান/অপদ সর্বত্র গতাগতি।" কিংবা "চণ্ড—বিনাশিনী/মুণ্ড নিপাতিনি/শুম্ভ-নিশুম্ভ ঘাতিনি" (২৫১, ২৪৫)

■ **অন্নদামঙ্গালে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দ দ্বৈতের প্রয়োগ :** ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা চলে। কারণ তিনি ছিলেন ধ্বনির জাদুকর। অভিজিৎ মজুমদারের মতে, "ধ্বনি দিয়ে ছবি আঁকেন তিনি, নিস্তরঙ্গা শব্দের শরীরে সঞ্চারিত করেন গতির মূর্ছনা।"[৭] সত্যিই-তো 'অন্নদামঙ্গাল' ধ্বনির সচেতন নির্মাণ যেন কবির নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে উঠেছে। আর তার ফলে সমগ্র কাব্য জুড়ে গড়ে উঠেছে ধ্বনিমিলের নকশা। ভারতচন্দ্রের ভাষা শৈলীর অন্যতম পরিচয় মেলে তাঁর কাব্যে ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগের অভিনবত্ব আর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। সমগ্র কাব্যে কমপক্ষে ষাটটির মত ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে। সমস্ত উদাহরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়, কিছু উদাহরণ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি—

১. লক্ লক্ ফণী জটা—বিরাজ/ তক্ তকতক্ রজনীরাজ। (২৬৬)
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ/ বিমল চপল গাঙ্গিয়া।

২. কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।/গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে।/...তর তর থর থর ঝর ঝর রাতে। (২৮৭-৮৮)

প্রসঙ্গত ধ্বনিবৃত্তির দুই ধারাই[৮] ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্য সার্ফেসে ব্যবহার করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধ্বনিবৃত্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, মিলের বিন্যাসে কিংবা কাহিনি পরিস্থিতি প্রকাশ মাধ্যমের জন্য।

১. ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।। লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা। (শিবের দক্ষালয় যাত্রা) ২৫৬
২. হুপ হাপ্ দুপ দাপ্/আশ পাশ ঝাঁকিছে।।/অট্ট অট্ট খট্ট খট্ট/ঘোর হাস হাসিছে। (দক্ষযজ্ঞ নাসের প্রসঙ্গা)২৫৭
৩. ববম্ ববম্ বম্ বাজে গাল/ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল।। ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে (শিবের ভিক্ষা যাত্রা)২৭৮
৪. ডেঙ্গার উকুন নিকি করে ইলিবিল।/কোটি কোটি কনিকোটারী কিলি কিলি।। (অন্নদার জরতী বেশে ব্যাস ছলনা) (৩১০)

এবার আসা যাক শব্দদ্বৈত প্রসঙ্গো। 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যে শব্দদ্বৈতের সু-প্রয়োগে কাব্যমধ্যে গতিময় চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে—"এই রূপে কোন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি/ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি।" (২৬৮-৬৯)

■ **ক্রিয়ার প্রয়োগ :** ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' ক্রিয়ার প্রয়োগে যথেষ্ট অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, তাঁর কাব্যে চরণের অন্ত্যমিল প্রায়শই অসমাপিকা ক্রিয়ার পরস্থাপনার (Postposing) ও কখনো পূর্বস্থাপনার (Preposing) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

১. ভাইপো সৌলদজঙ্গো খালাস করিয়া/উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া (২৪৮)
২. না দেখিব সে বদন না হেরিব সে নয়ন/না শুনিব সে মধুর বাণী (২৬৪)

এছাড়াও ভারতচন্দ্রের কাব্যের বাক্যিক গঠনে অসমাপিকা ক্রিয়ার ধারাবাহিক প্রয়োগও শৈলীগত দিক থেকে তাৎপর্যবহ। কারণ, বাক্যে যখন একাধিক ক্রিয়াখণ্ড ব্যবহৃত হয়, তখন তার মাধ্যমে কবিরা কাব্য-কাহিনির অনুপুঙ্খ বর্ণনার (Detailing) মানসিকতা সৃষ্টি করেন। ভারতচন্দ্রও তার ব্যতিক্রমী নন—"এইরূপে ব্যাস গিয়া বারানসী প্রবেশিয়া/ আদি কেশবেরে প্রণমিয়া/ সংহতি বৈষ্ণবগণ/ হরিনাম সংকীর্তন/নানারসে নাচিয়া গাহিয়া।" (২৯৪) কিংবা আবার কখনো ক্রিয়াহীনাতাই হয়ে ওঠে তার কাব্যের সার্ফেস শৈলীর অভিনবত্ব—"বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙা গাছ গাড়ু।/ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু।।" (২৭৫)

■ **কাব্য সার্ফেস : বাক্যিক প্রয়োগ—সমান্তরাল বিন্যাস (parallelism)**

সাধারণত পুনরুক্তির মধ্যে দিয়েই সমান্তরালতা গড়ে উঠলেও সব পুনরুক্তিই সমান্তরতা নয়। এই আপাত বিরোধ বাক্যটির অর্থ এই-যে, সাধারণ পুনরুক্তি হল যান্ত্রিক, কিন্তু আবার যখন এই পুনরুক্তিই রচনার বুনোটকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে তখন সে হয়ে যায় সমান্তরতা পদবাচ্য অন্তর্ভুক্ত। আসলে সমান্তরাল গঠনে এই বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে মিল-অমিলের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গো লিচের বক্তব্য দ্রষ্টব্য—"In any parallelistics pattern there must be an element of identy and element of contrast" (১৮৮৪: ৬৫)।[৯] শিশিরকুমার দাশ বাক্যিক স্তরে সমান্তরতা প্রয়োগ অর্থে বলেছেন, 'বাক্যের মধ্যে নয়, বাক্যের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র অনুচ্ছেদের মধ্যে একধরনের আন্বয়িক উপাদানের আবর্তনের সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ সংগীত এবং সমগ্র অংশের মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য।'[১০] অর্থাৎ এ-কথা স্পষ্টীকৃত যে, বাক্যিক স্তরে সমান্তরতা শুধু মাত্র বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বাক্যস্তর ছাড়িয়ে শ্রোতার অনুভূতিকে আঘাত করে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যে সমান্তরতার সুষ্ঠ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়—

১. ভাগর্বের/ সৌষ্ঠবের/দাড়ি গোঁপ ছিঁড়িল/পূষণের/ভূষণের/ দন্তপাঁতি পড়িল (২৫৬)

২. গদাচক্র তেয়াগিয়া/পাঞ্চজন্য বাজাইয়া/অন্নদা-উদ্দেশে পদ্ম দিয়া/অনশনে যোগ ধরি/তপস্যা করেন হরি/রমা বাণী সংগীত করিয়া (২৮৬) আবার, মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—"গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ/প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গা চরণ/সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িল কমল/চন্দ্রকান্ত মণি দিয়া গড়িলা উৎপল।" (২৮২) 'অন্নদামঙ্গাল'-এর প্রায়শই প্রশ্ন ও নেতিবাক্যের সমান্তরাল বিন্যাস দেখতে পাই। যেমন—"কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।" (২৭৭) এবং "কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি সাপ/কি দোষ করিলি তোর কাশীবাসীগণ/ কেন সাপ দিলি ওরে বিটলা বামন।" (৩০১)

■ **বিপ্রতীপতা :** বাক্যিক ক্রমের বিপ্রতীপতা রচনার শৈলী অনুধাবনের আরেকটি বিশেষ লক্ষণ। এই বিপ্রতীপতা শিশিরকুমার দাশের মতে প্রাচীন বাংলা কবিতা চর্যাপদ থেকেই পাওয়া যায়। চর্যাপদের 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল' কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কে না বাঁশি বাএ বড়াই কালিনী নই কূলে', অথবা চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' প্রভৃতি বিপ্রতীপতার সার্থক উদাহরণ। অন্নদামঙ্গালে বিপ্রতীপতার প্রয়োগ হয়েছে এভাবে—

১. গিয়েছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে/ দিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে (২৭৫), কিংবা

২. লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল/ গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল (২৪৮)

৩. কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে/ নখে নখে বাজায়ে নারদ মুনি হাসে (২৬৮)

■ **সম্পর্কিত বাক্যের প্রয়োগ :** পরস্পর-সম্পর্কিত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমেও রচনার সংলগ্নতা গড়ে উঠতে পারে। মূলত সম্বন্ধী সর্বনামের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলেন কবি—"জল মোরে বলে যেই/ কারণ জলের কারণ সেই/ না ছিল সৃষ্টির আদি যখন/ কাশীপতি কাশী কৈলা তখন।" (৩০৪) এছাড়াও 'অন্নদামঙ্গাল'-এর শব্দের প্রয়োগগত সুকৌশল চোখে পড়ার মত। রচনায় প্রায় তিন শ্রেণির শব্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

১. কোথা হৈতে বুড়া এক ডেকরা বামন (অপ্রচলিত শব্দ) ২৬২

২. যাবে বাপ ঘর/ খেয়াতি হবে কাঙ্গালী (তৎসম শব্দের বিকার, খেয়াতি > খ্যাতি) ২৭৬

৩. কারণ অমৃত-পরিপূর্ণ কিংবা দুহে প্রেম অতিতর (নবগঠিত শব্দ) ২৮৮

অন্নদামঙ্গালের আঙ্গিকগত বিভিন্ন লক্ষণ প্রসঙ্গে শৈলী চর্চায় চলে আসে 'ফ্ল্যাসব্যাক' ও 'ফ্ল্যাস ফরওয়ার্ড'-এর মত ন্যারেটোলজির পরিভাষা। অন্নদামঙ্গালের কাহিনির অধিবাচনে 'ফ্ল্যাস ফরওয়ার্ড' ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে—"হইল আকাশবাণী শুনিবারে পাই/ শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন.../দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার/কংস বধি করিবেন দ্বারকা-বিহার।" (২৬৪-৬৫) এছাড়াও, রচনার অধিবাচন অনেকক্ষেত্রে গড়ে ওঠে সংলাপধর্মীতায় ও বিভিন্ন বাক্‌ভঙ্গি কিংবা প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহারে—

১. শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়/আমারে প্রনাম করা উপযুক্ত নয.../মুনি বলে এই ভয় দেখাও তুমি কারে/তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে। (২৬১)

২. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় (২৪৮)

'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যে অন্যান্য অলংকারের তুলনায় উপমা অলংকারের আধিক্য বেশি। সেক্ষেত্রে সংস্কৃত ও লৌকিক উপমা দুইই ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যে—"সুবলিত ভুজ/ সহিত অম্বুজ/ কনক-মৃণাল রাজে/...কোটি শশধর/ বদন সুন্দর/ ঈষৎ মধুর হাস।" (২৪৫) এছাড়াও অন্য দৃষ্টান্ত হল—"উমার কেশ চামরছটা, তামার শলা বুড়ার জটা... উমার নখ চাঁদের চূড়া।" ইত্যাদি (২৬৮)

শৈলীবিজ্ঞান আলোচনায় লেখকের কোনো নির্দিষ্ট রচনার শৈলীগত অনুধাবন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু বুফোর, 'style is the man himself' তখন ব্যক্তির রচনা হয়ে ওঠে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের আঙ্গিক। সেক্ষেত্রে রচনার শৈলীই ধরিয়ে দেয় লেখক ও তার সময়কালকে। অনেকটা রচনার অধিবাচনিক পরিকাঠামো ও ব্যাকরণিক উপাত্তের প্রয়োগে চলতে থাকে এই শৈলীগত অনুধাবন। সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান। 'অন্নদামঙ্গাল'-র শৈলীগত অনুধাবন এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয় থাকলেও, শৈলী ও শৈলীবিজ্ঞান সম্পর্কেও সম্যক আলোচনা করা হয়েছে। যদিও প্রবন্ধের স্বার্থে কাব্যের বিভিন্ন শৈলী সম্পর্কিত মাত্রা আমাকে নির্দ্বিধায় ছেড়ে যেতে হয়েছে; তবুও একটি সংক্ষেপে সামগ্রিক আলোচনাই করা হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে।

উৎসের সন্ধানে

১. পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অভিজিৎ মজুমদার সম্পাদিত : 'বাঙলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন', পৃ. ১২৪

২. Crystal, D. and D. Davy (1969) : 'Investigating English style London : Longman', p. 3

৩. পবিত্র সরকার : 'বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন', অরুণ বসু সম্পাদিত, 'বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা', ১৯৮১, পৃ. ৫৫-১০২

৪. Simoson, p. (1997) : Language through Literature : An Introduction, London and New York : Routledge

৫. আব্রামসের উক্তিতেও এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে, (শৈলীবিজ্ঞান হল) ''...a method of analysing work of literature which proposes to replace the òsubjectlyó and 'impressionism' of standard criticism with an 'objective' or 'scientific' analysis' of the style of literary text' (p. 192)

o*f* Abrams, M. H. (1981) : A Glossary of Literary Terms (4th ed), Holt, Rinehart and Winston

৫. Leech, G. (1984) : 'A linguistics Guide to English Poetry', London : Longman.

৭. পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অভিজিৎ মজুমদার সম্পাদিত : 'বাংলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন', পৃ. ১০৩

৮. সাহিত্যের শৈলীগত আলোচনায় দু'টি ধ্বনিবৃত্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, ক. প্রাথমিক ধ্বনিবৃত্তি বা ধ্বনির অনুকার শব্দ : এক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ধ্বনির যথার্থ অনুকরণ। ঝনঝন, টপটপ, শনশন ইত্যাদি। অন্যদিকে খ. অপ্রধান ধ্বনিবৃত্তি : অনুকরণ নয়, ধ্বনির দ্যোতক। টনটন, কনকন, মিটমিট ইত্যাদি।

৯. Leech, G. (1984) : A linguistics Guide to English Poetry, London : Longman

১০. শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৭) : 'কবিতার মিল ও অমিল', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪-৫

পাদটীকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রবন্ধে ব্যবহৃত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালের সমস্ত উদাহরণ গৃহীত হয়েছে, 'রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র (১৯৮৬) : বুলবুল বসু কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিশার্স' গ্রন্থ থেকে। প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত পঙক্তি সংগৃহীত পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

ধর্ম সমন্বয়ের কাল ও চিহ্ন : প্রসঙ্গত দক্ষিণ রায় ও গাজি খাঁ'র আখ্যান

অরিন্দম অধিকারী

বৃহৎবঙ্গ তথা ভারতভূমের মধ্যযুগের ইতিহাস হল মুসলমান রাজার শাসনকালের ইতিহাস। ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখি, বাংলায় মধ্যযুগের সাহিত্যের সূচনাই হয়েছে মুসলমান আক্রমণের হাত ধরে। বারো'শ দু'ই-তিনে বখতিয়ার খিলজির গৌড় আক্রমণ বাংলার বুকে সূচনা করে মধ্যযুগের ইতিহাসের। সঙ্গে ছিল মগ-ফিরিঙ্গি আর পর্তুগিজ দস্যুদের সীমাহীন অত্যাচার। আর এই বিধর্মীর শাসন ও অত্যাচারের মাঝে পড়ে হিন্দু জনসমাজকে তাড়িত করে হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক কাব্য রচনায়। যার অন্যথা হয়নি সমগ্র মধ্যযুগের পাঁচ-ছয়'শ বছরের সাহিত্যে। ফলত দেখা যায়, মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত সাহিত্যই হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক। এবং উদ্দেশ্য একটাই, পরাজিত হলেও বিধর্মীর শাসনে নিজেদের ধর্মীয় গোষ্ঠীবদ্ধতাকে টিকিয়ে রাখা। এই কথাগুলি কঠিন হলেও মধ্যযুগের সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে সত্য। গবেষক অরবিন্দ পোদ্দার মুসলমান শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন—

> ভারতবর্ষের মুসলিম অভিযান পূর্বেকার অভিযানগুলির ন্যায় শুধুমাত্র সামরিক অভিযানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; মুসলমান অভিযানকারীদের ছিল বিশিষ্ট সংস্কার সংস্কৃতি এবং আদর্শ। তাই সংঘাতটা দুটো বিরোধী সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শের সংঘাতে পরিণত হয়।[১]

হিন্দু সমাজ এই সংঘাতে পরাজিত হলেও শুরু থেকেই তারা চেষ্টা করেছিল নিজের ধর্মের গণ্ডিটাকে টিকিয়ে রাখতে—

> হিন্দু সমাজের মধ্যেও প্রতিরোধের প্রবল আগ্রহ। যবন সংস্পর্শদোষে যাদের জাত গিয়েছিল তাদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে পুনরায় হিন্দু সমাজে স্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজপতিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম অভিযান যে হিন্দু সমাজের উপর প্রবল আক্রমণের সূত্রপাত করেছে, এ চেতনায় তাঁরা ক্রমশই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন।[২]

তবে সমগ্র মধ্যযুগের সমাজ ইতিহাসের পাঠ নিলে দেখা যায়, এর সমান্তরাল একটি ইতিহাস রয়েছে। যেটা সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের ইতিহাস। এই সমন্বয় শুরু হয়েছিল বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার দু-তিন'শ বছর পর থেকে। এই সময়ের গ্রামীণ সমাজের ইতিহাস এই সহাবস্থান বা সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করে। দীনেশচন্দ্র সেন ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক কলহের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে বলেছেন—

> এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এদেশে এখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পুরা মাত্রায় চলিতেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে ইতিহাস চর্চা করিলে দেখা যাইবে, এই বিরোধের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। এই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে।[৩]

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি আর্যদের এদেশে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। আর্যদের প্রাধান্য বিস্তারের পর সমাজের বুকে চেপে বসে সনাতন ধর্মের কঠিন ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন। এই অনুশাসনের উপলক্ষ্য ছিল সমাজের অব্রাহ্মণ শ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা। গুপ্তযুগে পুরাণ-স্মৃতি-শাস্ত্রের রচনা বৃদ্ধি এই অনুশাসনের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। বাংলায় পাল রাজত্বে দেখি বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের ছবি। পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও রাজকার্যের বহু ক্ষেত্রে তারা হিন্দু যুগের ব্রাহ্মণ্য পরম্পরাকে মেনে নিয়েছিল। তাই দেখি বৌদ্ধ রাজাদের রাজসভায় যখন রাজা ভূমি দান করতেন, পরম্পরা অনুযায়ী সেই দান প্রথম গ্রহণ করতেন ব্রাহ্মণরাই। এই সংস্কৃতির অন্যথা হয়নি পাল আমলেও। এই সময়েই দেখি বৌদ্ধদের অত্যাচারে কোথাও কোথাও বহু ব্রাহ্মণ বাধ্য হয় গুজরাত ও দক্ষিণ ভারতে চলে যেতে। কিন্তু সেন আমলে পুনরায় হিন্দুযুগের সূত্রপাত হলে যেভাবে বৌদ্ধধর্ম ও তাদের ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেওয়ার চেষ্টা হয় তা ভয়ানক। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের স্থান হয় একেবারে সমাজের শেষ প্রান্তে। সেই সময়ে এদের ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—

> কিন্তু বাঙলায় বৌদ্ধ পাল রাজত্বের অবসানে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, বৌদ্ধধর্মের প্রতি পরবর্তী রাজশক্তির বৈরিতা ও অন্যান্য কারণে এদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম ও লোকায়ত ধ্যানধারণার সমন্বয়ে গঠিত 'নাথধর্ম' নামক এক নতুন ধর্মের আশ্রয় নেন।[৪]

এই সময়েই ঘটে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ। শুরু হয় খিলজি-পাঠান-মুঘল শাসন পর্ব। একথা ঠিক যে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে এসেছিল রাজত্ব করতে, ধর্ম প্রচার করতে নয়। বিন-বখতিয়ার খিলজি থেকে শুরু করে মুঘল শাসন পর্যন্ত সমগ্র মুসলমান রাজত্ব ছিল রাজ্যশাসনের, অর্থ উপার্জন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের শাসনপর্ব। যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও সমালোচক বলেন শাসকদের দ্বারাই এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল, তাদের কথা পুরোপুরি সত্য নয়। ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হয় সুফি মতবাদী পীর ফকির দরবেশদের হাত ধরে। মুসলমান শাসন শুরু হবার কয়েক'শ বছর পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল। এদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলমান বণিকের প্রবেশ ঘটেছিল আরাকান ও চট্টগ্রাম বন্দর ও সন্নিহিত অঞ্চলে। এরা শুরু থেকেই হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের এক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। দীনেশচন্দ্র সেনসহ বহু আলোচক অষ্টম শতাব্দীতে এক ফকির দরবেশের (সম্ভাব্য সুফি সাধক রুমী) ভারতে আগমনের কথা বলেছেন। এনামুল হক অষ্টম-নবম শতকে চট্টগ্রাম বন্দর সন্নিহিত অঞ্চলে মুসলমান বণিকদের বসতি স্থাপনের কথা

বলেছেন। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে বা তারও কিছু সময় পূর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সুফি মতবাদ প্রবেশ করতে শুরু করে।[৫] তখন বাংলায় চলছে মুসলমান শাসকের কঠোর শাসন। এই সময়ে সমাজের উপরিস্তরে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে ধর্মগত ব্যবধান ছিল অনেক বেশি। খুব সহজে এই ব্যবধান ঘুচে যায়নি। নিম্নস্তরে সমাজের প্রান্তবর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে খুব সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল শাস্ত্রবিরোধী সুফি পীর-দরবেশরা। কারণ উচ্চবর্ণের কাছে এদের মনোমত কোনো ধর্মীয় আশ্রয় ছিল না। ফলস্বরূপ সমাজের নীচেরস্তরে ইসলামিকরণ যতটা সহজ হয়েছিল, উপরিস্তরে ততটা সহজসাধ্য হয়নি। এক ইউরোপীয় গবেষক ভারতে ইসলাম ধর্মান্তরকরণের কয়েকটি পথের কথা বলেছেন, যথা, হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ, মুসলমান পীরের হিন্দু শিষ্য ও হিন্দু যোগীর (যথা, নাথযোগী) মুসলমান শিষ্য, মুসলিম সংস্কৃতিতে হিন্দু লৌকিক ভাবধারার প্রভাব, এবং ইসলাম ধর্মের উপযুক্ত শিক্ষার পূর্বেই অসম্পূর্ণরূপে ধর্মগ্রহণ।[৬] এই ভাবেই সমাজের সর্বস্তরে চলছিল ধর্মান্তরকরণ।

বাংলার ইসলামি শাসকরা তাদের রাজত্বের শুরুতেই উপলব্ধি করেছিল শাসনকার্যে এদেশের হিন্দু কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা। ফলস্বরূপ দেখি ত্রয়োদশ শতকে বাংলার বুকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা চললেও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকে মুসলমান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজে শুরু হয় হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা। এই সময় থেকেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ের পরিবেশ তৈরি হয়। সঙ্গে ছিল শাসকদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিম্নস্তরের লৌকিক দেবদেবীদের সমাজের উপরিস্তরে আনার প্রবণতা ও তাদের হাতে মুসলমানদের হেনস্থার ছবি। 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে দেখি মনসার হাতে হাসান-হোসেন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে বাধ্য হচ্ছে মুসলমান হয়ে হিন্দুদেবী মনসার পুজো করতে। সময় যত এগিয়েছে, বাংলার সমাজ পরিবেশ দ্রুত বদলেছে। অশান্তির পরিবেশ ক্রমশ শান্ত হয়েছে। ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে দেখি সমাজের নিম্নস্তরের মুসলমানদের প্রত্যাহিক জীবনের ছবি উঠে এসেছে। সেখানে দেখা যায়—

ফজর সময় উঠি বিছায়ে লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নামাজ।[৭]

এখানে স্পষ্ট বুঝতে পারি, সমাজে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের কাজ চলছিল খুব দ্রুত গতিতে। যার শান্ত-শৃঙ্খল জীবনের ছবি উঠে এসেছে ষোড়শ শতকের কবির কলমে।

এই সময়ে সমাজের সমাজের নিম্নস্তরে তৈরি হচ্ছিল এক মিশ্রিত ধর্মীয় পরিবেশ। সমাজের মূল স্রোতের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে সুফি-হিন্দু-বৌদ্ধ সাধনার মিশ্রণে এমন এক ভাবধারার জন্ম হচ্ছিল, যেখানে নিম্নশ্রেণির মানুষ নিজ ধর্ম বিসর্জন না দিয়েও আশ্রয় পেয়েছিল এই ধর্মের মধ্যে। মূর্তি পুজো ও গুরুবাদে বিশ্বাসী হিন্দু খুব সহজেই মেনে নিয়েছিল শাস্ত্রবিরোধী সুফিদের। সুফিরা শরিয়তের বিরুদ্ধে গিয়ে মিশে গিয়েছিল মানুষের সঙ্গে। এই সময় থেকেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ও আদান-প্রদান শুরু হয়ে যায়। হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয় দেবীপূজা, পিরপূজা, তাবিজের ব্যবহার, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস। শুরু হয় একধরণের বর্ণপ্রথাও। গড়ে উঠল হিন্দু দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূপ। সমাজে দেখতে পেলাম হিন্দু বনদুর্গার প্রতিরূপ বনবিবি, বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের প্রতিরূপ গাজি পির ও কালু শাহা, সত্যনারায়ণের প্রতিরূপ সত্যপির। শীতলা ও ওলাবিবি উভয় সম্প্রদায়ের পূজ্য ছিল।[৮] সমাজে উভয় ধর্মের মানুষ

সামাজিক ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক দেওয়া-নেওয়া শুরু করেছিল বাংলায় মুসলমান আক্রমণের অনেক আগে থেকেই।

বাংলায় মুসলমান আক্রমণের পর কিছু সময়ের জন্যে তৈরি হয়েছিল বিরোধের পরিবেশ। তবে কিছু সময় পর থেকে ধীর গতিতে এই সমন্বয়ের কাজ পুনরায় শুরু হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এই সমন্বয় চূড়ান্ত রূপ পায়। এই সময়ের বহু আগে থেকেই নদী বন্দর ও বাণিজ্যিক নগর যেমন হুগলি, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি নগরগুলিতে বিদেশি বণিকদের আগমনের ফলে এই মিশ্রণের পথ আরও মসৃণ করেছিল। তাই দেখি হিন্দু দেবী মনসার হাতে হাসান-হোসেনের হেনস্থা হলেও বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় হয়ে উঠেছে গাজি-কালুর বন্ধু ও ভাই। সাহিত্যে এই কাজ শুরু হয়েছিল সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গাল'-এর হাত ধরে। সেই পথেই রচিত হয় অপর এক কাহিনি 'গাজী কালু ও চম্পাবতীর উপাখ্যান'। গবেষক আনিসুজ্জামান এক্ষেত্রে সমন্বয়ের কৃতিত্ব দিয়েছেন হিন্দু কবিকেই। তিনি বলেছেন—

> কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে এই পরিবর্তনের প্রকাশ হবার আগেই তার পূর্বসূচনা হয়েছিল, এবং আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু কবির হাতে। চব্বিশ পরগণার কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'রায়মঙ্গাল' কাব্য রচনা করেন।[৯]

রায়মঙ্গাল কাব্যের দক্ষিণ রায়, অন্যদিকে 'গাজী কালু ও চম্পাবতীর উপ্যাখান' কাব্যের গাজি পীর ও কালু শাহা এবং বন-বিবির জহুর-নামা কাব্যের বন-বিবি, এই তিন দেবতা চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানের পূজ্য দেবদেবী। কাব্যের মধ্যে দেখি কবিরা হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের পক্ষপাতি হয়ে দক্ষিণ রায়-গাজি-কালু- বনবিবিকে ভাইবোন ও বন্ধু বলে উপস্থাপন করেছেন। চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বিস্তৃত সুন্দরবন অঞ্চলে বড়ো গাজি ও কালু গাজি এবং দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা রূপে হিন্দু ও মুসলমানদের কাছে সমান শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। এই তিনটি কাব্যের কাহিনি অংশে প্রবেশ না করে শুধু মাত্র হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের চিহ্নগুলি তুলে ধরে দেখাতে চেষ্টা করব, কীভাবে উভয় ধর্মের মানুষ দেবদেবীর মিলনের আশ্রয়ে এক হয়ে যাচ্ছিল সমাজের বুকে।

কবি কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গাল' কাব্য চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন এলাকার বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন মূলক কাব্য। সুকুমার সেন দক্ষিণ রায়কে বাঘের দেবতা, নাকি ব্যাঘ্ররূপী দেবতা এ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন। এই বিতর্কে না গিয়ে আমরা দক্ষিণ রায়কে ধরে নেব এই অঞ্চলের বাঘের দেবতা বলে, যার অজস্র ব্যাঘ্রসৈন্য আছে। কাহিনিতে দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের আঠারো ভাটির 'রায়' বা 'ভুপ' অর্থাৎ দেবতা। কাব্যের শুরুতেই কৃষ্ণদাস পাঠককে জানিয়ে দেন দক্ষিণ রায়-গাজি পির ও কালু শাহার বন্ধুত্বের কথা—

বড় খাঁ গাজির সাথে মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তারপর।
কালুরায় বন্ধু বটে সোয়ার ঘোড়ার পিঠে
একমনে পূজে কত নর।।[১০]

কাব্যে কাহিনিতে দেখি সদাগর পুস্প দত্তের নৌকা নির্মাণের জন্য রতাই বাউল্যা ছয় ভাইকে নিয়ে কাঠ কাটতে যায়। ভুলক্রমে দক্ষিণ রায়ের বসতি বৃহৎ গাছটি কেটে ফেলে রায়ের কোপে ছয় বাঘ

রতাইয়ের ছয় ভাইকে হত্যা করে। অবশেষে রতাই নিজের পুত্রকে বলি দিয়ে রায়কে তুষ্ট করে। এবং শেষপর্যন্ত রায়ের কৃপায় ছয় ভাই ও পুত্রকে ফিরে পায়। অন্যদিকে পুষ্প দত্ত বিশ্বকর্মা ও হনুমানকে দিয়ে মধুকর ডিঙা বানিয়ে নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধানে বাণিজ্যে যাত্রা করে। পথে ফকিরদের মাটির ঢিবি পুজো করতে দেখে প্রশ্ন করে জানতে পারে দক্ষিণ রায় ও গাজি পিরের সম্পর্কে। পরে বাণিজ্যে গিয়ে রায়ের কৃপায় পিতা ও রাজকন্যা রত্নাবতীকে লাভ করে। কাহিনিতে 'ফকির সংবাদ' অংশে সদাগরের কথায় দেখতে পাই ফকিরেরা পুজো করছে এক অদ্ভুত মূর্তিকে। কাব্যে দেখি—

> মূরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি।/পূজা করে ফকিরেরা কেমন দেব-দেবী।।/বাঘের উপর নাঞি দক্ষিণের রায়।/একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়।।[১১]

এই মূর্তি আজও সুন্দরবন অঞ্চলে পূজিত হয়। এইরূপ মূর্তির ইতিহাস বলতে গিয়ে ফকিরেরা ধনপতি সদাগরের কাহিনি উত্থাপন করে, যেখানে ধনপতি বাণিজ্য যাত্রার শুরুতে বড়ো খাঁ গাজির পুজো না করে শুধু দক্ষিণ রায়ের পুজো করে। এই সংবাদ শুনে গাজি খাঁ প্রকাশ করে সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বকে—"শোন্তে হো দক্ষিণরায় এসা দাগাবাজী।/বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী।।" উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদল একে অপরকে আক্রমণ কর। তৈরি হয় যুদ্ধের পরিবেশ। দক্ষিণ রায় সন্ধির বার্তা পাঠায়। কিন্তু সন্ধি সূত্রে সমাধান না হয়ে শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান দেবতা রায় ও গাজির লড়াই। লড়াইয়ে বড়ো গাজির তলোয়ারের কোপে দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডু কাটা যায়। মধ্যস্থতাকারী 'ঈশ্বর' এসে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেন। কবি সমাধানকারী ঈশ্বরের বর্ণনা দিয়েছেন সম্প্রীতির বাতাবরণে। তার বর্ণনায় দেখি উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চিহ্নের উপস্থিতি—

অর্ধেক মাথায় কালা এক ভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে।।

ঈশ্বরের এই সমন্বয়ী রূপ সমাজের সম্প্রীতির ছবিটিকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে আমাদের সামনে। এই সমন্বয়ী ঈশ্বর মুছে দেন দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ ভাবনাকে'যেই তুমি সেই রায়/ বর্বর লোকেতে তায়/ভেদ করে দুঃখ পায় নানা।' কাহিনির মধ্যে দেখি দ্বন্দ্বের শেষে দুই দেবতার এলাকা নির্ধারণ করে দেন ঈশ্বর। কবি ঈশ্বরের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

এখন দক্ষিণরার সব ভাটি অধিকার
হিজুলিতে কালুয়ার থানা।
সর্বত্রে সাহেব পীর সবে নোঞাইবে শির
কেহ তারে না করিবে মানা।।

এই সমন্বয়ের কাহিনির অপর একটি রূপ দেখি খোদা বকস ও আবদুর রহিমের 'গাজী কালু ও চম্পাবতী' এবং আবদুল গফুরের 'গাজী সাহেবের গান'-এ। হিন্দু কবির মতো তারা এতটা উদার ছিলেন না। তারা কাব্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ নগরের রাজকন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে গাজির বিবাহকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজির লড়াই এবং লড়াইয়ে রায়ের পরাজয়কে মুখ্য ভাবে তুলে ধরেছেন। চম্পাবতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে গাজি তার বাঘ সৈন্য নিয়ে মটুক রাজার রাজ্য আক্রমণ করে।

এদিকে রাজার সহায় দক্ষিণ রায়। রায় গাজীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য গঙ্গার কাছে কুমির চাইতে গেলে গঙ্গা বলে—

> শুনহে দক্ষিণ রায় নাহি জান তুমি।/গাজী মোর ভগ্নিপুত্র তারে চিনি আমি।।/একই রক্তে মাংস নাহি হয় পর।/পুত্র হইতে দয়া অতি গাজী প্রতি মোর।।[১২]

সমাজে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের বড়ো নিদর্শন এখানে উপস্থাপন করেছেন কবি। যুদ্ধে রায়ের সহায়ক হিসাবে ভবানী ভূতপ্রেত পাঠালে গাজি ভবানীকে মাসি সম্বোধন করেছে। বলেছে—'দুগা মাসির কর্ম গাযী দেখে কৌতূহলে।/ হেটে গাছ কাটে উপর পানি ঢালে।।[১৩] আবার আবদুর রহিমের কাব্যেও একই উচ্চারণ দেখিগাজী মোর ভগ্নিপুত্র তার আমি মাসী।/কার্তিক গণেশ হইতে তারে ভালবাসি।।[১৪] এই থেকে স্পষ্ট হয় গাজি লোকসমাজে সম্প্রদায়গত সমন্বয়ের মুখ হিসাবে হিন্দু দেবী ভবানীর 'ভগ্নিপুত্র' বলেই পরিচিত। এই সমন্বয়ী ভাবনা ছিল সমকালীন সমাজ ভাবনারই ফসল।

মধ্যযুগের অপর দুইজন কবি বয়নুদ্দিন ও মোহম্মদ খাতের লেখা 'বন-বিবির জহুরা-নামা' কাব্যেও এই সমন্বয়ের ছবি দেখি। কাহিনির মধ্যে দেখি, বন-বিবি আঠারো ভাটির দখল নিতে গেলে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে তার লড়াই বাধে। কিন্তু রায়ের মাতা নারায়ণী একজন 'আওরাতের' সঙ্গে পুত্রকে লড়াই করতে না দিয়ে নিজে সংগ্রামে নামে। লড়াইয়ে নারায়ণী পরাজিত হয়। এখানে মুসলমান দেবীর অধিকার স্বীকৃত হয়। অতঃপর রায় ও বন-বিবির লড়াই শুরু হয়। লড়াইয়ে উদ্দেশ্য ভক্ত হিসেবে ধনা ও দুখেকে অধিকার করার প্রসঙ্গ। রায় ধনার কাছে দুখের বলিদান চায়। বন-বিবি দুখেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে। শেষে লড়াইয়ে রায় পরাজিত হয়ে গাজির আশ্রয় নিলে গাজি রায়কে নিয়ে চলে বন-বিবির কাছে। বন-বিবির কাছে রায়কে পরিচয় দেয় বন-বিবির পুত্র বলে। বিবি বিস্মিত হলে গাজি বলে, নারায়ণী যুদ্ধে হেরে তাকে সই বলেছিল'বিচার করিয়া দেখ মনে আপনার।/রায়মনি সই-বেটা হইল তোমার।।'[১৫]

এভাবেই পরস্পর সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান উভয়ে। তখন বন-বিবি সম্প্রদায়গত বিভেদ সরিয়ে রায়কে মেনে নিলেন পুত্র বলে—'দিলের বিচেতে আমি বুঝিনু এখন।/ এক বেটা ছিল দুখে হৈল তিন জন।।' এই ভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যে উঠে এসেছে ধর্মীয় সমন্বয়ের ছবি। দক্ষিণ রায়, গাজি খাঁ, বন-বিবি হয়ে উঠেছে বাংলার সমাজ জীবনে ধর্মীয় সমন্বয়ের প্রতীক। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মধ্যে শ্রেণিগত বা সামাজিক স্তরগত বিভাজন ছিল। ছিল নিজ নিজ ধর্মের মধ্যে ধর্মীয় অত্যাচারের প্রসঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে একই সমাজের মধ্যে উভয় ধর্মের মানুষের ধর্মীয় সহাবস্থানও ছিল। এই সহাবস্থানের ছবিটা স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় গ্রামীণ সমাজের ক্ষেত্রে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছে ভাতের চাহিদা ছিল মুখ্য। ধর্মের কলহ তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলেনি। পেটের টানে এবং পেশার কারণে দেখি চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুরের বনাঞ্চলের উভয় ধর্মের মানুষের কাছে দক্ষিণ রায়, গাজি ও কালু পির, বন-বিবি সবাই শ্রদ্ধার পাত্র। সেখানে নেই কোনো ধর্মীয় গণ্ডি। হিন্দুর কাছে গাজি পির যেমন, তেমনই মুসলমানের কাছে দক্ষির রায় দেবতা হিসেবে সমান শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

উৎসের সন্ধানে

১. অরবিন্দ পোদ্দার : 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৫৮, পৃ. ৩৮
২. তদেব : পৃ. ৩৯
৩. দীনেশচন্দ্র সেন : 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান', কলকাতা, কথা, ২০১১, পৃ. ৭
৪. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত : 'বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান', কলকাতা, সারস্বতকুঞ্জ, ১৯৯২, পৃ. ১৫
৫. আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', ঢাকা: চারুলিপি, ২০১২, পৃ. ৪৫
৬. তদেব : পৃ. ৪৪
৭. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত : তদেব, পৃ. ৩৩
৮. আনিসুজ্জামান : তদেব, পৃ. ৪৪
৯. তদেব : পৃ. ১১৭
১০. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী', কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃ. ১৬৬
১১. তদেব : পৃ. ১৭৯ (পরবর্তী 'রায়মঙ্গল' কাব্যের কাব্য পঙক্তি সবই এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত)
১২. আনিসুজ্জামান : তদেব, পৃ. ১৬২
১৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত : তদেব, পৃ. ৩২৪
১৪. আনিসুজ্জামান : তদেব, পৃ. ১৬২
১৫. সুকুমার সেন : 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, আনন্দ, ১৪০০, পৃ. ৮০

মহুয়া গীতিকা : পাঠকের পাঠপ্রতিক্রিয়ায়

বৈশাখী পাঠক

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' বইটিতে সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে'র সহায়তায় যে-কটি পালা পেয়েছিলেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যায় ভূমিকা ও টীকাসহ মোট ১০টি পালা গ্রন্থিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'মহুয়া' পালাটি সর্বোৎকৃষ্ট। এই পালায় নিত্যদিনের জীবনরস তথা পূর্ব বাংলার সামাজিক অবস্থান লক্ষ করা যায়। সম্পাদিত বইতে 'মহুয়া' পালাটির যে ঘটনাক্রম রয়েছে তার আড়ালে একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'[১] দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের দেবপরিসরে মানব মনের বিস্তৃত পটরেখা সেই অর্থে কোনো মানবিক আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও, গীতিকার সংকলিত পালাগুলিতে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবপ্রেমের উচ্চকিত মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজ কানাই প্রণীত 'মহুয়া' পালায় মহুয়া, নদের চাঁদ, হুমরা বেদে, পালং সই-এর চরিত্র বাস্তব জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষায় সমর্থ হয়েছে।

মূলত সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি এসেছে পাশ্চাত্য থেকে, আধুনিক অর্থে এই চেতনা দেখা যায় প্রধানত রেনেসাঁস পর্বে, অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর পর। উনিশ শতক থেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার ফলে। মূলত বিশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলিকে যখন সমালোচকরা বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তখন তাঁদের অধিকাংশই পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করে থাকেন। পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতির অনেকগুলি বিভাগ আছে। যথা—বাস্তববাদী বিচার পদ্ধতি, নারীচেতনামূলক বিচার পদ্ধতি, তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি, নিম্নবর্গীয় চেতনা প্রভৃতি। এই বিভাগগুলির মধ্যেও আবার বেশ কয়েকটি উপবিভাগ বা ধারা রয়েছে।[২]

মহুয়া পালার মধ্যে রয়েছে আদি-মধ্য-অন্ত পরিব্যাপ্ত অসামান্য নাটকীয় আখ্যান। সেই আখ্যান এমন—ধনু নদীর পারে কায়নপুর গ্রামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের

কাছ থেকে হুমরা বেদে ও তার দল শিশু কন্যাকে রাতের অন্ধকারে চুরি করে। তাকে প্রতিপালন করে নাম রাখে 'মহুয়া সুন্দরী', যৌবনকালে মহুয়া বামনকান্দা গ্রামের নদের চাঁদের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয় এবং ঘাত-সংঘাতের মাধ্যমে ইহকালে তাদের মিলন সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এই পালাটি শেষপর্যন্ত ট্রাজিক মহিমা লাভ করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে নারীবাদী দৃষ্টিকোণের উদ্ভব হলেও বিচার পদ্ধতি শুরু হয় ১৯২০-র পর থেকে। মহুয়া পালাটিকে নারীচেতনামূলক বিচার পদ্ধতির ধারায় পর্যালোচনা করা যায়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-বৈশিষ্ট্যে কুমারী মেয়েদের হৃদয়ে ধর্মের বলিষ্ঠ প্রকাশ, সতীত্ব রক্ষা, মৃত্যুবরণ, কুলত্যাগই ছিল মেয়ে বা নারীর মূল্যায়নের মাপকাঠি। গীতিকার রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী। এই সময়পর্বে দেখা যায় নারী বস্তুমূল্যে বিবেচ্য হয়ে উঠেছে অনেকের কাছে। কেননা, সে শুধুমাত্র প্রজননের যন্ত্র আর সেবাদাসী—এই ছিল বদ্ধমূল ধারণা।

পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতির ধারায় নারীচেতনামূলক বিচার পদ্ধতির দু'জন বিশিষ্ট প্রবক্তা হলেন ভার্জিনিয়া উলফ এবং সিমোন দ্য বোভোয়ার। প্রকৃতচিন্তক উলফ-র মতামত ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক-লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত 'The Second Sex'-এ বোভোয়া লিখেছেন—

> A man would never set out to write a book on the peculiar Situation of the human male. But if I wish to define myself, I must first of all say; 'I am a woman.' (P. 15)[৩]

মহুয়া সমস্ত সমাজ-পরিবার-পরিজন প্রতিষ্ঠিত রক্ষণশীলতার বেড়া টপকে ভালোবাসার মানুষকে আপন করে নিতে দৃঢ় সংকল্প করেছে। নারীর সঙ্গে যেখানে সমাজের দ্বন্দ্ব হয়েছে, সেখানে দেখা গিয়েছে যে সমাজ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছে নারীর সাধিকার নষ্ট হোক। ফলে মহুয়া পালায় প্রেম-প্রাপ্তি শেষপর্যন্ত গোষ্ঠীর বাধায় ধ্বস্ত হয়েছে। গোষ্ঠীর রক্ষণশীলতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে হুমরা বেদে শেষপর্যন্ত মহুয়া ও নদ্যার চাঁদের ইচ্ছাটাকেই পিষ্ট করেছে।

ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও মহুয়া ঘটনাচক্রে বেদের পালিতা কন্যা। আদমের নিঃসঙ্গতা কাটাতে যেমন ঈশ্বর তৈরি করেছিলেন ইভকে তেমনই পালায় হুমরার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য নয়, তার ব্যবসা-বৃত্তির জন্য, নিজের স্বার্থে শিশুকন্যাকে চুরি করে। মহুয়া বড়ো হয়, নদের চাঁদের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়, তার প্রেমের দুর্বারশক্তির কাছে অত্যাচারী পুরুষসমাজ পরাস্ত হয়েছে। তথাকথিত পুরুষ তার প্রয়োজনে, জীবন নির্বাহে, স্বার্থে মহুয়াকে ব্যবহার করেছে। মহুয়া ব্রাহ্মণ কন্যা, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে হুমরা তাকে চুরি করে বড়ো হয়ে তার পেশাও হয় বেদে বৃত্তি। 'বেদে' শ্রেণি হল সমাজের সর্বনিম্ন স্তর—নিম্নগত সমাজ। কায়িক শ্রম ও বৃত্তিগতভাবেই তথাপি অনিশ্চয়তার মাধ্যমে তাদের সমাজের মালিকপক্ষের ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হয়। কাহিনিতে হুমরা ও তার ভাই মানিকের কায়িকশ্রমের থেকে মহুয়ার শ্রমই বেশি চিত্রিত। পালাকার দীনেশচন্দ্র সেন লেখেন—"যখন নাকি বাইদ্যার ছেড়ী বাঁশে মাইলো লাড়া।"[৪] কিংবা—"দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাঁশে বাজী করে।"[৫] পালাটির খেলা প্রদর্শন অংশেই মহুয়ার কায়িক শ্রমের পাশাপাশি গান করার দিকটিও ফুটে উঠেছে। এখানে মহুয়ার কায়িক, মানসিক, দৈহিক শ্রমের দিকটি প্রকাশিত। মহুয়া রূপ বর্ণনায়ও পালাকার নদের চাঁদের সভা অংশে লেখেন—

পরম এক সুন্দরী কইন্যা সঙ্গেতে তাহার।
জন্মিয়া-ভন্মিয়া এমুন দেখি নাইকো আর।।[৬]

বেদের দল নিম্নবর্গের মানুষ। তাদের দলের মূল Piller এবং Power হয়ে ওঠে মহুয়া। বস্তুত, মহুয়ার কায়িক শ্রম তো বটেই, রূপের ছটাও বেদের দলের খেলা প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, বেদের দল মূলত তাদের গোষ্ঠীর আনুগত্য, কাজকর্ম অর্থাৎ বৃত্তির জায়গাটির সঙ্গে মহুয়াকে সংযুক্ত করে নিজেদের আর্থিক সম্বলকে পুষ্ট করতে চেয়েছে। আমরা দেখেছি, জনজাতি সংস্কৃতি এতখানি রক্ষণশীল যে, অনেক সময় তারা সেই রক্ষণশীলতার পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতাকেই ধূলি-ধূসরিত করেছে। তবে এই প্রসঙ্গে স্বীকার্য যে, মহুয়ার প্রেমের পথে বাধা আসলে সমাজ নয়, হুমরা বেদের স্বার্থ। ভাই মানিককে হুমরা বলে—"শুন শুন মানিক ভাইরে বলি যে তোমাই/ এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই।"[৭]

মহুয়াকে 'কোলাকোলি', 'গলাগলি' করতে দেখে হুমরার ক্রোধ আরও দ্বিগুণ হয়। মহুয়া জাঁতাকলে পিষে গেলেও নিজেকে একসময় 'অবলা নারী' বলেছে আবার পরবর্তীতে উঠেও দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, মহুয়া লড়াই করেছে এককভাবে। নদের চাঁদ মহুয়ার মতো বাস্তববাদী নয়। সে মহুয়াকে চেয়েছে। কিন্তু তৎকালীন বোহেমিয়ান বেদে সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত নিয়ম-রীতি-নীতি সম্পর্কে কোনোরকম ধারণা রাখেনি। আখ্যানের প্রথম থেকে দেখি গভীর এক রোমান্স ও প্রেমের গাঢ়তর অনুভূতির বর্ণমালা। তাই মহুয়াকে নদ্যার চাঁদ বলেছে, "তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।"[৮] কিংবা—"সেই ত কন্যার লাগিয়ারে পাগল হইলাম আমি।"[৯]

একজন মেয়ে জন্মাবার সঙ্গেই 'নারী' হয়ে যায় না। সমাজ, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাদের আধিপত্য বজায়ের জন্য মেয়েকে 'মেয়ে'-র থেকে 'নারী' করে তোলে বেশি। 'The Second sex' বইটিতে বোভোয়া 'Sex' ও 'Gender' শব্দটিকে আলাদা করেছেন—"A woman no biological, psychological, or economic fate determines the figure that the human female presents in society." (P. 295)[১০] মহুয়া পালাটিতে মহুয়া চরিত্রটি একাই লড়াই করেছে এবং কাহিনিটিও এগিয়ে চলেছে। আসলে মৈমনসিংহ-গীতিকায় দেখা যায়, নারীরা অনেক বেশি সক্রিয়। তারা মানসিকভাবে পুরুষের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। তুলনায় পুরুষ চরিত্রগুলি দুর্বলচিত্ত এবং অনেকাংশেই তারা নারীদের উপরে নির্ভরশীল। ফলে সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বের গীতিকায় দেখা যায় পুরুষ নয়, নারীই মুখোমুখি হয়েছে।

হুমরা বেদের আধিপত্যে মহুয়া পালিয়ে বাঁচতে পারেনি। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীকে 'an object of male fantasy' হিসেবে গণ্য করে। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আজও এই মহুয়া পালার প্রাসঙ্গিকতা ঘরে ঘরে দেখতে পাওয়া যায়। অন্যচিত্রে পুরুষ আজও নারীকে নানা অছিলায় dominate করার চেষ্টা করে—যেমন সাংসারিক ক্ষেত্রে, বৃত্তিগত ক্ষেত্রেও। কিন্তু নারীরা যদি আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয় বা নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার মতো জায়গায় অবিচল থাকে তাহলে নারী বা মেয়ে এই শব্দবন্ধ ভেঙে সেও মানুষ রূপে পরিগণিত হবে।

উলফ ও বোভোয়ার পর কেট মিলেট 'Sexual Politics'-এর কথা বলেছেন। যেখানে নারীতে পরিণত হতে পুরুষতন্ত্রের পাশাপাশি নারীরও হাত রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক লাকার মতে, মানবচেতনা গঠনের তিনটি পর্যায় অর্থাৎ, 'Imaginary', 'symbolic' আর 'Real'। পর্যায়ক্রমে

প্রথমেই একটি শিশুর লিঙ্গ পার্থক্য তৈরি হয় না, দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু লিঙ্গের অসাম্য শেখে পুরুষতন্ত্রের বাহকের মাধ্যমে। 'Real world' টি এসবের ঊর্ধ্বে। ১৯৩৭-র ১৮ মে 'সানাই' কাব্যের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন নারী—"বিচ্ছেদের মহিমা বিরহীর নিত্যসহচরী।" আবার ১৩৪৩-র অগ্রহায়ণে নারীর শিরোনামের প্রবন্ধে লিখলেন—"মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।"[১১]

নারী এই শব্দবন্ধের মাধ্যমে নারীর কয়েকটি সত্তা ক্রমান্বয়ে চিত্রিত হয় প্রেমিকা সত্তা, গৃহবধূ সত্তা, জননী সত্তা। কাহিনিতে মহুয়ার প্রেমিকা সত্তার দুর্বার গতি দেখা গিয়েছে। আসলে মহুয়া, মলুয়া, লীলা—এরা প্রত্যেকেই জীবনের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে প্রেমকে। প্রেমের কারণে মৃত্যুকে বেছে নিয়ে দ্বিধা করেনি লীলা। ঠিক একইভাবে মহুয়াও তার ভালোবাসার মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মৃত্যুকে আলিঙ্গান করেছে। দ্বিজ কানাই এই প্রেমকে স্বাগত জানিয়েছে। যে প্রেম আত্মত্যাগী ব্যাপ্তিলাভ করে, সেই প্রেম শেষাবধি Subline Stage-এ পৌঁছাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই দেখা যায়—"ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল/বাপের হাতে ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল /পায়ে পড়ে মাথার চুল চক্ষে পড়ে পানি।/উপায় চিন্তিয়া কন্যা হইল উন্মাদিনী।"[১২]

মহুয়ার মধ্যে গৃহবধূ সত্তার রূপ দেখা যায় পালার শেষ দিকে—"শুন শুন প্রাণ প্রতি বলি যে তোমারে/ জন্মের মতন বিদ্যায় দেও এই মহুয়ারে।"[১৩] পালায় মহুয়ার শারীরিকভাবে জননী হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই, তবু নদের চাঁদকে বারবার বিপদ থেকে উদ্ধার করার দিকটি লক্ষণীয়। মহুয়া ও নদের চাঁদের বিচ্ছেদে মহুয়া যেমন শয্যাশায়ী হয়েছে আবার মিলনের আকুলতায়, স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমে গোষ্ঠী ত্যাগ, তারপর ক্রমান্বয়ে সাধু ও মুনির কামলোলুপ মনোভাবেও অবিচল থেকেছে মহুয়া। সেখানে নদের চাঁদের অবদান নেই বললেই চলে। মহুয়ার বীরাঙ্গানা হওয়ার পথ সে নিজেই তৈরি করেছে। সমাজ, পুরুষতন্ত্রের চাপে অন্তিমে মহুয়া ও নদের চাঁদের যে পরিণতি দেখি, তা নিঃসন্দেহে বিষণ্ণতার আবহ নির্মাণ করে। পালঙ্ক সই এই দু'জনের প্রেমকে অমর হতে দেখেছে। বস্তুত, পালার নাম 'মহুয়া' হলেও দ্বিজ কানাই শেষ চরণটিতে লেখেন—"এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার চান্দের কথা।"[১৪]

কবি নিজে পুরুষ বলেই হয়তো নদের চাঁদের কথা প্রসঙ্গে পালা শেষ করলেন। পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতির ধারায় নারীচেতনামূলক বিচার পদ্ধতিতে নারীর চরিত্র, বাক্‌স্বাধীনতা, লিঙ্গবৈষম্য, অর্থনৈতিক অধিকারের সঙ্গে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে না করলে নারীচেতনামূলক সাহিত্য বিচার পদ্ধতি সম্পূর্ণতা পায় না। এক্ষেত্রে মহুয়ার চরিত্র রক্ষা পেলেও বাকিগুলি সেরকমভাবে দেখা যায়নি পালাটিতে। বলাবাহুল্য, এই পালাটি পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিতেও পাঠ গ্রহণ করা চলে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্দশ মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২৫, পৃ. ৫০৪-৫০৯

২. নবেন্দু সেন সম্পাদিত : 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', রত্নাবলী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, জুন ২০০৯, কলকাতা
৩. Simone de Beauvior : 'The Second Sex' 1949, Penguin, Trans and Ed. H.M. Pareshlay Harmondsworth, 1987
৪. দীনেশচন্দ্র সেন: 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', প্রজ্ঞা বিকাশ, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১৯, কলকাতা পৃ. ৩৪
৫. তদেব
৬. তদেব : পৃ. ৩৩
৭. তদেব : পৃ. ৩৮
৮. তদেব : পৃ. ৩৭
৯. তদেব : পৃ. ৪৩
১০. পুলক চন্দ সম্পাদিত : 'নারীবিশ্ব', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৬০২
১১. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ শ্রাবণ ১৪২২, জুলাই ২০১৫, কলকাতা পৃ. ১০৭
১২. উৎস-৪, পৃ. ৪৬
১৩. উৎস-৪, পৃ. ৬১
১৪. উৎস-৪, পৃ. ৬২

মৈমনসিংহ গীতিকায় উল্লিখিত মধ্যযুগের অলংকার : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

অজয় কুমার দাস

প্রাচীনকাল থেকে নারী এবং পুরুষ অলংকার ব্যবহার করে এসেছেন। সেকালে কিছু অলংকার নারী পুরুষের শরীরে সমানভাবে ব্যবহৃত হত। আর কিছু অলংকার কেবল নারী শরীরে ব্যবহৃত হত। মধ্যযুগে নির্দিষ্ট সম্প্রদায় নির্দিষ্ট বৃত্তিজীবী শ্রেণিরূপে পরিগণিত হয়ে ওঠেন। সেকালের কবিদের একটা বিশেষ রীতিই ছিল, তাঁদের সৃষ্ট কাব্যে নায়িকাদের অলংকারে ভূষিত করে অপরূপ করে তোলা।

বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলায় প্রাপ্ত গীতিকাগুলির নায়িকারা কেউই হিন্দু দেবীর স্বরূপ তাৎপর্য বহন করেননি। কেউই রানি বা জমিদার গৃহিণী ছিলেন না। বিদ্যাপতির রাধার মতো অলংকার প্রিয়তাও এদের ছিল না। চরিত্রগুলি একান্তই পল্লিবালা। সাধারণ রমণী। প্রেম ও সতীত্বের মহিমায় এরা উজ্জ্বল। কিন্তু মধ্যযুগের কবিরা রীতি রক্ষা করতে ভোলেননি। পল্লির এই গাথা সাহিত্যের রমণীদের যখন যেভাবে সম্ভব হয়েছে, যথোচিত মর্যাদায় অলংকারে ভূষিত করেছেন বাংলার কবিকুল। মধ্যযুগে আদর্শ গ্রাম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সমাজের কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। বাংলার স্বর্ণকারকুল ছিলেন সেই একই সমাজ কাঠামোর অংশ। এঁরা ছিলেন লোকশিল্পী।

২

লোকশিল্প সৃষ্টির মহেন্দ্রক্ষণ রূপে চিহ্নিত হতে পারে মধ্যযুগ। এই যুগে কৃষিনির্ভর আদর্শ গ্রামজীবন গড়ে উঠেছিল। জাতি-বৃত্তি এবং সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিল পরস্পরাশ্রয়ী। বৃত্তি অনুযায়ী একই গ্রামে গড়ে উঠেছিল পাড়া। এমন নির্দিষ্ট পাড়ায় বংশ পরম্পরায় বসবাস করে এসেছে এক এক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়। শত শত বছর ধরে ঐতিহ্যকে পাথেয় করে নির্দিষ্ট লোকায়ত সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে

লোকশিল্প। এমনিভাবে কুমোর পাড়ায় কুমোরেরা গড়ে তুলেছে মাটির শিল্প। কামার আগুনে লোহা পিটিয়ে তৈরি করেছে লোহার ব্যবহারিক সামগ্রী। ছুতোর কাঠের ব্যবহারিক জিনিসপত্র, দেবদেবীর মূর্তি, রথ প্রভৃতি। পটিদার দেবদেবীর মাটির মূর্তি গড়েছে। আর মালাকার ফুল, লতা পাতা গেঁথে গেঁথে তৈরি করেছে বিচিত্র ফুল মালা। গ্রাম সমাজে বৃত্তি-সম্প্রদায় এবং শিল্প হয়ে উঠেছে পরস্পরাশ্রয়ী। এক পরিপূর্ণ গ্রামে প্রয়োজন অনুসারী সমস্ত রকম লোকশিল্পের সমাহার লক্ষ করা যায়। আদর্শ গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ। পল্লিজীবনের পূজাপার্বণ, অনুষ্ঠান, বার-ব্রত, দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের যা কিছু প্রয়োজন, সবই পূরণ করেন লোকশিল্পীরা। শিল্প হল মানুষের যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার প্রাথমিক উপকরণ। মানুষের সভ্যতার মূল অন্তর্নিহিত প্রেরণা শিল্পবস্তু। সৌন্দর্যবোধ মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করেছে। অলংকার সৌন্দর্যের সহায়ক। সৌন্দর্যচেতনার জন্যই মানুষ অলংকার পরিধান করেন। আদিম মানুষ ছিলেন শিল্পী। স্পেনের নৃবিজ্ঞানী সাউটুওলা পৃথিবীবাসীকে সেকথা প্রথম জানিয়েছিলেন। স্পেনের ঘুমিয়ে থাকা গুহার ভেতরে ঘন অন্ধকারে, দেওয়াল চিত্রে গুহাবাসী মানুষ তাঁর শিল্পচিহ্নের প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। এরকমই মানুষের রূপসন্ধানী মন অলংকার পরিধান করে শতাব্দীর পর শতাব্দী চিরন্তন সৌন্দর্যবোধের সাক্ষ্য দিয়েছে। প্রাচীনকালেই মানুষ গহনা ব্যবহার করেছেন। তবে সে গহনা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক, সহজ সরল। একেবারে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো। তখনকার অলংকার তেমন কারুকার্য খচিত ছিল না। আদিমকালের অলংকার পশুপাখির দাঁত, নখ, চোয়াল এবং হাড়গোড় দিয়ে তৈরি হত। এগুলিকে ছিদ্র করে চামড়া বা পশুর লোমের সাহায্যে পরিধান করা হত। এরপরে ধাতুর আবিষ্কার হয়েছে। অলংকার হিসেবে মানুষ পাথর এবং ধাতুকে পরিশীলিত করে ব্যবহার করেছে। আরও পরবর্তীকালে মানুষ দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে অলংকাররূপে ব্যবহার করেছে।

আরণ্যক মানুষের কাছে সহজলভ্য ছিল ফুল লতাপাতা। এগুলিকেই সহজ সরল আরণ্যক নারী পুরুষ অলংকারে পরিণত করেছে। আরণ্যক মানুষ ফুল লতাপাতাকে অলংকারের প্রধান উপাদান রূপে গ্রহণ করছে। পরিশীলিত সমাজ পরবর্তীকালে সোনা, রূপা, হীরে, পান্না, মণি, মুক্তো প্রভৃতি দুর্লভ ধাতব উপাদানকে উৎকৃষ্ট অলংকাররূপে গণ্য করেছে। এগুলি সমাজ মান্যতাও পেয়েছে। দেশে দেশে অলংকার প্রায় সর্বসমাজে মান্যতা পেয়ে সৌন্দর্যবোধের সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। অলংকারের ক্ষেত্রে অভিজাত, অনভিজাত, উচ্চ-নিচ প্রভৃতি স্তর বিন্যাস চোখে পড়ার মতো। এমনকী অলংকার ব্যবহারে জাতি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও পার্থক্য সূচিত হয়। দেশগত, কালগত ব্যবধানে নারী পুরুষ এবং শিশুদের অলংকার ব্যবহারেও পার্থক্য স্পষ্ট। এছাড়া অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্যাবু, সংস্কার, বিশ্বাস এবং লোকাচারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের অভিজ্ঞতাকে বহন করেন অলংকার স্রষ্টারা। মধ্যযুগে অলংকার নির্মাতা লোকশিল্পীরা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণিরূপেই চিহ্নিত হতেন। প্রধানত স্বর্ণকারেরাই অলংকার নির্মাণ করেন। পল্লিগ্রামে এদের 'স্যাকরা' নামেই ডাকা হয়। মধ্যযুগে যখন কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোর অবয়ব তৈরি হল, তখন গ্রামে গ্রামে স্বর্ণকার পাড়া গড়ে উঠল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই সম্প্রদায় 'পশ্যতোহর', 'মণিবাণ্যা' প্রভৃতি নামেও চিহ্নিত। কাব্যের নায়িকা খুল্লনার পিতা গন্ধবণিক ছিলেন। অলংকার নির্মাতা সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাজনী ব্যক্তিরা অর্থলাভ করেন বেশি। অন্যান্য পেশার থেকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপ্রয়াসে তা করা সম্ভব। অন্যান্য বৃত্তির থেকেও উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদ এখানে পঞ্জীভূত হয়ে ওঠে বেশি। স্বর্ণকারেরা সমাজে বনেদি সম্প্রদায় রূপে

মান্যতা পেয়ে যান সহজেই। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও ধনতান্ত্রিক অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎসমুখ প্রকটিত হয়েছিল এদের হাত ধরে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের থেকে বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল এঁরা। পৃথক শ্রেণিচরিত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন এঁরা সহজেই। ধূর্ত মুরারী শীলের কথা কে না জানে। কালকেতু এবং ফুল্লরাকে অবজ্ঞা করতে তাঁর জুড়ি নেই। বাস্তবক্ষেত্রে যেমন, কাব্যের কবিরা ঠিক তেমনি নায়িকাদের বিচিত্র অলংকারে প্রসাধিত করে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। মানুষই সৌন্দর্য চর্চা করেন। সৌন্দর্যচর্চা এক তপস্যা-সাধনা। নিম্নবর্গীয় মানুষ পরিশ্রম ও কঠিন চেষ্টায় অর্থ-ধন-সম্পদ অর্জন করেন। প্রসাধনের সময় পান না। তাঁর মধ্যেও সময় বের করে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পুরুষ-রমণীরা দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও লতা ফুল পাতার সজ্জায় নিজেদের সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলেন। উচ্চবর্গীয় পরিশীলিত সমাজে রমণীরাও অলংকার পরিধান করে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। এটা জাতির সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের ক্ষেত্রে প্রাণের লক্ষণ।

মৈমনসংহ গীতিকা 'একেবারে চৈত-বৈশাখী বাগানের ফুলের গন্ধে ভরপুর'। এমন গীতিকা বাঙালি জাতির জীবন চর্যার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। পালাগুলির সংগ্রাহক চন্দ্র কুমার দে। ১৯২৩ সালে দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গীতিকা প্রকাশ করেন। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে এই গাথাগুলি গায়কেরা গেয়ে বেড়াতেন। এই গীতিকাগুলির প্রধান বিষয় রমণীর হৃদয় বেদনা। প্রেমের বিষণ্ণ আর্তি পালাগুলির প্রাণ। পুরুষ চরিত্রগুলি তুলনায় ম্রিয়মান। গীতিকায় উল্লিখিত পালাগুলির নামকরণও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নায়িকার নাম চিহ্নিত। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কাজলরেখা, কমলা, রূপবতী পালার নামকরণ নায়িকার নামেই। লোককবি সাধ্যমত অলংকৃত করেছেন নায়িকাদের। এছাড়া 'কঙ্ক ও লীলা'—পালার 'লীলা' প্রভৃতি চরিত্রগুলিও বিচিত্র অলংকারে ভূষিতা। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র নায়িকাদের অলংকারগুলি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল। নায়িকাদের ব্যবহৃত অলংকারগুলির বিশেষত্ব এবং তার স্বরূপ প্রকৃতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সমকালের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতি এবং সামাজিক মানুষের রুচিমান্যতার আভাসও ফুটে ওঠে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলিতে।

৩

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় অলংকারের উল্লেখ আছে। গীতিকায় উল্লিখিত অলংকারগুলি মধ্যযুগে ব্যবহৃত পল্লি রমণীর অলংকারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। পল্লি কবিরা রাজসভার কবি বিদ্যাপতির মতো সোনার কবি হতে পারেননি। পল্লি রমণীদের ব্যবহৃত অলংকারগুলি স্বাভাবিক সৌন্দর্যরূপে ধরা পড়েছে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য়। অলংকারপ্রিয়তা নারী মনের স্বাভাবিক প্রবণতা। জীবনের সঙ্গে অন্বিষ্ট অলংকারগুলি স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে মৈমনসিংহ গীতিকায়। সভ্যতার ইতিহাসে এক এক যুগে এক এক শ্রেণির গহনা সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য কিছু আকার এবং অনুসরণ থাকলেও পরবর্তী যুগে সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। মহেন-জো-দারো সভ্যতায় ব্যবহৃত নারীর অলংকার পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। মধ্যযুগের 'গহনা'ও একালে লুপ্তপ্রায়। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'গহনা' প্রবন্ধে সঙ্গতভাবেই লিখেছেন—

> এ অভাগা দেশে যাহার জ্ঞানের লেশমাত্রও আছে, তাহার হয় উৎসাহের অভাব, নয় আয়াসকাতরতা ঘটে। সুতরাং এদেশে আছে কেবলমাত্র হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ ও ততোধিক অনিপুণ অনুকরণ, ফলে কিম্ভুত-কিমাকারের জন্ম...জাগ্রত রূপরসজ্ঞানের বিষয়ে এ-দেশের নিজস্ব যাহা কিছু অতীতে ছিল, তাহা লুপ্তপ্রায়।[১]

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মহুয়া' পালাটি গীতিকায় সংগৃহীত সমস্ত পালাগুলির মধ্যে অন্যতম সম্পদ বলে বিবেচিত হতে পারে। পালাটি গীতিকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠও বটে। বেদেরা সংস্কৃত হতে চেয়েছে। পরিমার্জিত হওয়ার বাসনা যে-কোনো জাতির মনোগহনে সুপ্ত থাকে। নদ্যার চাঁদ হুমরা বেদেকে যখন জমি এবং বাড়ি দিয়েছে, তখন একটা জাতি কিছুটা সংস্কৃত হতে চেষ্টা করেছে। মানুষ মানুষ হওয়ার সাধনা করেছে এভাবেই। বেদেরা সেই জমিতে বেগুন, কচু, কলা লাগিয়েছে। বেদেরা মহুয়াকে যত্নে রাখতে চেয়েছে। জমির ফসল বিক্রয় করে মহুয়াকে গলার হার, বাজু এবং মালা কিনে দিতে চেয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকা'র মহুয়া পালায় নিম্নলিখিত অলংকারগুলি এসেছে—হার, পৃ. ৩৫; বাজু, পৃ. ৩৫; সোনার 'ফুল কাঞ্চন', নাক কানের অলংকার, পৃ. ৫১; চন্দ্রহার, পৃ. ৫১; নথ, পৃ. ৫১; নূপুর, পৃ. ৫১; হার, পৃ. ৫১; হার, পৃ. ৫৩।

সাহিত্যে যত রকমের অলংকারের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে হার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। সোনা, রূপা এবং মুক্তা দ্বারাও হার নির্মিত হয়। মুক্তা নির্মিত হারের আর এক নাম 'মুক্তাবলী'। মধ্যযুগে 'সতেশ্বরী' হারের খুব প্রচলন ছিল। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় আর একটি বিশেষ অলংকার বাজুর উল্লেখ এসেছে। 'বাজু' বাহুর উপরের দিকের ব্যবহৃত অলংকার। বাজু 'কেয়ূর' বা 'অঙ্গাদ' নামেও পরিচিত। কেয়ূরকে সর্প বলেই মনে হত। 'কেয়ূর' গোলাকার বলেই অনুমিত হয়। বিশেষত সেকালের মেয়েদের হাতের অলংকার ছিল বাজু। আজ থেকে ৮০ বা ১০০ বছর আগেও বাঙালি অভিজাত রমণীর অঙ্গে 'বাজু' শোভা পেত। বাজু বা বাজুবন্ধ নারী শরীর থেকে আজ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়া মধ্যযুগে রমণীর পায়ের অলংকার রূপে নূপুরের উল্লেখ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যযুগের সাহিত্য রমণীর পায়ের অলংকার নূপুরে টইটম্বুর। রমণীরা তাদের নৃত্য প্রদর্শনের সময় বিশেষভাবে নূপুর ব্যবহার করেন। নায়িকার সৌন্দর্য নির্মাণে কবিরা তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেন। মধ্যযুগের দেবীর অলংকার হল নূপুর। আর্য রমণীরা নূপুর পরতেন বলে অনুমিত হয়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় 'মহুয়া' পালায় রমণীর অলংকার প্রিয়তার চিত্র অঙ্কন করেছেন পালাকার। নদের চাঁদ মহুয়াকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। কচু এবং কলা বেচে তাঁর হাতের 'বাজু' এবং গলার হার-মালা গড়িয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রেমের এমন প্রতিদান। পালাটি হয়ে উঠেছে চমৎকার, আন্তরিক, অনুভববেদ্য এবং শিল্পরূপ মণ্ডিত।

লোককবি লিখেছেন—"কাইন্দ না কাইন্দ না কইন্যা না কান্দিয়ো আর।/সেই বাইঙ্গান বেচ্যা দিয়াম তোমার গলার হার।।/নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কচু।/সেই কচু বেচ্যা দিয়াম তোমার হাতের বাজু।/নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কলা।/সেই কলা বেচ্যা দিয়াম তোমার গলার মালা।।"[২] মধ্যযুগে হার, বাজু, মালা এই অলংকারগুলি অঙ্গে ধারণ করে অপরূপ রূপবতী হয়ে উঠতেন গীতিকার নায়িকারা। 'মলুয়া' পালাটি মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পালা। পালাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মলুয়া। 'মলুয়া' পালায় মলুয়া অভাবে অনটনে অলংকার বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। নিদারুণ অর্থকষ্টে একে একে গচ্ছিত গহনাগুলি বিক্রয় করেছে মলুয়া। মধ্যযুগের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর ছিল। যখন ফসল নষ্ট হয়, তখন একমাত্র সম্বল থাকে অন্তঃপুর রমণীর গহনা। সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। একটার পর একটা মাস অতিবাহিত হয়। বাসি ফুলের মালার মতো শুকনো শূণ্য হয়ে যেতে থাকে মলুয়া। মলুয়া এক এক করে গহনা বিক্রয় করে সংসার চালিয়েছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসেও অভাবে অনটনে সরলা এক এক করে গহনা বিক্রয় করেছে। 'মলুয়া' পালায় নাক, কান, গলা, হাত এবং পায়ের অলংকারের উল্লেখ

এসেছে। উক্ত পালায় নিম্নলিখিত গহনাগুলি উল্লিখিত হয়েছে—নথ, পৃ. ৯২; মতির মালা, পৃ. ৯২; পায়ের খাড়ু, পৃ. ৯২; হাতের বাজু, পৃ. ৯২; কানের ফুল, পৃ. ৯২; হাতের কঙ্কণ, পৃ. ৯২; নাকের বেসর, পৃ. ৯৩; কানের ফুল, কানের অলংকার,পৃ. ৯৩; সোনার অলংকার, পৃ. ৯৩; সোনার গহনা, পৃ. ৯৪; বেসর, নাকের অলংকার, পৃ. ১০০।

নাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রমণীরা কারুকার্য খচিত ছোটো অলংকার 'নথ' ব্যবহার করেন। নাকের এই অলংকারকে 'নাকছবি'ও বলা হয়। 'কঙ্কণ'কে করভূষণ নামেও চিহ্নিত করা হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কঙ্কণের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। হিন্দু রমণীরা অলংকার রূপে কঙ্কণ ব্যবহারের সময় স্ত্রী-আচার ও প্রথাকে মান্যতা দিয়ে থাকেন। দেবদেবীর অলংকার রূপে কঙ্কণের ব্যবহার গীতিকাটিতে এসেছে। অনার্য রমণীদের থেকে আর্য রমণীরা কঙ্কণ ব্যবহার করেছেন বেশি। এছাড়া নাসিকার অলংকার রূপে এসেছে 'বেসর'। রমণীরা নাসিকায় অলংকার রূপে 'নাকচনা', 'বেসর', এবং 'মুকুতাবলি' ব্যবহার করেন। মধ্যযুগে কানের অলংকার রূপে কর্ণপুর, কুণ্ডল, কর্ণফুলি, 'চক্রাবলি', এবং নিম্ন কর্ণে 'বলি' ব্যবহার করেন। হাতের অলংকার রূপে যেমন 'খাড়ু'র ব্যবহার আছে, ঠিক তেমনি পায়ের অলংকার রূপেও খাড়ুর ব্যবহার হয়। সংসারে যখন অভাব জন্ম নেয়, পুরুষের রোজগারের কোনো সামর্থ্য থাকে না, উপায়হীন অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে নারীই পুরুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সংসার চালাতে নারী তাঁর শেষ সম্বল প্রিয় অলংকারগুলিকে বেচে দিতে বাধ্য হয়। যখন সংসার একেবারে চলে না, তখন নিরুপায় চাঁদ বিনোদ মলুয়াকে বাপের বাড়িতে যেতে বলেছে। মলুয়া রাজি হয় না। দারিদ্র্য জর্জর ভারতীয় নারীর প্রতিমূর্তি মলুয়া। লোককবি লিখেছেন—

> নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল।/গলায় যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল।।/ শায়ণ মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে।/এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে।।/হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্রমাস যায়।/পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাস খায়।।/কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কার্তিক গোয়াইল।/অঙ্গোর যত সোনা দানা সকল বান্ধা দিল।।/শতালি অঙ্গোর বাস হাতের কঙ্কণ বাকী।/আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের খাকী।।[৩]

নিদারুণ অর্থ কষ্টে মলুয়া একের পর এক প্রতি মাসে তাঁর গায়ের অলংকারগুলি খুলে বেচতে বাধ্য হয়েছে। আষাঢ় মাসে নাকের নথ, শ্রাবণে পায়ের খাড়ু, হাতের বাজু, পাটের শাড়ী এবং কার্তিকে কানের ফুল বেচে অভাব মিটিয়েছে। তবুও দিন আর চলে না। ধীরে ধীরে বিবর্ণ হলুদ ফুলের মতো ফ্যাকাসে হয়ে যায় মলুয়া।

'কঙ্ক ও লীলা' পালাটি চারজন কবি রচনা করেছেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে—১. দামোদর দাস ২. রঘুসুত ৩. শ্রীনাথ বেনিয়া এবং ৪. নয়ানচাঁদ ঘোষ। পালাটিতে কঙ্ক ও লীলার প্রেমই মুখ্য। পালাটির কাহিনিতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কুটিল ষড়যন্ত্রে নদীতে ডুবে কঙ্কের মৃত্যু রটনা — পরিশেষে উভয়ের সংসার ত্যাগ ও নীলাচল যাত্রা বর্ণিত। 'কঙ্ক ও লীলা' পালাতে মঙ্গালকাব্যের রীতিতে দেবদেবীর বন্দনা করা হয়েছে। দামোদর দাসের বন্দনার পরে নয়ান চাঁদ ঘোষ সরস্বতী বন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু করেছেন। কবির বিশ্বাস সরস্বতী কখনোই কবিকে ত্যাগ করবেন না। দেবী ত্যাগ করলেও কবি তা পারবেন না। নয়ান চাঁদ লিখেছেন—'বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব'। (৩.ক) নূপুর ছাড়াও 'হীরামন' হারের উল্লেখ এসেছে পালাটিতে। 'কঙ্ক ও লীলা' পালায় নিম্নলিখিত অলংকারগুলি এসেছে—নূপুর (পৃ. ১২৬); হার (পৃ. ১৩৫); হার (পৃ. ১৫৫); হীরামন হার (পৃ. ১৫৬)।

লীলার কষ্ট বর্ণনা করা কঠিন। কঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায় না। অপেক্ষা করেন লীলা। ঠিক যেন অভিসার পর্যায়ের বিদ্যাপতির রাধিকা। নায়িকার হৃদয়ে 'বর্ষামঙ্গল' হচ্ছে। আষাঢ় মাসের ঝরঝর অবিরল জলধারা। রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' কবিতার পূর্বরূপ এঁকেছেন লোককবি। 'হীরামন হার' বর্ষার সময়ে যেন বৃষ্টি বিন্দু হয়ে লতায় পাতায় শোভা পায়। লোককবি লিখেছেন—

> আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।/অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা-সম্ভাষণে।।/নূতন বরষা আসে লইয়া নব আশা।/মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা।।...কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।/ময়ূর-ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম।।/কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।/পাতায় পাতায় শোভে হীরামণ হার।।[৪]

আবার—"মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।/ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা।"[৫] চমৎকার কাব্যোৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে এখানে। কঙ্ক নিরুদ্দেশ। গৃহত্যাগ করেছেন তিনি। অপেক্ষার প্রহর কাটান লীলা। দিন যায়, মাস যায়, রাতের পর রাত আসে। কঙ্ক আসে না। অবশেষে আসে আষাঢ় মাস। গাছের পাতায় পাতায় আকাশের বৃষ্টির জল ঝরে পড়ে। ঠিক যেন পাতায় শোভা পায় হীরুমন হার।

'কাজলরেখা' পালার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বহুমূল্য এক আংটি। আংটি পালাটিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেকালে স্বর্ণকারেরা অঙ্গুরি বা আংটি তৈরি করতেন। 'কাজলরেখা' পালায় রূপকথার প্রভাব আছে। সন্ন্যাসী, সওদাগর, শুকপাখির প্রসঙ্গ এসেছে পালাটিতে। আংটি শুধু অলংকার নয়, প্রণয় এবং বৈবাহিক মাঙ্গালিক আচারের প্রতীকও। সন্ন্যাসী প্রদত্ত আংটিও কাজলরেখা পালায় আছে। 'কাজলরেখা' পালায় এছাড়া যেসব লোকশিল্পগুলি এসেছে সেগুলি নিম্নরূপ—আঙ্গুইট (আংটি, পৃ. ১৬৮); আঙ্গুইট (আংটি, পৃ. ১৬৯); পিতলের নথ (পৃ. ১৭৮); কঙ্কণ (পৃ. ১৮২); কঙ্কণ (পৃ. ১৯১)। 'অঙ্গুরি' হল আঙুলের বিশেষ অলংকার। অঙ্গুরিকে 'অঙ্গুলীয়' এবং 'উর্মিকা'ও বলা হয়। কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে শকুন্তলার দুর্ভাগ্য পীড়িত যন্ত্রণার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে আংটি হারানোর ঘটনা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গালকাব্যে মুরারী শীল তাঁর স্ত্রী বন্যানী সোনার আংটিকে নকল আংটি বলে কালকেতুকে ঠকাতে চেয়েছেন। পালাটিতে লোকশিল্পের উল্লেখ করেছেন লোককবি—"সদাগরের পুরীতে এমনকালে এক সন্ন্যাসী আস্যা দেখা দিলাইন সন্ন্যাসী সদাগরের এক শুকপক্ষী আর আর এক শিরি আঙ্গুইট দিয়া কহিলেন "এই পক্ষী ধর্মমতী শুক।"[৬] 'উর্মিকা'—'উর্মি'—অর্থাৎ ঢেউ বা তরঙ্গ। আংটির আকারের মধ্যে তরঙ্গ—চিহ্ন লক্ষিত হয়। হাতের অলংকারগুলির মধ্যে কঙ্কণের পরই আংটির স্থান। 'কাজলরেখা' পালায় সহিষ্ণু কাজলরেখা আত্মশক্তিতে ভর করে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করতে পেরেছে।

'কমলা' পালায় অলংকারের সংখ্যা অনেক। নারীর অঙ্গে ব্যবহৃত বিভিন্ন অলংকার নানাভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। পালাটিতে গলার অলংকার, হাতের অলংকার, পায়ের অলংকার, মাথা এবং কপালের অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। শঙ্খ সামুদ্রিক প্রাণী। এই মৃত প্রাণীর খোলস দিয়ে শাঁখরি শাঁখার কাজ করেন। মূলত রমণীরাই শাঁখার উপর 'ফুলকাটা'র কাজ করেন। শাঁখা লোকায়ত শিল্প। এই শিল্পের সৌন্দর্য রূপ আশ্চর্য। বিবাহিতা হিন্দুনারীর প্রতীকী রূপ বহন করে শাঁখা। পার্বতীকে শিব শাঁখারির ছদ্মবেশে শাঁখা পরিয়েছিলেন। প্রাচীনকালে দেহের আটটি স্থানে আট প্রকার অলংকার ব্যবহার করা হত। এই আটটি স্থান হল শির, কপাল, কান, কণ্ঠ, উপর এবং নিচের হাত, কটি এবং পা। এই আটটি স্থানের মধ্যে নাক ছিল না। পরবর্তীকালে নাকের নোলক, নাকের অলংকার,

নাকের নথ, এই অলংকারগুলি নাসিকার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য অঙ্গের যেখানে যেখানে যে যে অলংকার উপযোগী, সেই মতো শিল্পীরা অলংকার তৈরি করেছেন। যে জাতি বহুকাল ধরে সংস্কৃত হওয়ার সাধনা করে সেই জাতির প্রাণসত্তায় নিহিত থাকে সৌন্দর্যের সাধনা। অলংকার সেই সৌন্দর্য সাধনার মূর্ত রূপ। পালায় যে সমস্ত অলংকারগুলি উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নরূপ—শাঁখা (পৃ. ১৯৫); হার (পৃ. ২০২); গলার হার (পৃ. ২০৫); গলার হার (পৃ. ২১৭); গুঞ্জরী (পায়ের অলংকার,পৃ. ২১৭); হীরামতির হার (পৃ. ২২১); ঝুমুকা (কানের অলংকার); সোনার বেসর (নাকের অলংকার, পৃ. ২৩২); বলাকা (নাকের অলংকার, পৃ. ২৩২); দুল (কানের অলংকার, পৃ. ২৩২); হীরার হাসুলি (গলার অলংকার, পৃ. ২৩৩); খারু (পায়ের অলংকার, পৃ. ২৩৩); গুজুরী (পায়ের অলংকার, পৃ. ২৩৩); পাচুলি (পায়ের অলংকার, পৃ. ২৩৩); সোনার বাতেনা (হাতের অলংকার, পৃ. ২৩৩); সিথিপাট (মাথার অলংকার, পৃ. ২৩৩); সুবর্ণের দানা (মাথার অলংকার, পৃ. ২৩৩)। কমলার বিবাহ। কমলা বিচিত্র অলংকারে ভূষিতা হয়েছেন। নারী সৌন্দর্যের দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে কমলার অলংকার সজ্জার মধ্যে। লোককবি লিখেছেন—

> আছুড়িয়া চিকন কেশ মাথায় বান্ধে খোপা।/কাটা চিরুনি দিল আর দিল চুপা।।/তার পরে পড়াইল সাড়ী নামে আসমান তারা।/ভূমিতে থইলে যেমন ভুয়ে আসমান পরা।।/হস্তেতে লইলে সাড়ী ঝলমল করে।/শূন্যেতে থইলে সাড়ী শূন্যে উড়া করে।।কানেতে পড়াইল দুল চম্পক ঝুমুকা।/নাকেতে সোণার বেসর আর বলাকা।।/গলাতে পড়াইল এক হীরার হাসুলি।/পায়েতে পড়াইল খারু গুজুরী আর পাচুলী।।/হস্তেতে সোণার বাজু সোণার বাতেনা।/মস্তকেতে সিথিপাটী সুবর্ণের দানা।।[৭]

'কমলা' পালায় নারী সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কবি তাঁর সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়েছেন। কমলাকে কবি নানা আভরণে সজ্জিত করেছেন। নায়িকার সমস্ত অঙ্গকে যুগোপযোগী অলংকারে সজ্জিত করে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। শাড়ি আকাশের তারা রূপে প্রতিবিম্বিত। তারপরই কবির বর্ণনায় কেবলই অলংকারের প্রাচুর্য। রমণীর সৌন্দর্য অলংকারের উজ্জ্বলতায় দীপ্তমান, আরও প্রকটিত। কমলার বিবাহ বাসর। সখীরা কমলাকে নানা অলংকারে সাজিয়ে দিচ্ছেন। বিবাহ বাসরে কমলা বরকে সাতপাকে প্রদক্ষিণ করছেন। কবির কলমে কমলার বিবাহ বর্ণনা হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের উৎসব সংগীত। 'কমলা' পালায় চিকন গোয়ালিনীর চরিত্রের সূত্রে কবি শঙ্খ শিল্পের প্রসঙ্গ এনেছেন। শঙ্খ শিল্প লোকশিল্প। হিন্দু বিবাহিতা রমণী শাঁখা পরার সময় নানা ধর্মীয় লোকাচার মেনে চলেন। স্বামী মারা গেলে বিবাহিত 'রমণী' শাঁখা পরেন না। কিন্তু চিকন গোয়ালিনী ধর্মীয় অনুশাসন মানেননি। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি শাঁখা পরেছেন। কবি লিখেছেন—"সোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাঁখা।"[৮] 'দেওয়ান ভাবনা' পালার নায়িকা সুনাই। মাধবের সঙ্গে সুনাইয়ের প্রণয়। স্বামীকে বাঁচাতে সুনাইয়ের আত্মত্যাগ এই পালার বর্ণিতব্য বিষয়। 'দেওয়ান ভাবনা' পালাতে হাত এবং বাহুর অলংকারের উল্লেখ রয়েছে। 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় নিম্নলিখিত অলংকারগুলি এসেছে—বাজুবন্ধ (বাহুর অলংকার, পৃ. ২৩৯); হার (পৃ. ২৩৯); পুষ্প হার (পৃ. ২৪৪)। সুনাইয়ের জন্য মাধব জলে সাঁতার দিতে চায়। বাহুতে পরিয়ে দিতে চায় বাহুর অলংকার 'বাজুবন্ধ' লোককবি লিখেছেন—

> বাহুতে পরাইয়া দিবাম বাজুবন্ধ তার।
> হীরামতি দিয়া দিবাম তোমার গলার হার।। (৮ক)

আর বাসর সজ্জার জন্য পুষ্প হারের উল্লেখ করেছেন কবি। ফুল গেঁথে গেঁথে ফুলহার তৈরি করেন মালীরা। কুসুমশিল্প বাংলার লোকশিল্পীদের আশ্চর্য সৃষ্টি। ফুলসাজে পুরুষ-রমণী অপরূপ

সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে। আচার অনুষ্ঠানে ,পূজাপার্বণে, বিবাহ বাসরে, গৃহসজ্জায়, ফুলের শোভা সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই।

'দস্যু কেনারামের' পালা'য় কাঁসা পিতলের অলংকারের উল্লেখ আছে। কাঁসা পিতলের অলংকার ডোকরা শিল্পের গোত্রভুক্ত। 'দস্যু কেনারামের পালা'—চন্দ্রাবতীর রচনা। চন্দ্রাবতীর পিতা বংশী দাস দস্যু কেনারামকে তাঁর দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেছে। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর অপরাধ মার্জনা করে, তাকে আত্মহত্যার পাপ পথ থেকে মুক্ত করেছে। কাঁসা পিতলের শিল্প ডোকরা শিল্প। এই শিল্প আজ ক্ষয়িষ্ণু। পিতল গলাবার পাত্রে মোম, পিতল, ধুনো প্রভৃতি দিয়ে আশ্চর্য পদ্ধতিতে ডোকরা কামারেরা কাঁসা পিতলের অলংকার তৈরি করেন। এই শিল্প আজ অবলুপ্তির পথে। 'দস্যু কেনারামের পালা'র 'মনসামঙ্গাল' অংশে দেবী চণ্ডী ডুমুনী মাঝির বেশ ধরে সামান্য মূল্যের কাঁসা পিতলের অলংকারের বদলে নিজের বহুমূল্য অলংকার পাটনি বালিকাকে (সুরুয়া) দান করেছেন। কবি লিখেছেন—চণ্ডী বলে "শুন সুরুয়া" আমার উত্তর।/তোর অলঙ্কার মোরে পরি বদল কর।।/তব কংসপিত্তলের দেহ অলঙ্কার।/তুমি নিয়া যাই মোর রত্ন অলংকার।।[৯] মনসা মঙ্গালকাব্যের ভিন্নতর রূপায়ণ লক্ষ করা গেছে পালাটির মধ্যে। পালাটিতে দৈব মাহাত্ম্য প্রবল।

'রূপবতী' পালায় হাতির দাঁতের পাটির অলংকার এবং গজমোতির মালার উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেকালে হাতির দাঁতের পাটির অলংকার মূল্যবান শিল্প রূপে বিবেচিত হত। রাজা রাজচন্দ্র নবাবকে হাতীর দাঁতের পাটির অলংকার এবং গজমতির মালা উপঢৌকন দিতে চেয়েছেন। এই অলংকারগুলি দেওয়ার জন্য তিনি পানসী সাজিয়েছেন। 'রূপবতী' পালায় যেসব অলংকারের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ—হাতির দাঁতের পাটির অলংকার (পৃ. ২৮৭); গজমোতির মালা (পৃ. ২৮৭); ফুলের হার (পৃ. ৩০১)। গজদন্ত শিল্প প্রাচীন লোকশিল্প। খুব বৃহৎ হাতির দাঁতের এমন শিল্পকর্ম ভারি চমৎকার। হাতির দাঁত এই শিল্পের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এই শিল্প মসৃণ, সুন্দর ও কোমল। এই শিল্প কারুকার্যময়। হাতির দাঁতের শিল্প ভারতবর্ষের শিল্পগৌরবকে উজ্জ্বল করেছে। বর্তমানে এই শিল্প লুপ্তপ্রায়। বিস্মৃত উপকথার মতো সাহিত্যের পাতা অথবা গবেষকের গবেষণায় এই শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। লোককবি লিখেছেন —"হাত্তীর দাঁতের পাটি লইল গজমতি মালা।/ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা।।[১০]

৪

অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানবজাতিকে পৃথক করেছে তার সৌন্দর্যপ্রিয়তা। অলংকার সৌন্দর্যের আধার। মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলিতে লক্ষ করা গেছে, বেশিরভাগ খল চরিত্রগুলি নারীকে মোহিত করতে চেয়েছে অলংকার দিয়ে। কালিদাসের কালেও নগরীর বিপণিতে সাজানো থাকত হার, উজ্জ্বল মণি, শঙ্খশুক্তি, মরকতমণি এবং প্রবালখণ্ড। যা দেখে মনে হত সমুদ্রে শুধু জলই আছে। কালিদাস লিখেছেন—

হারাংস্তারাংস্তরলগুটিকান্ কোটিশঃ শঙ্খশুক্তীঃ
শষ্পশ্যামান্মরকতমণীনুন্ময়ূখপ্ররোহান্।
দৃষ্ট্বা যস্যাং বিপণিরচিতান, বিদ্রুমাণাঞ্চ ভঙ্গান্
সংলক্ষ্যন্তে সলিলনিধয়স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ।।৩৪।।[১১]

মৈমনসিংহ গীতিকা'য় মধ্যযুগে প্রচলিত অনেক অলংকারের উল্লেখ আছে। 'Indian Folk arts and crafts' গ্রন্থে Jasleen Dhamija লিখেছেন—

> In West Bengal silver and gold is worked into jewellery. Filigree technique is practised and designs are extremely delicate. Some of the finest pieces of jewellery are the hair ornaments. These are Tara kanta and Pan kanta. The Tara kantas are

pins made in the form of flowers and stars. The pan kanta is the betel leaf ornament which is fixed to the centre of the hairbun. Very finely shaped hathphools in filigree are also used by the Bengali women.[১২]

মৈমনসিংহ গীতিকা' অবিভক্ত বাংলাদেশের লোকসৃষ্টির সর্বোত্তম সাহিত্যরূপ। সমগ্র লোকজীবন এক নিটোল সাহিত্যরূপের আধারে ধরা পড়েছে এখানে। লোকশিল্প লোকজীবন উত্থিত লোকায়ত সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকজীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নাভরা চিত্রটি ধরা পড়েছে মৈমনসিংহ গীতিকা'য়। আর লোকশিল্প ছাড়া লোকজীবন অসম্পূর্ণ, গতিহীন। জীবন-যাপনের প্রতিটি ধাপে লোকশিল্প লোকজীবন এবং লোকসমাজকে সুবিন্যস্তভাবে শীলিত করেছিল একদিন। সেই লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পের পরিচয় মৈমনসিংহ গীতিকার পাতায় পাতায় বিধৃত হয়ে আছে। লোকশিল্পীরা অন্তরের মমত্ব এবং হৃদয়ের লাবণ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন সভ্যতার প্রাণশক্তি। এই লোকশিল্পীদের ঘামে-রক্তে সৃষ্ট এবং পুষ্ট হয় এমন লোকশিল্প।

পৃথিবীর লোকায়ত শিল্পের মধ্যে স্থানিকতার বৈশিষ্ট্য থাকলেও এক অন্তর্নিহিত সার্বজনীন ঐক্য আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানবগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদ পরলেও কেউই পোশাক বর্জিত নয়। অনুরূপ পৃথিবীর দেশে দেশে অলংকারের রীতি প্রকৃতি এবং ধরন বিভিন্ন হলেও সৌন্দর্যস্পৃহা মানবমনে অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য হয়ে ধরা পড়েছে। যে কালে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সেভাবে ঘনিষ্ট যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি, সেকালেও দেশে দেশে বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। শেক্সপীয়রের 'Merchant of Venice' নাটকে একটি ring বা আংটি কীভাবে নাটকটিকে নাট্য তাৎপর্যে উন্নীত করেছে তা দেখা যেতে পারে। বিবাহের সোনার আংটি। পোর্সিয়ার উপহার দেওয়া বিয়ের আংটি।

Shakespeare এর 'The Merchant of Venice' নাটকে আংটির উল্লেখ আছে।[১৩] বিবাহের আংটিকে হাতছাড়া করতে নেই। সারাজীবন সযত্নে রক্ষা করতে হয়। আংটি শুধু অলংকার নয়। একটা প্রতিশ্রুতি। একটা বিশ্বাস। শেক্সপীয়র আংটিকে অবলম্বন করে সাহিত্য কীর্তির সুউচ্চ সৌধ নির্মাণ করেছেন। সৌভাগ্যবতী পোর্সিয়া। এই আংটিই এনেছিল সৌভাগ্যের বার্তা। আংটি নাটকটির মিলনাত্মক পরিণতি বহন করে আনল। নাটকে ঘটে গেল মধুর পরিসমাপ্তি।

৫

রমণীর অলংকার প্রীতি তাঁর রূপসন্ধানী এবং সৌন্দর্য সন্ধানী মনের বিশেষ চিহ্ন বহন করে এসেছে। অলংকারের প্রয়োজনীয়তা বহুকৌণিক। সৌন্দর্যচেতনা ছাড়াও সামাজিক প্রয়োজনের দিকটিও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানবমন সততই সৌন্দর্য সচেতন। সৌন্দর্যবোধই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করে ফেলেছে। সামাজিক প্রয়োজনের কথা বললে বলতে হয়—কন্যাপণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ এবং রীতি-নীতি পালনের জন্য কখনোও সখনো অলংকার ব্যবহার হয়। সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের অলংকার পরিধানের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং লোক-লৌকিকতাকে মান্যতা দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কোমরের নীচে অলংকার পরা নিষিদ্ধ ছিল। এছাড়া ব্রাহ্মণদের সোনার তৈরি জুতা ও সোনার পাতের তৈরি খড়ম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক অনুশাসন বিষয়ক মানা ছিল। স্বর্ণকারেরা গ্রামের মধ্যেই নির্দিষ্ট পল্লিতে বসবাস করতেন। তবে গ্রামবাসী যারা শিল্পীদের কাছে অলংকার প্রস্তুত করাতেন, গ্রাম্য শিল্পিরা তাদের পিতার নাম-ধাম-গ্রাম-জাতি-বৃত্তি-গোত্র কুষ্ঠি ঠিকুজি প্রভৃতি নিজেদের খাতায় লিখে

সংরক্ষিত রাখতেন। মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্তর বিভাজন অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেকালে। রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, জমিদার প্রভৃতি সমাজের উপর তলার মানুষদের গহনার প্রতি আকর্ষণের স্পষ্ট কারণ নির্ণয় করা সহজ। সামাজিক মান অনুযায়ী গহনার প্রতি আকর্ষণের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থনৈতিক ভাবে অবহেলিত মানুষ অলংকারের অনুসন্ধান করেন না। এক সামাজিক অসম-বিষমতা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। অনার্য-অস্ট্রিক দারিদ্র্য পীড়িত নরনারী সৌন্দর্য স্পৃহা পূরণ করেছে ফুল-লতাপাতা প্রভৃতি দিয়ে।

'মৈমনসংহ গীতিকা'র কবিকুল তাঁদের কাব্য প্রকরণে নায়িকার রূপচর্চায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় উত্তরাধিকার এবং ঐতিহ্যকে বহন করলেও সমকালের দেববাদ এবং ভক্তিবাদকে ছাড়িয়ে এঁরা হয়ে উঠেছেন মুক্তপক্ষ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের খোলস ছেড়ে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র চরিত্রগুলি আপন হৃদয়কে চালিত করেছেন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে। রক্ত মাংসের স্পন্দন অনুভব করা যায় চরিত্রগুলির মধ্যে। আপন প্রণয়কে মর্যাদা দেওয়ার জন্য যে-কোনো কঠিন বাধা অতিক্রম করতে পারেন এই নারী চরিত্রগুলি। যথার্থ সাহসী-সমর্থ এঁরা। জীবন এদের কাছে তুচ্ছ। মহতী আত্মত্যাগকে নারী চরিত্রগুলি সহজেই বরণ করে নিয়েছেন সেই পুরাতনী কথার মত। কবিরা এই চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করতে চেয়েছেন। সৌন্দর্যসন্ধানী এই চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মধ্যযুগীয় অলংকারের ঠিকরে পড়া আলোর বিভায়। সেই সূত্রে মধ্যযুগের প্রায় লুপ্ত অলংকারের একটি পূর্ণাঙ্গ লেখচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলিকে অবলম্বন করে।

উৎসের সন্ধানে

১. কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'গহনা', প্রবন্ধ, প্রবাসী ২৭ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৪, সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৫৫৪

২. দীনেশচন্দ্র সেন : 'মৈমনসিংহ গীতিকা', মহুয়া পালা, প্রজ্ঞাবিকাশ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৩৪

৩. পূর্বোক্ত, মলুয়া পালা, পৃ. ৯২

৩/ক. পূর্বোক্ত, কঙ্ক ও লীলা, পৃ. ১২৬

৪. পূর্বোক্ত, কঙ্ক ও লীলা, পৃ. ১৫৬

৫. পূর্বোক্ত, কঙ্ক ও লীলা, পৃ. ১৫৭

৬. পূর্বোক্ত, কাজলরেখা পালা পৃ. ১৬৮

৭. পূর্বোক্ত, কমলা পালা, পৃ. ২৩২-২৩৩

৮. পূর্বোক্ত, কমলা পালা, পৃ. ১৯৫

৮/ক. পূর্বোক্ত, দেওয়ান ভাবনা পালা, পৃ. ২৩৯

৯. পূর্বোক্ত, দস্যু কেনারামের পালা, পৃ. ২৬১

১০. পূর্বোক্ত, রূপবতী পালা, পৃ. ২৮৭

১১. রাজশেখর বসু : কালিদাস 'মেঘদূত' (পূর্বমেঘ), এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭৩, পৃ. ২৯

১২. Dhamija, Jaslee, Indian Folk Arts and Crafts, National Book Trust, India 2014, New Delhi-110070, P. 60

13. William Shakespeare, The Merechant of Venice Act—V, Scene—IEdited by Xavier pinto Morning star, 4626/18 Ansari Road, Darvagani New Delhi—110002, 2016, P. 145

কবিগানে বৈষ্ণব ভাবনা : একটি পর্যালোচনা

সুবীর ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে কবিগান বহু বিতর্কিত সাহিত্যবস্তু। যার সৃষ্টি নিয়ে বিতর্ক, বিনষ্টি নিয়েও বিতর্ক। ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেছেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই উনিশ শতকের মধ্যেই কবিগানের বিদায়-ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় আমরা দেখেছি কি পূর্ববঙ্গ, কি পশ্চিমবঙ্গ—কবিগান হারিয়ে যায়নি এখনও। এখনও কবিগানের প্রতিযোগিতা হয়। এখনও আপামর বাঙালি কবিগানের ঢোল-কাঁসির আওয়াজ এবং চাপান-উতোরের উত্তেজনায় মুখরিত হয়ে ওঠে। কবিগানের মূল আকর্ষণই হল উক্তি-প্রত্যুক্তি ও চাপান-উতোর ধর্মী কবির লড়াই। কিন্তু সেগুলির কোনো লিখিত দলিল তেমন একটা পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে অনেক সংগ্রাহকই কবিগানের কিছু কিছু পয়ার ও পাঁচালি গান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন ঠিক, কিন্তু কবিগানের মূল আত্মা যে চাপান-উতোরধর্মী উক্তি-প্রত্যুক্তির গান, তা আজও কোনো গবেষক তেমনভাবে সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। বাংলা মঙ্গালকাব্যের শেষ যুগে, মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন লোকজ সংগীতধারাকে আত্মস্থ করে কবিগান পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। কবিগানের পশ্চাৎপট হিসেবে বৈষ্ণব সহজিয়া-সাহিত্য তথা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেম-লীলা-কথনের বিরাট ব্যাপ্তির কথা স্মরণ করতেই হয়। গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের যে কাব্যকথা কবিগানের জন্মলগ্নের আগে পর্যন্ত সমগ্র বাংলা সাহিত্যধারাকে প্লাবিত করে রেখেছিল সেই প্রভাব যে কবিগানের যুগেও অবসিত হয়নি, তার প্রমাণ কবিগানসহ অসংখ্য লোকজ সংগীতধারাগুলি। সেখানে হয়তো সর্বত্র বৈষ্ণব সাহিত্যের শুচিস্নিগ্ধ মাধুর্য ও নির্মলতা রক্ষিত হয়নি, কোথাও বা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে তা স্থূল-রুচি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সংগীতের সুর-তালে সমস্ত ত্রুটি চাপা পড়ে গেছে। প্রথম দিকে কবিগানের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য ও শাক্ত সাহিত্যেরই প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী সময়ে

বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত সমস্ত কিছুর সন্নিবেশ ঘটেছে কবিগানে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, অন্যান্য লোকায়ত সংগীত অপেক্ষা কবিগানের বিস্তার অনেক বেশি। একজন কবিয়ালকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ-উপপুরাণ, বেদ, কোরান, হাদিস, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যচরিত সাহিত্য, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত কিছুর সঙ্গে পরিচিত থাকতে হয়। কেননা কবিগানের আসরে কোন্ পালায় কোন্ বিষয়ে গান হবে তা কবিয়ালরা আগাম জানতে পারেন না। যে কবিয়াল যত বেশি বিষয়কে আয়ত্ত করতে পারেন, কবিগানের আসরে সেই কবিয়াল তত বেশি দর্শক-শ্রোতার জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হন। একজন কবিয়ালের পক্ষে সব শাস্ত্রের সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে জানা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে নবীন কবিয়ালদের পক্ষে এত শাস্ত্র গ্রন্থ আয়ত্ত করা তো কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। আর তখনই প্রয়োজন পড়ে গুরুর। গুরুর কাছে শাস্ত্রালোচনা শুনে শুনেই প্রাথমিক ভাবে একজন কবিয়াল নিজেকে তৈরি করেন। তারপর শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে হয়।

কবিগানের প্রাচীন ক্ষেত্র হিসাবে নদে-শান্তিপুর এবং রাঢ়-বীরভূমের নাম বিভিন্নভাবে উঠে আসে। কবিগানের পূর্বরূপ হিসাবেও খেঁড়ু এবং ঝুমুর গানকেই বেশি অগ্রাধিকার দিতে হয়। দু'টি-ই পশ্চিমবঙ্গ তথা বৃহত্তর রাঢ় বাংলার সংগীত-ফসল। এই দু'টি সংগীতকলা ছাড়াও কবিগানের পূর্বরূপ হিসাবে আখড়াই, হাফ-আখড়াই, যাত্রা, পাঁচালি, টপ্পা—সবগুলিরই উৎসভূমি পশ্চিমবঙ্গ তথা বৃহত্তর রাঢ়বঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ তথা রাঢ়ের কবিগানে ভৈরবী, প্রভাতী, গোষ্ঠ, সখীসংবাদ, বিরহ প্রভৃতি আবশ্যিক অঙ্গবিভাগ বর্তমানে বর্জন করা হয়েছে। পরিবর্তে ভবানীবিষয়ক মালসী গেয়ে, ছড়া-পাঁচালি গেয়ে সরাসরি বিষয়কেন্দ্রিক বা পালাকেন্দ্রিক আলোচনায় প্রবেশ করা হয়। পালাকেন্দ্রিক আলোচনাতেই বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আলোচনা ও তাত্ত্বিক বিষয়গুলি উঠে আসে প্রশ্নোত্তর বা চাপান-উতোরের মাধ্যমে। পূর্ববঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গ—দুই ধারার কবিগানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শন ও বৈষ্ণবীয় সাহিত্য। কবিগানের সৃষ্টিকাল থেকেই বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শন কবিগানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথসহ অনেক সাহিত্য সমালোচকই কবিগানের উদ্ভবের পিছনে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রসঙ্গের প্রভাবকেই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করে গেছেন।[১]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিগানের আদি সংগ্রাহক হলেও বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত কবিগানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধানবিলাস' গ্রন্থে। অবশ্য সে কবিগান এখনকার কবিগানের মতো নয়। সেই কবিগান ছিল প্রাচীন দলকবির নামান্তর। 'করুণানিধানবিলাস' গ্রন্থে যে কবিগানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তা মূলত অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের কবিগান। তখন কবিগান অনুষ্ঠিত হত প্রায় তিনরাত্রি ধরে এবং দু'দলে বিভক্ত হয়ে—

> তিনরাত্র কবি গায় দু'দল হইয়া।/হারি-জিতি শব্দগুণে শুনে মন দিয়া।।/গোপীতে করিল সৃষ্টি কবির কীর্তন।/অদ্যাবধি সেই গান করে নরগণ।।[২]

দু'টি দলের একটি হল চন্দ্রাবলীর সখীর দল, অপরটি কামকলার সখীর দল। একদল গান গেয়ে আসন গ্রহণ করলে, অপর দল আসরে উঠে গানের মাধ্যমে তার উত্তর দিত। এই গানের চারটি পর্যায় ছিল—

১. গুরুদেবের গীত বা গুরু বন্দনার গান

২. সখীসংবাদ বা রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান

৩. বিরহ বা কৃষ্ণবিরহাতুর শ্রীরাধার বিলাপের গান

৪. খেউড় বা রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক স্থূল রুচির আদিরসের গান। প্রত্যেকটিতে আবার চিতান ও টপ্পা এই দুটি ভাগও থাকত। ঈশ্বর গুপ্তের আগে পর্যন্ত কবিগান বিষয়ে কম-বেশি আলোচনা হলেও কবিগান সংগ্রহ ও কবিগানের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস বা আঙ্গিক নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। ঈশ্বর গুপ্তই এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং কবিগানের মধ্যে পাঁচটি অঙ্গের সংস্থান লক্ষ করেছেন—১. ভবানীবিষয়ক, ২. সখীসংবাদ, ৩. বিরহ, ৪. খেউড়, ৫. লহর।[৩] এগুলির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম তিনটি পর্যায়ের গান উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং প্রথম মুদ্রিত কবিগানের গ্রন্থ ('করুণানিধানবিলাস') এবং প্রথম কবিগানের সংগ্রাহক (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)—দুই ক্ষেত্রেই সখীসংবাদ বা রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের কথা গুরুত্ব দিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

'সখীসংবাদ' প্রধানত রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক গান, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বৈষ্ণব পদাবলি আশ্রয়ী। অনেকে এর সঙ্গে 'গোষ্ঠ'কে এক পর্যায়ভুক্ত করে ফেলেন। প্রাচীন কবিগানে অবশ্য 'গোষ্ঠ' নামে পৃথক একটি পর্ব বিন্যাসও করে থাকেন অনেকে। যাইহোক, 'গোষ্ঠ' ও 'সখীসংবাদ' দুটি পর্যায়েরই মূল অবলম্বন বৈষ্ণব পদাবলি বা বৈষ্ণবীয় সাহিত্য। পদাবলী সাহিত্যের দূতি-সংবাদ, সখীসংবাদ, অক্রুর-সংবাদ, উদ্ধব-সংবাদ প্রভৃতি সংলাপবহুল উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাটকীয়তা থেকেই কবিগানের এমন নামকরণ মনে করা হয়। মূলত বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ, অনুরাগ, নৌকাবিলাস, প্রভাতী বা খণ্ডিতা, বসন্ত, অভিসার, মান, কলহান্তরিতা, আক্ষেপানুরাগ, মানভঞ্জন, কলঙ্ক ও কলঙ্কভঞ্জন, বিরহ, মাথুর, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্ত্য, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিষয়গুলি লোকজ ভাবধারায় কবিগানে 'সখীসংবাদ' অংশে পরিবেশিত হত প্রাচীন কবিগানে।

রাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিরহ, কৃষ্ণের মথুরা গমন, বৃন্দাবন বিস্মৃতি, ললিতা-বিশাখার মথুরায় গিয়ে রাধার শোচনীয় অবস্থা জ্ঞাপন, কুব্জার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ নিয়ে সখীদের ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রভৃতিই ছিল প্রাচীন কবিগানের বিষয়। বৈষ্ণব পদাবলির মাথুর, মিলন, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে রচিত অশিক্ষিত শ্রোতা সাধারণের উপাদেয় এই গানগুলি অনেকক্ষেত্রেই তাই মোটা দাগের, স্থূল রুচির ও অমার্জিত হয়ে পড়তো। বৈষ্ণব পদাবলির সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও ব্যঞ্জনাকে ধরতে না পেরে স্বল্পশিক্ষিত পেশাদার কবিওয়ালারা অত্যন্ত লঘু আকারে পরিবেশন করায়, অনেক বিরূপ সমালোচনাও তাই কবিগানের ভাগ্যে জুটেছে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ কবিওয়ালাদের সখীসংবাদের গানগুলিকে 'বাসি ব্যঞ্জনে'র সঙ্গে তুলনা করে কঠোর সমালোচনা করেছেন তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'কবি-সংগীত' নামক প্রবন্ধে।[৪]

বৈষ্ণব পদাবলির খণ্ডিতা ও মানিনী রাধার ঈর্ষা ও ব্যাকুলতা নির্দেশক গানগুলি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি একেবারেই। কেননা সেখানে স্থূলতা, গ্রাম্যতা, চটুলতা উৎকট রূপে বিদ্যমান ছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে বলে নেওয়া প্রয়োজন, প্রাচীন কবিগানে বৈষ্ণব পদাবলির সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও ব্যঞ্জনা খুঁজতে যাওয়া নির্থক। জনমনোরঞ্জন ও পেশার নাগিদে তৎকালীন কবিওয়ালাগণ সখীদের অভিযোগ, কৃষ্ণের ছলনা, রাধার কলঙ্ক প্রভৃতি বর্ণনায় গ্রাম্যতা স্থূলতাকে অতিক্রম করে উঠতে পারেননি। ফলে ধর্মীয় বাতাবরণ ও শিল্পের সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে সখীসংবাদকে বৈষ্ণব পদাবলীর

অক্ষম অনুকরণ বলে মনে হয়। রাঢ়ের আধুনিক কবিগানে অবশ্য 'সখীসংবাদ' বলে পৃথক কোনো শ্রেণিবিন্যাস নেই। এখানে বৈষ্ণবীয় সাহিত্য ও তত্ত্ব-দর্শনের কথা আলোচিত হয় বিশেষ পালাকেন্দ্রিক আলোচনার মাধ্যমে।

'কবি-সংগীত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হল, বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে কবিগানের জন্ম। সেখানে প্রেমের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতাই প্রাধান্য পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কবিগানে তা সর্বাংশে পরিত্যক্ত হয়েছে। কবিগানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের মহত্ত্ব নয়, প্রেমের বিচ্যুতিই বড়ো হয়ে দেখে দিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলির অতীন্দ্রিয়তা, শুচিস্নিগ্ধতা এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং সখীসংবাদের গানে কবিয়ালরা প্রেমের বঞ্চনা ও ছলনাকেই গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, কবিগানে প্রেমের বিচ্যুতি আসলে সমাজেরই বিচ্যুতি, সময়ের বিচ্যুতি। কবিগান যে সময়ে ফুলে-ফলে বিকশিত হচ্ছে তখন বৈষ্ণব পদাবলীর অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুর্য আর কোথাও অবশিষ্ট ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীর কাল অনেক দিন হল অবসিত হয়ে গেছে। যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তা হল বৈষ্ণব পদাবলির সাংগীতিক প্রাণরস এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কথনের লৌকিকতা। কবিয়ালরা তাকেই উপজীব্য করেছে দর্শক-শ্রোতার পরিতৃপ্তির জন্য।

সহজিয়া সাহিত্যের তত্ত্বগন্ধী স্থূলত্ব ও গূঢ়তা কবিগানে প্রাধান্য পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই বৈষ্ণব পদাবলির ধর্মীয় গণ্ডি সেখানে ছিঁড়ে গেছে। 'কৃষ্ণ কলঙ্কে কলঙ্কী' হওয়ার শ্লাঘা কবিয়ালরা ত্যাগ করতে পারেননি। খণ্ডিতা রাধার মনোবেদনা, বহুবল্লভ কৃষ্ণের ছলচাতুরী বৈষ্ণব পদাবলির ধর্মীয় পরিমণ্ডলে একরকম মানিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবিয়ালদের হাতে পড়ে ধর্মীয় খোলস উন্মুক্ত হয়ে জনগণের দরবারে পরিবেশিত হওয়ার সময় তা কিছুটা অশোভন লাগে ঠিকই, কিন্তু জনগণের দরবারে তা নিঃসন্দেহে উপাদেয় ছিল সন্দেহ নেই। ঠিক এই কারণেই খণ্ডিতা ও মানিনী রাধার ঈর্ষা ও ব্যাকুলতা নির্দেশক কবিগানের পদগুলি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। তবে হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগীর মতো কিছু কবিয়াল তাদের রচনায় বৈষ্ণবীয় পদের কাব্য সৌন্দর্য কিছুটা ধরে রাখতে যে সক্ষম হয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হরু ঠাকুরের রচিত বিরহিণী শ্রীরাধার মর্মবেদনার আর্তি মিশ্রিত তেমনি একটি সখীসংবাদের গান তুলে ধরা হল—

> ও সখি রে/কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না।/মনেতে করিতে এ বিধুবয়ানো,/সখি এ যে পাপো প্রাণে ধৈরয ন মানে,/প্রবোধি কেমনে তা বল না।।/সই হেরি ধারাপথো, থাকয়ে যেমতো, তৃষিত চাতক জনা।/আমি সেই মত হোয়ে, আছি পথ চেয়ে,/মানসে করি সে রূপো ভাবনা।।/হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী কেন চক্রপাণি এখনো,/না এলো কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে রহিল, না জানি কারণো।।[৫]

'সখীসংবাদ' ছাড়াও বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের প্রভাব কবিগানের আর একটি পর্যায়ে পড়েছে। আর তা হল—'গোষ্ঠ'। অনেকে এই প্রভাবের কথা চিন্তা করে এই দুটি পর্যায়কে একটি পর্যায়েই দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে পদাবলি সাহিত্য ছাড়াও 'গোষ্ঠ' পর্যায়ে ভাগবত-সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, যশোদার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি, কৃষ্ণের গোষ্ঠগমন, কালিয়দমন, অসুরবধ, অক্রুর দর্শনে যশোদার খেদ, বৃন্দাবন ত্যাগ, প্রভাস যজ্ঞ প্রভৃতি এই পর্বে পরিবেশিত হয়। কবিগানের এই পর্বে লোকজ কৃষ্ণযাত্রারও প্রভাব আছে। তবে এই পর্যায়ের গান গাওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা কবিগানে ছিল না, এখনও নেই। রাঢ়ের বর্তমান কবিগানে 'গোষ্ঠ' পর্যায়ের

গান আলাদা করে গাওয়া না হলেও গোষ্ঠের গানের চল আছে অবশ্যই। পালা অনুযায়ী এগুলি গাওয়া হয় কখনও কখনও।

রাঢ়ের আধুনিক কবিগান ও কবিওয়ালাদের মধ্যেও বৈষ্ণবীয় মতাদর্শের প্রভাব অনেকখানি। অন্যান্য লোকসংগীতের মতোই কবিগানও বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে জারিত। তবে এক্ষেত্রে শুধু রাধা-কৃষ্ণের ভক্তিরসাশ্রিত প্রেম সংগীতই নয়, রাঢ়ের আধুনিক কবিগানে বড়ো জায়গা অধিকার করে আছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। রাঢ়ের আধুনিক কবিগান মূলত ঈশ্বরের চারটি লীলায় অনুষ্ঠিত হয়—রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা এবং জগন্নাথলীলা। গৌরলীলার সমস্ত গানই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ প্রভাবিত। গৌরলীলার গানে কবিওয়ালাদের প্রধান অবলম্বন কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ। আধুনিক কবিগান পালাভিত্তিক গান আর অধিকাংশ বৈষ্ণবীয় পালাই চৈতন্যচরিতামৃতকেন্দ্রিক। তবে বৈষ্ণবীয় পালায় গান করতে গেলে কবিয়ালদের আরও বেশকিছু গ্রন্থ পড়তে হয়। যেমন—ভাগবত, চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বিষয়ক বাংলা ও সংস্কৃত বইগুলি কমবেশি না পড়লে অথবা না জানলে কবিগান করা যায় না।

আধুনিক কবিগান শুরু হয় গৌর বন্দনা বা গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে। এই গৌরচন্দ্রিকা পরিবেশন করে সাধারণত দোহাররা। শুধু বৈষ্ণবীয় বিষয় বলেই নয়, যে কোনো বিষয়েই গান হোক না কেন গৌরচন্দ্রিকা গাইতেই হয়। সমস্ত বিখ্যাত কবিওয়ালারাই গৌরবন্দনার গান রচনা করে গেছেন। তবে কবিওয়ালাদের রচিত গৌরচন্দ্রিকার পদই যে গাইতে হয় এমন কোনো কথা নেই, কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকার পদও দোহাররা অনেক সময় গেয়ে থাকেন। বর্ধমানের কবিয়াল সনৎ বিশ্বাসের রচিত একটি গৌরচন্দ্রিকার পদ এক্ষেত্রে তুলে ধরা হল—"তোরা কে যাবি আয় এই নদীয়ায়/গোরা চাঁদের এই প্রেমের হাটতলায়।" (ধ্রু)

প্রথম কলি : বাহু তুলে বললে হরি/হরি নেবে তোমার দুঃখ হরি/পরিহারী সকলই মায়ায়।/সেথায় গোলকবিহারী দেবে প্রেম সুধায়।/

দ্বিতীয় কলি : খাবি মাগুর মাছের ঝোল/পাবি যুবা নারীরও কোল/হরিবলে দাঁড়ালে সেথায়।/পাবি আনন্দের দই আনন্দের হই।/প্রেমের ঝুলনায়—

তৃতীয় কলি : আমি কবে নবদ্বীপে যাবো/মায়াপুরে পার হইব/চৈতন্য-শ্রীবাস আঙিনায়।/অধম সনত বিশ্বাস, আছে প্রতীক্ষায়।/গোরা চাঁদের প্রেমের হাটতলায়।।/তোরা কে যাবি আয়—/গোরা চাঁদের প্রেমের হাটতলায়।[৬]

কবিয়ালদের চোখে মহাপ্রভু শুধু প্রেমধর্মের প্রচারকই নন, স্বয়ং ভগবান। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির মিলিত প্রকাশ হলেন চৈতন্যদেব। শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ আস্বাদনের হেতু মর্ত্যে তাঁর আবির্ভাব। সেদিক থেকে বৈষ্ণবদের বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিয়ালরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতেরই পোষকতা করে থাকেন। কবিয়ালদের ব্যাখ্যায় শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের ঋণশোধ করতেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব। এ বিষয়ে অসংখ্য কবিগানের পাঁচালি গান আছে, যেগুলি গৌরলীলার যে-কোনো পালার শুরুতেই গৌরাঙ্গের জবানিতে কবিয়ালরা গেয়ে থাকেন। কবিয়াল অহীভূষণের রচনা তেমনই একটি গান এখানে তুলে ধরা হল—"যেন স্থির মনে পিয়া গো সেই দিনে/তব প্রেম ঋণে মুক্ত হবো, প্যারী।" (ধ্রু)

প্রথম কলি : সেদিন ব্রজের খেলা ত্যজে/এই পথের কাঙাল সেজে/রাধা বলে দেব ধুলায় গড়াগড়ি।

দ্বিতীয় কলি : আমার, পিতা বসুদেব, ত্যজে কলেবর/নদীয়াতে হবে মিশ্র পুরন্দর/আমার, দৈবকী মাতা, হবেন শচী মাতা/ভার তত্ত্বের কথা শুন লো সুন্দরী।

তৃতীয় কলি : আমার, দ্বাপরের সখা প্রাণাধিক শ্রীদাম/গৌরলীলায় হবে প্রিয় অভিরাম/এই কলির জীবে দিতে দুর্লভ হরিনাম/হবো নবদ্বীপ ধাম মাঝে অবতরী।

চতুর্থ কলি : আমি তব অঙ্গো অঙ্গা করিব গোপন/যেখানে যে যে ভাবের ভাব হবে উদ্দীপন/দাস অহীভূষণের এই আকিঞ্চন/অন্তে দিও যেন যুগল চরণ ত্বরী।/যেন স্থির মনে পিয়া গো সেই দিনে/তব প্রেম ঋণে মুক্ত হবো, প্যারী।[৭]

কবিয়ালদের চোখে সকলেই বৈষ্ণব নয়। কবিয়ালদের চোখে তারাই প্রকৃত বৈষ্ণব, যাদের মধ্যে রয়েছে তৃণের মতো সহ্য ক্ষমতা, তরুর মতো সহিষ্ণুতা, যারা অমানিকে মান দেয়, যারা স্মরণ-মনন-ধ্যান-সন্ধ্যাবন্দন এবং ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম সংকীর্তন করে, যারা সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করে, লালসা ও রসনাকে সংযত করে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করে— তারাই বৈষ্ণব। কবিয়ালদের বৈষ্ণব ভাবনা পদাবলিকারদের বৈষ্ণব সাধনার মতো সূক্ষ্ম ও গভীর নয়। বরং স্বল্পশিক্ষিত কবিওয়ালাদের নিজস্ব অনুভূতিজাত স্থূল ও মোটা দাগের। কবিয়ালের কাছে প্রকৃত বৈষ্ণব হলেন স্বয়ং মহাপ্রভু। তাই চৈতন্যস্তুতি করতে গিয়ে কবিয়ালরা গেয়ে থাকেন—

> তুমি প্রভু নারায়ণ/পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন/তুমি সেই বিধাতার ধাতা।/পুরুষ প্রকৃতি পর/ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর/তিন রূপধারী জগৎকর্তা।।/সংহার পালন স্থিতি/নমস্তে শ্রী জগৎপতি/দুষ্টে ধ্বংস সৃষ্টে পালন।/তুমি সূর্য দিবাকর/তুমি যম দণ্ডধর/যক্ষপতি জলেন্দ্র পবন।।/তুমি কান্তি তুমি মায়া/ত্রিজগৎ তব কায়া/তুমি উগ্র নিগ্রহ বিগ্রহ।/তুমি স্থল তুমি শূন্য/জগন্নাথ জগজ্জণ্য/জলে স্থলে চতুর্বূহ দেহ।।/মুখ পদ্ম তোমার দীপ্ত/ত্রিভুবন হইল তৃপ্ত/চন্দ্ররূপে ভুবনে প্রকাশ।/স্থিতি যার অন্তরীক্ষে/শূন্যে ভর দুই পক্ষে/নিজ গুণে তম কর নাশ।।/(কীর্তনের আখর) সখ্য ভাবে শ্রীদাম-সুদাম পুরে ভীমার্জুন।/শান্তের চেয়ে সখ্যতে রস বাড়য়ে তিনগুন।।/যাতে শান্ত-দাস্যের রস ভরা।/সখ্যে বহে তিন রসের ধারা।।[৮]

বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর নাম না করে কৃষ্ণনাম করেন। তবুও তারা কৈষ্ণব না হয়ে বৈষ্ণব। এমন চটুল প্রশ্নেরও মোকাবিলা অনেক সময় কবিয়ালদের করতে হয়। এক্ষেত্রে কবিয়ালরা মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন। যেহেতু মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ নামের জোয়ার এনেছেন, সেহেতু তারাও পরম বৈষ্ণব মহাপ্রভুর পথকে অনুসরণ করে কৃষ্ণের নাম করেন। বৈষ্ণবরা বলেন, একবার হরিনাম করলে যত পাপ হরণ হয়, পাপীর সাধ্য নাই সেই পরিমাণ পাপ করতে পারে। তাহলে অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর হরিনাম সংকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা কতখানি—এমন প্রশ্নেরও মোকাবিলা কবিগানের আসরে বৈষ্ণব ভূমিকাধারী কবিয়ালকে করতে হয়। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব ভূমিকাধারী কবিয়ালের ব্যাখ্যা, বৈষ্ণব নামসংকীর্তন করে কেবল নিজের জন্য না, সকলের জন্য। তাছাড়া তাদের নামসংকীর্তনের মধ্যে থাকে নিঃস্বার্থ ভক্তিবিনম্র নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা থেকেই জন্ম হয় ভক্তির। আর ভক্তি থেকে হয় প্রেমের অভ্যুদয়। এই প্রেমের জাগরণেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়—

> হরিনাম করতে করতে নামে নিষ্ঠা হয়।/নিষ্ঠা হতে ভক্তি ক্রমেতে জন্মায়।।/ভক্তি হতে হয় প্রেমের অঙ্কুর।/হৃদয় বীণায় বাজে মধুর মধুর সুর।।/শত বিপদে মন কিঞ্চিত না টলে।/প্রেমের লক্ষণ

সেই সাধু সন্ত বলে।।/সেই প্রেম পরিপাকে হৃদয়েতে ধরে।/স্নেহ নাম ধরি সুখ অধিকতর বাড়ে।।/স্নেহ পরিপাকে অভিমান নাশ হয়।/মান বাড়িলে তবে রস উপজয়।।/মান পরিপাকে তবে বিশ্বাস জন্মায়।/বিশ্বাসের পরিপাকে জন্মায় প্রণয়।।/প্রণয় হইতে হয় রাগের জনম।/রাগ হইতে অনুরাগ বাড়ে ক্রমে ক্রম।।/এই অনুরাগ হলে কৃষ্ণ ধরা দেয়।/এই পথে বৈষ্ণবেরা পুজে রসময়।।[৯]

রাঢ়ের আধুনিক কবিগানে বৈষ্ণবীয় পালাগুলিকে আমরা স্পষ্ট দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি—(ক) সাধারণ বৈষ্ণবীয় পালা (খ) গৌরাঙ্গ বিষয়ক বৈষ্ণবীয় পালা। সাধারণ বৈষ্ণবীয় পালাগুলির মধ্যে হল—'শাক্ত-বৈষ্ণব' এবং 'জগন্নাথ-গোপী গোয়ালিনী' পালাই উল্লেখযোগ্য। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পালাগুলির মধ্যে—১. গৌরাঙ্গ-জগাই মাধাই ২. গৌরাঙ্গ-চাঁদ কাজী ৩. গৌরাঙ্গ-মালিনী ৪. গৌরাঙ্গ-অভিরাম ৫. গৌরাঙ্গ-রামানন্দ ৬. গৌরাঙ্গ-সার্বভৌম ৭. গৌরাঙ্গ-প্রকাশানন্দ সরস্বতী ৮. গৌরাঙ্গ-চাপাল গোপাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাঢ়ের কবিগানে বৈষ্ণবীয় পালাগুলির মধ্যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পালার সংখ্যাই বেশি। গৌরাঙ্গ বিষয়ক এই পালাগুলি গাওয়ার ক্ষেত্রে কবিওয়ালাদের মূল অবলম্বন প্রধান দুটি চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ —'চৈতন্য ভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পরবর্তী সময়কে অবলম্বন করে যে সমস্ত পালাগুলি গাওয়া হয় তা মূলত চৈতন্যচরিতামৃত আশ্রয়ী। অবশ্য সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনাকে অবলম্বন করে গাওয়া পালাগুলিতে চৈতন্যচরিতামৃত' অপেক্ষা চৈতন্যভাগবত'-এর প্রভাবই বেশি। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পালাগুলি বেশি গাওয়া হয় নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায়।

প্রাচীন ও আধুনিক কবিগানের উভয় ধারাই বৈষ্ণবীয় প্রভাবকে কোনো ভাবেই অতিক্রম করে যেতে পারেনি। প্রাচীন কবিগানে শ্রীরাধার মান ও বিরহের বর্ণনায় কিছুটা অশ্লীলতা ও স্থূলতা এসে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু আধুনিক কবিগান বিষয়ভিত্তিক গান, যেখানে শাস্ত্র ও তত্ত্ব আলোচনা এবং যুক্তিতর্কই প্রাধান্য পায়। রাঢ়ের আধুনিক কবিগানে বৈষ্ণবীয় বিষয় বলতে চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যকেন্দ্রিক পালাকেই বেশি করে চিহ্নিত করা হয়। আর রাঢ়ের কবিগানে কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও চৈতন্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কবিয়ালদের গানে রাধাকৃষ্ণের যুগলসত্তা চৈতন্যদেব ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে এতটাই একীভূত যে, একজনকে পুজো করা বা বন্দনা করা, অন্যজনকে পুজো করারই সামিল। কবিয়ালদের গানে চৈতন্যদেব কেবল বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক নন, ভক্তিধর্মের প্রচারক। যে ভক্তিস্রোতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব ধর্ম মিলেমিলে একাকার হয়ে গেছে। তাই চারদিকে যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে মানুষের ওষ্ঠাগতপ্রাণ, বিদ্বেষের বিষবাষ্প যখন শান্তিকামী মানুষের নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে, তখন কবিয়ালদের এই সর্বধর্মমিলনের গানগুলি একঝাঁক টাটকা বাতাসের মতো মানুষের কাছে মৃতসঞ্জীবনী হয়ে দেখা দেয়। গ্রাম্য মানুষজন এই কবিগানের মধ্যেই খোঁজে এক বুক তৃপ্তির আস্বাদ। তেমনি একটি সম্প্রীতির কবিগানের পদ দিয়েই আলোচনা শেষ করা হল—

এই বেদন ভরা মায়ের মুখে ফুটবে মধুর হাসি রে—/মানুষ নামে দে পরিচয় বঙ্গাবাসী রে।/এই রূপসী বাংলা মা'কে বিশ্ববাসী চেনে/হরিনামের তরি গোরা আনিল যেখানে।/আচণ্ডালে প্রেম বিলালো জাতির বিচার নাই,/নামে রুচি, জীবে দয়া মানুষে শিখায়।/জাতি জাতি বজ্জাতিটা কে আনিল দেশে রে,/মানুষ নামে দে পরিচয় বঙ্গাবাসী রে।[১০]

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১১, পৃ. ৮২

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : পাদটীকা, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', চতুর্থ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৫ (তৃতীয় সং), পৃ. ৪৫

৩. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত : 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কল—২০ ১৯৯৮, পৃ. ১৪৬

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১১, পৃ. ৮২

৫. প্রফুল্লচন্দ্র পাল : 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃ. ৮৭

৬. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, গানটি বর্ধমানের কবিয়াল সনৎ বিশ্বাসের রচনা, আমগড়িয়া, পূর্ব বর্ধমান, ফাল্গুন ১৪২০

৭. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কবিয়াল অহীভূষণের রচনা এই গানটি কবিয়াল হারাধন দে'র মুখ থেকে শোনা, দেবগ্রাম, নদিয়া, ভাদ্র ১৪২০

৮. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কবিগানের আসরে 'রায় রামানন্দ ও চৈতন্য' পালায় কবিয়াল রঞ্জিত দাসের মুখ থেকে শোনা, শুকদেব বাবার আশ্রম, পানুহাট পূর্ব বর্ধমান, কার্তিক ১৪২০

৯. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কবির আসরে কবিয়াল অজিত কর্মকারের মুখ থেকে শোনা, বড়ডাঙা মেলা, শ্রীখণ্ড, পূর্ব বর্ধমান, মাঘ ১৪২০

১০. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কবিয়াল আফাজুদ্দিনের লেখা এই গানটি কবিয়াল কাঞ্চন মণ্ডলের খাতা থেকে সংগৃহীত, তারানগর, মুর্শিদাবাদ, ভাদ্র ১৪২০

বস্তুবাদ ও দেহবাদ : প্রসঙ্গ বাউল গান

অন্তরা ব্যানার্জি

বাংলার সমন্বয়বাদী, মানবতাপ্রেমী সংসারবিমুখ এক অতি প্রাচীন সাধক গোষ্ঠী হল বাউল। বাংলার সহস্র বছরের আচরিত লোকায়তধর্ম, উদারপন্থী মনন, বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধন-চিন্তন-মনন এবং মরমিয়া ক্রিয়াকর্মের এক মিশ্রিত ফলাফল হল বাউল সম্প্রদায়। বাউলের মানবতাবাদী দর্শনে শাস্ত্র, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, জন্মান্তর ইত্যাদি সম্পূর্ণ ত্যাজ্য এবং তাঁদের কাছে দেহই হল সাধনার মূল আধার। নারী দেহ, রস-রতির চর্চা তাঁদের সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাউলের কায়াসাধনার মধ্যে রয়েছে মৈথুন অভ্যাসের চর্চা। এবং এই সকল আচরণবিধির জীবন বেদ হল তাঁদের সংগীত। গানই তাঁদের সাধনার মন্ত্র; গানই তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নৈষ্ঠিক চর্চার বিরুদ্ধে আন্দোলনের শ্লোগান।

বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কালপর্ব, তার সঙ্গে জুড়ে যাওয়া অসংখ্য যুগসঞ্চিত ইতিহাসের আলোচনা আজও বাংলার এক সুবিশাল গবেষণারত অধ্যায়। আমাদের এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধের সীমায়িত শব্দসংখ্যায় তা ব্যক্ত হবার নয়, তাই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বর্তমানে শুধু বেছে নিতে চাইছি বাউলের চর্চা ও চর্যার বস্তুবাদী এবং দেহবাদী পরিসরটিকে। প্রসঙ্গত, বলতেই হয়, 'বাউল' শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শব্দজোড় হয়ে উপস্থিত হয় 'ফকির' শব্দটি। একথা না বলে পারা যায় না যে, সুফি মতাদর্শের অনুপ্রাণিত হওয়া, দরবেশ সাধকগণ ফকির নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখানে অবশ্য উল্লেখ্য এই যে, 'ফকির' শব্দটি কোনো সম্প্রদায়বাচক শব্দ নয়। কপর্দকহীন, নিঃস্ব, শূন্য মানুষই হল এই ফকির শব্দের দ্যোতনা। এবার 'বাউল-ফকির' এই শব্দলগ্ন তৈরির পিছনে বিশ শতকীয় সমাজের বিচ্ছিন্নতাবাদী আধিপত্য রয়েছে। যেখানে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা এবং সমকালীনতার প্রেক্ষিতে বিভাজনপ্রিয় রাজনৈতিক অস্থিরতা এদের একে অন্যের 'অপর' করে তুলেছে। শক্তিনাথ ঝা তাঁর 'বাউল ফটির ধ্বংসের ইতিহাস' গ্রন্থে তা বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন।

পূর্বসূত্র আলোচনায় একটু বলা প্রয়োজন যে চৈতন্যের আবির্ভাবের আদিপর্বেই ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্ম থেকে একটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। এই সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল একেবারে বাংলার দেশজ পরিমণ্ডলে এবং এই উৎপত্তির মূলে অনুঘটকরূপে ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনা এবং বৌদ্ধ সহজিয়া সহজিয়া অর্থে যারা সহজ স্বরূপের অনুসন্ধানে পরমেশ্বরের সন্ধান করেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের সাধনায় ডুব দিতে যাঁদের আর কোনো দ্বিতীয় বাঁকা পন্থা প্রয়োজন হয় না। তান্ত্রিক বৌদ্ধসাধনার মূল কথা হল দেহভাণ্ডের মধ্যে নিহিত থাকা শক্তির আরাধনা। সহজিয়াদের মতে প্রেমই হল পরমার্থ এবং সত্য। প্রেমের দ্বারাই জগতের অন্যসকল বস্তু হয়ে ওঠে সহজস্বরূপ। এবার, এই যোগচিন্তার সঙ্গে সংযোগ ঘটে সুফিবাদের অনিবার্য মরমী প্রভাব। এই সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আবহ শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে এক সুবৃহৎ আদর্শে পরিণত হল। তীব্র মরমী ভক্তিস্রোতে প্লাবিত হল সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ। এবং বাংলার সমাজ থেকে উঠে আসা যোগ-তান্ত্রিক সাধন প্রভাব এখানে আগত মুসলিম, সুফি ও অন্যান্য সহজিয়া গোষ্ঠীর কেউই গ্রহণ না করে থাকতে পারেনি। বরং সকলেই এই বিমিশ্রণকে আত্তীকরণ করে নিয়েছেন। মুসলিম সন্ত সাধকেরা পরম অনুশীলনে কায়া সাধনায় মন দিয়েছেন, হিন্দু সন্ত সাধকেরাও ইসলামি সুফিবাদকে সঞ্চারিত করেছে আপনার হৃদয়ে। আর এভাবেই আনুমানিক পঞ্চদশ শতক থেকে বাউল-ফকির সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 'বাউল' শব্দের যে অভিঘাত তাতে একটি সামগ্রিক লোকায়ত সম্প্রদায়ের পরিচিতিই আমাদের কাছে উঠে আসে। অর্থাৎ ফকিরবর্গকে তুচ্ছ করে নয় বরং পুরো বিষয়টিকে একতারার একটি তারে বাঁধতেই যেন বাউল শব্দের শক্তিশালী প্রয়োগ। যার প্রভাবে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় ধর্মীয় রাজনীতির অতি সূক্ষ্ম হাইফেন চিহ্ন (-)। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের (হোক তা হিন্দু অথবা ইসলাম) আচারসর্বস্ব, প্রাণহীন অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে দলে দলে যারা কেবলমাত্র বিভাজনের ঊর্ধ্বেই দল প্রতিষ্ঠা করেছে, তাঁদের পরিচয় দিতে এমন বিপরীত শব্দের বিভাজনের মাপকাঠিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া একান্তই কূটনৈতিক দুরভিসন্ধি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

তাই সেই একই অলস অভ্যাসে, অর্থাৎ বাউল-ফকির এই শব্দলগ্ন ব্যবহার না করে আমরা আমাদের এই প্রবন্ধে 'বাউল' শব্দেই আপামর লোকায়ত ভাবধারার দেহবাদী, গুরুমুখী সাধকদের চিহ্নিত করব এবং তাদের গানে, তাঁদের চর্চায় কেমন করে বস্তুবাদী এবং দেহবাদী চিন্তার প্রতর্ক জুড়ে রয়েছে তা আলোচনা করব। বহু প্রাচীন কাল ধরেই বস্তুবাদী দর্শনের বিষয়টি আমাদের সাহিত্যে প্রবাহিত রয়েছে। পরবর্তীকালের দার্শনিক, তাত্ত্বিকেরা যে প্রক্রিয়ায় বস্তু, আত্মা, দেহ কিংবা চেতন-অচেতনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ধারণ করেছেন, তা আমাদের প্রাচীন বস্তুবাদে ছিল না। বস্তুবাদকে মূলত দুইভাবে বর্গীকরণ করা যেতে পারে। এক, জগত সম্পর্কে মানুষের সাধারণ মতবাদ, যাকে বলা হয় সাধারণ বস্তুবাদ, এবং অন্যটি হল দার্শনিক বস্তুবাদ। এই দার্শনিক বস্তুবাদী মতাদর্শ অনুসারে, মহাবিশ্ব হল চিরন্তন। বিশ্বজগত হল বস্তু এবং চেতনা বস্তুর বিবর্তনে সৃষ্ট। আরও বলা হয়েছে যে চেতনা যেহেতু বিশ্বের সৃষ্টি, তাই বিশ্ব চেতনা অজ্ঞাত কোনো বিষয় নয়। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা বস্তুবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন—

> বস্তুজগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বিপরীত ক্রমে বস্তু জগতকে কোনো কল্পিত ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা না করে যারা বস্তু জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে; বস্তুজগতের উদ্ভবের কারণ বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত মনে করে এবং চৈতন্যকে বস্তু সত্তার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিচ্ছায়া মনে করে তারাই বস্তুবাদী...প্রাচীন বস্তুবাদের মধ্যে নানা ভ্রান্তি ছিল, ছিল নানা আঞ্চলিক গোষ্ঠী ও ভিন্নরুচি। কিন্তু বস্তুকে তারা সকলেই পরম বলে মেনেছিলেন। অনিবার্য ভাবেই বস্তুবাদ ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক স্বর্গাদি এবং ভাববাদী ধর্ম ও দর্শনাদি অস্বীকার করত।[১]

প্রাচ্যের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে চার্বাক অর্থাৎ লোকায়ত ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। চার্বাকের ধারণা হল মানবকেন্দ্রিক। আর মানবকেন্দ্রিক ধারণার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই জড়িয়ে আছে দেহবাদ। দক্ষিনারঞ্জন শাস্ত্রী গুপ্ত দেহবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে, তথা বাউল-ফকির, সহজিয়াদের মধ্যে ভারতীয় বস্তুবাদী আদর্শের প্রভাব স্পষ্ট করেছেন। প্রত্যক্ষ অনুভূতিময় জগতই লোকায়ত বস্তুবাদের আশ্রয়। যা ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিলক্ষিত, তাই হল সত্য। আর ঠিক এখান থেকেই দেহকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সাধনার সঙ্গে বস্তুবাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা তৈরি হয়। কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মতো প্রত্যক্ষ এবং নির্ভেজাল সত্য কিছুই নেই। যে তিনটি বিষয়কে ধরে মূলত চার্বাক পন্থাকে বিশ্লেষণ করা যায় তা হল—প্রত্যক্ষ প্রমাণ, দেহাত্মবাদ, ঐহিক ভোগসুখবাদ। আর এই তিনটি বিষয়ই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাউল-ফকিরের চর্যা ও চর্চায়। বাউল-ফকির মতাদর্শে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথাই স্বীকৃত হয়েছে। ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে নয়, তার অভ্যাস এবং যথাযথ চালনাতেই সিদ্ধিলাভের কথা বলা হয় এই মতে। দেহ গঠনে যে পঞ্চতত্ত্বের কথা জানা যায় তা উপনিষদ এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদে স্বীকৃত। চরক সংহিতায় যে দেহগঠনের প্রস্তাবগুলি ছিল তার সঙ্গে বাউল-ফকিরের দর্শনের মিল পাওয়া যায়।

তবে এখান থেকেই আমাদের গবেষণা প্রবন্ধের আলোচনার সূত্রপাত। যে বাউলরা ধর্মের শৃঙ্খল ভেঙে ভিন্নতর একটি লোকায়ত আদর্শে তাঁদের নিজস্ব মানবতাকে প্রচার করেন, তাঁরাই আবার আরশীনগরে এসে মনের মানুষের সন্ধান করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী বস্তুবাদী আদর্শের সঙ্গে এই দ্বন্দ্বে দেহতত্ত্বের পথে বাউল-ফকিরের চিন্তার বিরোধ। কারণ অনুমানসর্বস্ব চিন্তা থেকে যত দূরেই যাবার কথা তাত্ত্বিক প্রয়োজনে বলা হোক না কেন, অনুমান নির্ভরতা থেকে কখনওই সম্পূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়। দেহতত্ত্বের সাধনায় বিশ্বাস করা হয় দেহই জাগতিক-অজাগতিক সমস্ত শক্তির আধার। দেহই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসকেন্দ্র। তাই এই মতে বলা হয়, 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে'। তাঁরা আরও বলেন যে শরীরের বিভিন্ন নাড়ি, প্রকোষ্ঠ, রসগ্রন্থী, স্নায়ু, ধমনি প্রভৃতি মধ্যেই আছে ঈশ্বরলাভের রহস্য। তাই ঈশ্বরকে পেতে গেলে কোনো নামাজ বা পুজো নয়, প্রয়োজন সঠিক সাধনা। দেহভাণ্ডের নানান বর্ণবিভঙ্গে আছে নানান বিদ্যা আয়ত্তে আনার আয়োজন।

দেহতত্ত্বের গভীরে একটি সুবিশাল দর্শনশাস্ত্র উল্লিখিত রয়েছে। 'বাঙালির বিশিষ্টতা' প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি—

> দেহস্থ এই পুরুষ এবং প্রকৃতির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পুরুষ-প্রকৃতির পরিচয় পাইবে। ভাব ও রসের সাহায্যে ইহাদের পরিচয় পাইতে হয়। রস মনুষ্যদেহস্থ একাদশ প্রকারের আসক্তি হইতে নির্গলিত। ভাব জীবের মিলন-আকাঙ্ক্ষা হইতে উন্মেষ লাভ করিয়াছে। একটা অজ্ঞেয় তৃপ্তিই জীবত্বের লক্ষণ। কী-যেন নাই, কী-যেন হারাইয়াছি, কী-যেন পাইলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি—এই অতৃপ্তি ও লালসাই ভাবের জননী।[২]

অর্থাৎ যে মিস্টিক চেতনার সংজ্ঞায় এই অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল সেই মিস্টিক চেতনা দেহবাদকে পরিপুষ্টতা দেয়। একে অপরকে অঙ্গীকার করে। বাউলের দেহবাদী প্রস্তাব বিশ্বাস করে দেহের মূলাধারচক্রে অবস্থান করছে সর্পরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। শরীরের প্রাণশক্তিকে দৈনন্দিন সাধন অভ্যাসে ঊর্ধ্বরেতা করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করলেই সাধনার সিদ্ধিলাভ সম্ভব। মস্তিষ্কে, দুই ভুরুর মধ্যে আছে সেই ব্রহ্মশক্তি, পরমাত্মা। এই ব্রহ্মশক্তিকে আয়ত্ত করতে পারলে সাধক দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন। এই শক্তিকে ঊর্ধ্বরেতা মার্গে জাগাতে পারলেই সিদ্ধি লাভ সম্ভব। এবং এই সিদ্ধ বস্তু তথা আকাঙ্ক্ষিত মহাসুখকে তাঁরা 'মনের মানুষ', 'অধর চাঁদ', 'আলেখ সাঁই' প্রভৃতি নামে নামাঙ্কিত করে থাকেন। বস্তুবাদী আদর্শের ঠিক পাশাপাশি দেহবাদী মতামতকে রাখলে দেহবাদকে এক

প্রকার ভাববাদী প্রস্থান বলে মনে হতেই পারে। বস্তুবাদ বিষয়ে নব্য প্রবক্তাদের মতে, বস্তুবাদ এবং ভাববাদ পরস্পর বিরোধী দুটি প্রতর্ক। কিন্তু 'ভাব' শব্দটির প্রকৃত দ্যোতনা হিসেবে 'চেতনা' শব্দটিকে গ্রহণ করলে এই দ্বন্দ্ব এমন তীব্রতর হয় না। পরবর্তীতে মার্কীয় দর্শন অনুযায়ী আমরা বস্তুবাদের ভিন্ন সংজ্ঞা পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে, বস্তুজগৎ হল গতিশীল এবং সদা পরিবর্তনশীল। প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধ বর্তমান। প্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধের ফলে বস্তুজগতের পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে। তবে এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ধারণা পরিলক্ষিত হলেও বাউল-ফকিরের দর্শনের প্রেক্ষিতে মার্কীয় বস্তুবাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব হয় না। কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বলা হয়েছে, সর্বহারাদের নিজস্ব দেহ ব্যতিরেক আর কিছুই নেই। বিষয়টিকে সর্বহারা বাউল-ফকিরের দেহবাদী চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তা সম্পূর্ণ ভুল হয় না। দেহ ছাড়া এই মতে কোনোরূপ ভোগসামগ্রী উদযাপনের আদর্শ নেই। দেহবস্তুই হল তাঁদের তাদের সঞ্চয় করার মাত্র। কিন্তু জাগতিক কামনা-বাসনা হল বস্তুকে রক্ষা করার অন্তরায়। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা বলেছেন—

> সামন্ত সামাজিক স্তর বিভাজন ও ক্ষমতা শৃঙ্খলের ছায়া পড়েছে বাউল দেহতত্ত্বে। উপরের দেহাংশ স্বর্গমণ্ডলী। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গুরুত্বপূর্ণ দ্বারগুলি এখানে। সবার উপরে সহস্রারে, সুরক্ষিত স্থানে থাকেন সাঁই/গুরু। তনিম্নে আজ্ঞাচক্র থেকে আদেশ দেওয়া হয়, নিম্নাঙ্গগুলি তা পালন করে মাত্র। সাঁই দেহের একনায়ক।[৩]

পণ্ডিতদের অভিমত অনুসারে প্রাচীন বাউলগুরু হিসেবে মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বরপুরী, চৈতন্য, অদ্বৈতাচার্য, বীরভদ্র প্রমুখকে বাউল মতের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত মুহাম্মদ এনামুল হকের 'বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব'-এর উক্তির উপস্থাপনযোগ্য বিচার করতে গেলে দেখা যায়, ইহারা কেহই বাউল-মতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না; কেননা বাউল-মত বৌদ্ধ, খ্রীস্টান কি মুসলমান মতের ন্যায় এমন কোন একটি বাঁধাধরা মতবাদ নহে, যাহাকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার দেখিতে পাই, নদীয়ার হরিগুরু, বনচারী, সেবাকমলিনী ও অখিলচাঁদ নামক বাউল ফকীর চতুষ্টয়ই বাউল-মতের প্রতিষ্ঠাতা। তবে কি তাই ইহাও সত্য নহে। তবে ইহারা প্রাচীনতম বাউল-গুরু হইতে পারে।[৪]

বাউল কবিদের মধ্যে লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহ্, দুদ্দু শাহ্, হাউড়ে গোঁসাই, কাঙাল হরিনাথ, হাসন রাজা, শাহ্ আবদুল করিম, ভবা পাগলা প্রমুখ জ্ঞাত, অজ্ঞাত, স্বল্প পরিচিত অথবা অত্যন্ত জনপ্রিয় বহু পদকর্তা নিরলস রচনা করে গিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টিকর্ম। বাউল গানের এই অপার সৃষ্টি জগতের মধ্যে আপাততভাবে উদাহরণ হিসেবে লালন সাঁইয়ের একটি অতি পরিচিত পদের সামান্য অংশ এখানে উল্লেখ করা হল তার বস্তুবাদী ও দেহবাদী অর্থের ব্যবধানটুকু উল্লেখ করার জন্য—"আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা, মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা/তার ওপরে সদর কোঠা, আয়না-মহল তায়,/খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,/তারে ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম পাখির পায়।"[৫] আপাত বস্তুবাদী অর্থে এখানে একটি খাঁচা এবং তার প্রসঙ্গে একটি পাখির চলাচলের কথা বলা হয়েছে, পাশাপাশি খাঁচার সুসজ্জিত বর্ণনা ইত্যাদি বলা হয়েছে। কিন্তু দেহবাদী গূঢ় সাধনায় এর অর্থ ভিন্নতর। এখানে আট কুঠুরি মানুষের শরীরের আটটা প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ মাথার খুলি, ডান-বাম দুই ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, দুই কিডনি আর অন্ত্র। আর নয় দরজা মানুষের শরীরের নয়টা ছিদ্র। যথা—দুই চোখ, দুই নাকের ফুটো, মুখ, দুই কানের ফুটো, আর বাকি দুইটা জননাঙ্গ ও পায়ু। অচিন পাখি অর্থে সেই অলক্ষ্য পরমেশ্বর। আয়নামহল অর্থে চেতনা রূপ দর্পণ—

এখানে আরও একটি সুপরিচিত লোকসঙ্গীত উল্লেখ করা হল।পরের জায়গা পরের জমিন ঘর

বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, ঘরখানা যার জমিদারী, আমি পাইনা তাহার হুকুম জারি, আমি পাইনা জমিদারের দেখা মনের দুঃখ কারে কই?[৬]

আপাতভাবে মনে হতেই পারে এ এক কাঙাল পথিকের বেদন গান। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে গভীর মর্মার্থ। পরের জায়গা জমিতে বানানো ঘর হল এখানে নশ্বর দেহ এবং বাউল তাঁর সাধনায় যে পরমেশ্বরকে খুঁজে ফেরে, সেই অতীন্দ্রিয় সত্তাকেই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে 'জমিদার' বলে। আর এভাবেই এই গানে বস্তুতত্ত্বের সঙ্গে দেহতত্ত্বের মর্মকথার যুগলযোগের সন্ধান মেলে। বাউলের সমস্ত গানের মধ্যে আপাত সরল বস্তুবাদী স্বতঃস্ফূর্ত বক্তব্যের মধ্যে মিশে থাকে গভীর সাধনকথা। তাত্ত্বিকদের মতে সাধন কৌশল স্বীয় গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে তাঁদের এই কৌশল। কিন্তু এই একমাত্রিক প্রস্থানে এই সুবৃহৎ জীবনবেদকে আখ্যায়িত করা যায়না। তাঁদের গানের প্রহেলিকাময় উপস্থাপনরীতিটিই যেন লোকায়ত ধারায় বাউল গানের মৌলিক প্রত্যয় এবং স্বতন্ত্র সুর। আমাদের প্রসঙ্গ ছিল বাউলের গানে বস্তুবাদী ও দেহবাদী মর্মার্থের সমান্তরালতা। বাউলের গানগুলিতে এমন বিভিন্ন চিত্র প্রতীকের মাধ্যমে গূঢ় বক্তব্য আভাসিত হয়েছে। বাউল গানে এই ধরনের প্রতীকের দেহ সংক্রান্ত অর্থের প্রাধান্যই বেশি। কখনও নদী, কখনও পাখি, কুমির, ঘড়ি, আবার কখনও মাছ, চাঁদ, সংখ্যা ইত্যাদি নানান বস্তুবাদী চিত্র প্রতীকের আড়ালে তাঁরা ডুব দেন দেহবাদী কায়া সাধনার জগতে। চিত্রের মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশ আদিম গুহামানবের কালপর্ব থেকেই একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি এবং এই চর্চা প্রাচীন চর্যাপদের যুগ থেকেই সাহিত্যে বহমান।

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে আমরা মননশীল বাউলদের গানের মধ্যে ধর্মবর্জিত একটি বিশ্বচৈতন্যের বোধ বিষয়ে আলোচনা করলাম। বস্তুজগতের অনিবার্য জীবনমুখী ধারণার ইতিবাচক দিকটির পাশাপাশি ভাববাদ এবং বস্তুবাদের বিশিষ্ট প্রেক্ষিত কেমন করে এই গানের দোতারার দুই তারে আটকে আছে তাও আলোচনা করা হল। আমরা দেখলাম আপাত বিরোধী দুটি প্রতর্ক কেমন করে একই সঙ্গে সহাবস্থান করেছে এই গানে। জীবনের মধ্যে নানা সময়ে ঘটে চলা নানান দ্বন্দ্বের সমাবেশের মতোই সাহিত্যেও এমন বৈপরীত্যের ছাপ থেকে যায়। একদল সাধক-কবি-গায়েন, তাঁরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে সন্ধান প্রয়াস করে চলেছেন বিশ্বলোকের পথে। সন্ধান করতে গিয়ে তাঁদের জীবন থেকে বহুসময় বহুকিছু সংগৃহীত হয়ে উঠে আসবে করে এইই তো ধর্ম। সেই জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতার সংগ্রহ যে সর্বদা একমাত্রিক হবে তা কখনও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তাই এই বৈপরীত্য, এই দোলাচল, যুগপৎ বাউল জীবনেরই বৈপরীত্য।

উৎসের সন্ধানে

১. শক্তিনাথ ঝা : 'বস্তুবাদী বাউল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১০, পৃ. ৫০৫
২. পবিত্র সরকার সম্পাদিত : 'বঙ্গদর্পণ' প্রথম খণ্ড, সমাজ রূপান্তর সন্ধানী সহস্রাব্দ সমিতি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৪১
৩. উৎস-১, পৃ. ৩০৩
৪. মুহাম্মদ এনামুল হক : 'সূফী-প্রভাব', র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১২৭
৫. মোবারক হোসেন খান সম্পাদিত : 'লালন সমগ্র', গীতাঞ্জলি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২০৪
৬. Alim Abdul, JioSaavn, Vinodh Bhat, 2023, https:/www.jiosaavn.com/song/porer-jayga-porer-jomi/NjcqWT52UWw

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ

আকবর আলি শাহ

বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে মাগধী প্রাকৃতের ধারা মাগধী অপভ্রংশ থেকে। বাংলা ভাষার আদি মধ্যযুগ ধরা হয় ১৩৫০ সাল থেকে ১৬০০ সাল পর্যন্ত। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই সময়ের নিদর্শন। এর পরবর্তী সময় হল অন্ত্য মধ্যযুগ (১৮০০ সাল পর্যন্ত)। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে আমরা তৎকালীন সময়ে বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্মতত্ত্ব থেকে ধর্মের পাশাপাশি সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষদের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তাঁতি থেকে ধুনুরীর, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়, বণিকদের শিকার যাত্রা কিংবা দাবা খেলা আবার ডোম নারীর নৃত্যের কথা যেমন জানা যায় তেমনি ব্রাহ্মণদের প্রতি বৌদ্ধ কবিদের ঘৃণার প্রকাশও দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্য : মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি বাঙালি না হয়েও বাংলা অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন (মিথিলার মধুবনী পরগনার বিসফি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন)। এই সময় (চৈতন্য-পূর্ব যুগে) বাংলার আরও দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়—অনুবাদ এবং মঙ্গালকাব্যের ধারা।

উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা সাহিত্যের সান্নিধ্যে এলে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিশব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়। অন্য ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দও গ্রহণ করা যায়। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমাদের। নতুন বিকাশমান ভাষার পক্ষে অনুবাদ 'আত্মোন্নতি সাধনের এক অপরিহার্য পন্থা'। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। এর ফলে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনুবাদমূলক সাহিত্যসৃষ্টিকে ভিত্তি করেই মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়। এই ধরনের রচনা সাহিত্যকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ উল্লেখযোগ্য, যেখানে তিনি রামকে ভক্ত হিসেবে এবং সীতাকে সাধারণ বধূ হিসেবে দেখিয়েছেন। কৃত্তিবাস

অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা বাল্মীকি রামায়ণে দেখতে পাওয়া যায়নি। কৃত্তিবাস-পরবর্তী সময়ে বিশেষত ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরও কয়েকজন রামায়ণের অনুবাদকের নাম পাওয়া গেছে, যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—অদ্ভুত আচার্য কবিচন্দ্র এবং জগৎরাম। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন (গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান এবং পরাগলের ছেলে ছুটি খানের নির্দেশে)। এ থেকে বোঝা যায় এই সময় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ছিল না।

মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে। প্রসঙ্গত বলা যায়, সংস্কৃত ভাষাকে 'দেবভাষা' করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। অনুবাদকেরা এই সব অনুবাদের মাধ্যমে নিজস্ব ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তোলার এই প্রয়াসে মুসলমান শাসকগোষ্ঠী যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের বিকাশ : খ্রিস্টীয় পনের শতকের শেষভাগ থেকে আঠারো শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেবদেবীদের লীলামাহাত্ম্য, পূজাপ্রচার ও ভক্তকাহিনি অবলম্বনে রচিত সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী আখ্যানমূলক কাব্য হল মঙ্গলকাব্য। প্রসঙ্গত বলা হয়ে থাকে, যে কাব্যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্যকীর্তন করা হয়ে থাকে, যে কাব্য শ্রবণেও মঙ্গল হয় এবং বিপরীতে হয় অমঙ্গল—তাকেই বলা হয় মঙ্গলকাব্য। এই কাব্যের কাহিনি শ্রবণ করলে সর্ববিধ অকল্যাণ নাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল ঘটে। মঙ্গলকাব্য প্রধানত কাহিনিকেন্দ্রিক। মূল কাহিনির সঙ্গে দেবলীলা, ধর্মতত্ত্ব ও নানা ধরনের বর্ণনায় এইসব কাব্য বিপুলায়তন লাভ করেছে। ষোড়শ শতকের পরবর্তী কাব্যগুলোতে বিষয়বস্তুগত কোনো অভিনবত্ব নেই, কেবলমাত্র চরিত্রগুলোকে মার্জিত রসরূপ দান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলোকে শ্রেণিগত দিক দিয়ে পৌরাণিক ও লৌকিক—দু'ভাগে ভাগ করা যায়। পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলি হল—গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি লৌকিক শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি।

এই সময়কালে ব্রতকথা ও পাঁচালি থেকে বেরিয়ে এসে মঙ্গলকাব্যগুলি লিখিত রূপ নিতে থাকে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গ এই সময়ে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির বিষয়কে তুলে ধরে। এই সময়কার লৌকিক দেব-দেবী নিজেদের পূজার্চনার জন্যে মানুষের সাহায্য নিচ্ছেন, আর একাজে ব্যর্থ হলে মানুষের ওপর অত্যাচার করতেও পিছপা হচ্ছেন না। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, শিব প্রমুখ এই গোষ্ঠীয় অন্তর্ভুক্ত।

মঙ্গলকাব্যে সামাজিক চিত্রায়ণ : মঙ্গলকাব্যগুলি একদিকে যেমন বহু যুগ আগেকার স্মৃতি বহন করছে তেমনি অন্যদিকে সমকালীন চিত্রও তুলে ধরেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাণিজ্যক কার্যকলাপের উল্লেখ থাকলেও উল্লেখযোগ্যভাবে তাম্রলিপ্ত বন্দর কিংবা দক্ষিণ— পূর্ব এশিয়ার কোনো বন্দরের উল্লেখ নেই। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে মুকুন্দরামের কাব্যে দেখা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকরা বাংলায় আসছেন। চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকটি চৈতন্য জীবনকাব্য রচিত হয়, যেখানে চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলে দেখানো হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের

চৈতন্যভাগবত লেখনীর সময়কাল ১৫৫০ সালের পূর্ববর্তী সময়ে। এই সময়কার রচনা লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গাল' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গাল'। এগুলি থেকে নবদ্বীপের চিত্র পাওয়া যায় (ষষ্ঠ শতাব্দী)। এই সময়ের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল—কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৬০০ তার পরবর্তী সময়ে লেখা)। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবি গোবিন্দদাস দাসীভাবে উপাসনা পদ্ধতি শুরু করেন। ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গাল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুঘল শাসন ব্যবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমিতে এক জমিদারের বাড়িতে আশ্রয় নেন। তাঁর লেখা থেকে তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় তাঁর 'অন্নদামঙ্গাল'কাব্য রচনা করেন। দেবী অন্নদা অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষুধিত, অন্নহারা, বিপন্ন মানুষের মুখে অন্নের সংস্থান করে দেন। তিনি প্রথাগত মঙ্গাল দেব-দেবীর মতো সন্ত্রাসের পথে নয়, সন্তানের মতো ভক্তকে দেখেছেন এবং তার সংকট থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছেন। ফলে এই দেবী হয়ে উঠেছেন যথার্থেই অন্নদাত্রী অন্নদা।

সপ্তদশ শতকে কেতকদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গাল কাব্য লেখেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু পাল ও বংশীবদন চক্রবর্তী কাব্য রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র মনসামঙ্গাল লেখেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ময়ূরভট্ট ছিলেন ধর্মমঙ্গালের আদি কবি। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রূপরাম চক্রবর্তী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঘনরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্য লেখেন। এই কাব্যের নায়ক লাউসেন গৌড়রাজ কর্ণসেনের ছেলে। তাঁর রাজধানী ছিল ময়নাগড়ে (মেদিনীপুর কিংবা বাঁকুড়া জেলা)। ধর্মমঙ্গালের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যে আর্থ-সমাজ-রাজনীতি-সাংস্কৃতিক জীবনের সামূহিক চিত্র পাওয়া যায়।

শিবমঙ্গাল কাব্যের প্রধান কবি হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। তিনি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল পরগনার যদুপুর গ্রামে থাকতেন। সেখানকার জমিদার শোভা সিংহের ভাই হেমন্ত সিংহ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁকে তাঁর গ্রাম থেকে বিতাড়িত করলে তিনি কর্ণগড়ের জমিদারের কাছে আশ্রয় নেন। এখানে শিব ভূমিহীন কৃষক; যিনি ইন্দ্রের কাছ থেকে জমি ও কুবেরের কাছ থেকে ধান নিয়ে চাষ করেন। ফসল বিক্রি করলে রাজা নিয়ে নেয়, ফলে কৃষকের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। এই শিব লৌকিক দেবতা। ভূমিহীন কৃষকের জীবন্ত চিত্র এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। মঙ্গালকাব্যে আরও কয়েকটি শাখা আছে, যাদের মধ্যে অন্যতম 'কালিকামঙ্গাল', 'শীতলামঙ্গাল', 'ষষ্ঠীমঙ্গাল' ইত্যাদি।

কাশীরাম দাস নিজে মহাভারত সম্পূর্ণ অনুবাদ করেননি। তাঁর ভাইপো নন্দরাম বেশিরভাগ অনুবাদ করেছেন। কোচবিহারের রাজসভাতেও এইসময় মহাভারতের বাংলা অনুবাদ শুরু হয়েছিল। চৈতন্যোত্তর যুগে চৈতন্যের প্রভাবে বহু কৃষ্ণলীলা রচিত হয়, যার মধ্যে কৃষ্ণমঙ্গালও আছে। অষ্টাদশ শতকে বহু পদাবলীও লেখা হয়েছিল। হিন্দু কবিরা প্রধানত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে লিখেছেন আর মুসলমান কবিরা রোমান্টিক কাহিনি রচনা করেছেন।

মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান : গিয়াসুদ্দিন আজমশাহর সময়কালে শাহ মহম্মদ সগীর 'ইউসুফ জুলেখা' লেখেন। প্রায় সমসাময়িক জৈনুদ্দীন 'রসুল চিজয়' কাব্য লেখেন। তিনি গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি ছিলেন। চাঁদ কাজি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ'র সময়ে

নবদ্বীপের কাজি ছিলেন। তিনি কয়েকটি পদ রচনা করেন। সুলতান নসরৎ শাহ'র রাজত্বকালে শেখ কবীরও কতগুলি পদ রচনা করেন। শেখ ফয়জুল্লার পাঁচটি বই পাওয়া গেছে, যার মধ্যে অন্যতম হল 'গোরক্ষবিজয়'। সংগীতের ওপর লেখা 'রাগনামা' এবং 'সত্যপীর' অন্যতম। দৌলত উজির বহরাম খান লেখেন 'লায়লী মজনু'। কবি মুহম্মদ কবীর লেখেন 'মধুমালতী' নামে একটি গ্রন্থ। মুসলিম কবিদের লেখায় সমাজ অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাঁদের লেখায় নায়ক-নায়িকা হয়েছেন হিন্দু নামের। তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্র এবং সংগীত চর্চাকেও বাদ দেননি। প্রসঙ্গত বলা যায়, চৈতন্যর আবির্ভাবের পর বেশ কয়েকজন মুসলমান কবি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। মুসলমান কবিদের বিজয়কাব্য প্রধানত ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। শেখ ফয়জুল্লা সংস্কৃত সাহিত্যে দেব-দেবীর চরণ বন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু করেন যা বাংলা সাহিত্যেও অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুলতানী আমলে সুলতান এবং তাদের আমলারা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। বাংলার প্রত্যন্ত এলাকার জমিদাররা দরবারে বাংলা ভাষায় কাজকর্ম চালিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য ধর্মাশ্রয়ী হলেও সেই সাহিত্য ছিল মানবমুখী। দেবতা নয়, মানুষের কথাই সেখানে বড়ো হয়েছে। আরাকানে বাঙালি মুসলমান কবিরা দেবতাদের প্রায় বাদ দিয়ে প্রেমকথার সূত্রপাত করেছিলেন।

সাহিত্যে চৈতন্য ভাবধারার বিকাশ : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে জীবনীমূলক সাহিত্য। এই ধারার সূত্রপাত চৈতন্যদেব এবং তাঁর কয়েকজন শিষ্যের জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে। চৈতন্যদেবের শিষ্যরা ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনি আলোচনা করতেন। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। অবশ্য মধ্যযুগের জীবনী সাহিত্য আধুনিক জীবিনীমূলক গ্রন্থের মতো নয়। যে সকল মানুষের কর্ম ও আদর্শ বহু মানুষকে প্রভাবিত করে, তাঁদের আত্মজীবনী রচিত হয়। এরা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। এদের মহিমা অপরকে প্রভাবিত করে। ভক্ত কিংবা শিষ্যরা যখন এদের আত্মজীবনী লেখেন তখন রক্তমাংসের এই গুণীজনদের দোষগুলো পরিত্যাজ্য হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সময়কালের জীবনীগ্রন্থ অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ভক্তিনিষ্ঠার পরিবর্তে মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। চৈতন্যজীবনী সাহিত্য ধর্মীয় বিষয় অবলম্বন করে রচিত। চৈতন্যভক্তরা চৈতন্যকে মানুষরূপী ভগবান হিসেবে তুলে ধরেছেন। ফলে জীবনীগ্রন্থ হয়ে উঠেছে দেব অবতারের মঙ্গালপাঁচালি। তবে এই গ্রন্থগুলি সামাজিক ইতিহাস জানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চৈতন্য জীবনীকাহিনিতে অলৌকিকতার আশ্রয় নেওয়া হলেও বাস্তব কাহিনি নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে প্রথম। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক গল্প, দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনি ও রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনি থেকে বাস্তব মানুষের জীবনকাহিনিতে উত্তরণ ঘটে।

মর্সিয়া সাহিত্য : মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে 'মর্সিয়া সাহিত্য' নামে এক ধরনের শোক কাব্য বিস্তৃতভাবে অবস্থান করছে। শোক বিষয়ক ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্যের প্রাচীন প্রচলিত একটি রীতি। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্যের প্রচলনের পেছনে পারস্যের বণিক, দরবেশ পণ্ডিত, কবি প্রমুখের অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। এই সব কাব্য যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে চরম বিয়োগান্তক রূপ লাভ করেছে; যা 'জঙ্গানামা' নামেও পরিচিত। কারবালার বিষাদময় কাহিনিতে

যুদ্ধের ঘটনা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি পেয়েছে শোকের অনুভূতি। মহরম মাসে পল্লিবাংলায় মুসলমানদের মন বেদনাকরুণ পুথিপাঠের আসর বসতো আর কবিরা কারবালার করুণ কাহিনি নিয়ে 'শহীদে কারবালা', 'জঙ্গনামা', 'হানিফার লড়াই' ইত্যাদি কাব্য লেখেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাংলায় মুসলিম সমাজের কাছে এটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। তৎকালীন শিয়া শাসকেরা কবিদের উৎসাহ দিতেন। রসুলের নাতি বলেই মুসলিম মাত্র হাসান -হোসেনের সমর্থক হয়ে ওঠে এবং মুয়াবিয়া-এজিদের নিন্দুক হয়ে ওঠে। পরাজিত পক্ষের সমর্থক হওয়ার কারণে নায়ক বিজয় গৌরবহীন এবং তার প্রধান রস করুণরসে পরিণত। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাদের বিজয় অভিযানের বীরত্ব ব্যঞ্জক কাহিনিও এই শ্রেণির কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'জঙ্গনামা' নামে বাংলা সাহিত্যে এধরনের কাব্য রচিত হয়েছে।

মূল পর্যবেক্ষণ : অতএব আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য গভীরভাবে বিপর্যস্ত ছিল। সংস্কৃত ভাষার কাছে বাংলা ভাষা অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। অতএব চৈতন্যযুগে বাংলায় প্রচুর কাজ করা হয়েছিল। ১৫০০ খ্রি. পরবর্তী সময়ে চৈতন্যদেবের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্য নতুন গতি পেয়েছিল। আর এক্ষেত্রে সর্বতো ভাবে সাহায্য পেয়েছিল বাংলার আঞ্চলিক শাসকদের কাছ থেকে।

তথ্যের সন্ধানে

১. Mohammad Mohan Ali : 'History of the Muslims of Bengal' (Vol. I)
২. Satish Chandra : 'History of Medieval India'
৩. Suniti Kumar Chatterjee : 'The Origin and Development of Bengali Language' (Vol. I)
৪. Jadunath Sarkar : 'A History of Bengal, Muslim Period' (Vol. II)
৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (মধ্যযুগ)
৬. আব্দুল করিম : 'বাংলার ইতিহাস' (সুলতানী শাসন)
৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস'
৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ)
৯. সেন ও মজুমদার : 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী'
১০. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'
১১. এনামুল হক : 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'
১২. https://bn.m.wikipediaƒorg

বাংলা সাহিত্যচর্চা : বহুমাত্রিক চেতনায় অনুবাদ সাহিত্য

শিপ্রা ভট্টাচার্য

সৃষ্টির প্রাচীন লগ্ন থেকেই মানব জীবন বিচিত্র বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সৃষ্টিশীল মানুষ কেবল জীবন-যাপনের উপরেই নির্ভর করে থাকেনি, মননের চর্চাও করেছে। সভ্যতার প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিভিন্ন বিস্ময় রয়েছে। নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে পরিপুষ্ট করেছে সময়ের চক্রে। মানব মনের যথার্থ বিকাশ ঘটে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। বর্তমান যুগে সবাই প্রায় সংস্কৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচিত। একটি দেশের পরিচয় মেলে সেই দেশের আবহমানকালের সংস্কৃতি দিয়ে। বাঙালি হিসেবে আমাদেরও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। আমাদের দীর্ঘ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য—এই সমস্ত কিছু দ্বারা ঐতিহ্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু কিছু আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আবার সংস্কৃতিরও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর ঘটেছে। সাহিত্য ও শিল্প উভয়ই মানবজীবন থেকে উদ্ভূত এই ধারণার প্রচলন প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে।

আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা সূত্রপাত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের অধিক পুরনো। এই ইতিহাসের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য ও ইংরেজি সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের প্রভাব এসেছে ইংরেজি সাহিত্য থেকে। বাংলা সাহিত্যে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে, ঠিক একই ভাবে আরবি, ফারসি সাহিত্য প্রভাব আছে। বাঙালির জীবনধারা বহু খাতে প্রবাহিত হয়েছে। যুগে যুগে এদেশে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি ক্রম বিবর্তিত হয়েছে। জীবনের মূল ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি বহু বিষয়ের প্রভাবেই বিবর্তন ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগের ক্ষেত্রেও এই সময়ের বৈচিত্র্য কাজ করেছে। বাংলা ভাষার উদ্ভব নিয়ে তাই বহু বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু সবাই প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকে স্বীকার করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সাধারণভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—১. প্রাচীন যুগ, ২. মধ্যযুগ, ৩. আধুনিক যুগ। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ-দোঁহা সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্য প্রধান। মঙ্গালকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, পির সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, বাউল এবং ইসলামি ধর্ম সাহিত্য ছিল সাহিত্যের প্রধান বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের যুগে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন যুগের সূচনা হয়—

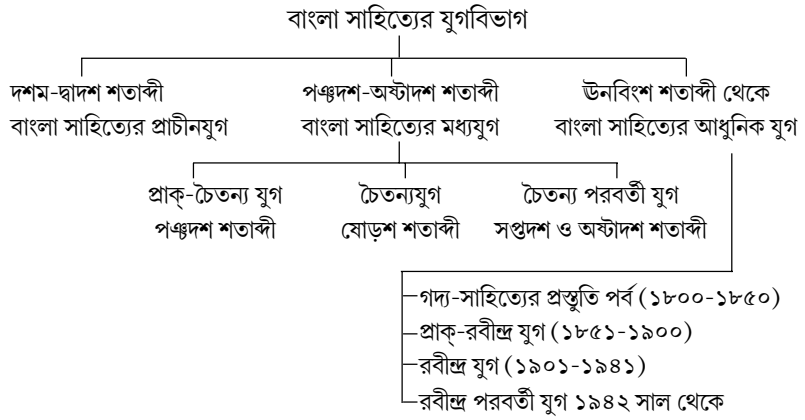

পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে কালের সঙ্গে জীবনের রং-রূপের বহু পরিবর্তন ঘটে। মানুষ তার এই পরিবর্তনশীল চিন্তা-চেতনাকে চিহ্নিত করে রাখে কালের পৃষ্ঠায়। পরবর্তীকালে মানুষ এর থেকেই সংগ্রহ করে রূপ ও রস। সাহিত্যের একটি বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষা থেকে মধ্যযুগে যেসব কাব্য অনূদিত হয়েছে তার সংখ্যা কম নয়। মধ্যযুগের অনুবাদের ধারাকে ভাষার দিক থেকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—সংস্কৃত ভাষা, আরবি ফারসি ভাষা ও হিন্দি ভাষা।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্যের শুরু হয় তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে। রাজ্যে রাজা বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজন হয়। তুর্কি আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য রাজনীতিতে একাধিক বদল লক্ষ করা যায়। বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসলমানদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বিকাশের সূত্রপাত হয় সুলতানি আমলে। বাংলা সাহিত্যে ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে রোমান্টিক ধারার এক নতুন পর্যায় সৃষ্টি হয় তুর্কি আক্রমণের পর। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু রচিত বাংলা সাহিত্য ছিল প্রধানত দেবদেবী প্রধান। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ যুগে মুসলমান কবিরা হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতির সমন্বয়ের জন্য রচনা করেছেন চৌতিশা, জ্যোতিষ ও সংগীতশাস্ত্রীয় একাধিক কাব্য। তাঁদের রচিত কাব্যকে প্রধানত ৫ ভাগে ভাগ করা যায়—সংস্কৃতি বিষয়ক কাব্য, শোকগাথা, সংগীত শাস্ত্রীয় কাব্য, কাহিনি কাব্য ও ধর্মীয় কাব্য।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম সাহেবের আমলে রচিত 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্যের রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সাগীর হলেন মুসলমান সাহিত্যের কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম। কাব্যটি ফরাসি কবি ফেরদৌসের

'ইউসুফ ওয়া জুলায়খা' গ্রন্থের ভাবানুবাদ। ফরাসি কবি জামির 'লাইলী-মজনু' কাব্য অবলম্বনে দৌলত উজির বাহারাম খাঁ 'লাইলী মজনু' কাব্য রচনা করেন।

আলাওলের পদ্মাবতী হিন্দি ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত কাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য। মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্য থেকে পদ্মাবতী অনুবাদ করা হলেও কাব্যটিতে আলাওলের স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব সত্যিই অনস্বীকার্য। কবি মনসুর-এর 'মধুমালতী' কাব্য অবলম্বনে মুহাম্মদ কবীর 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেছেন। এই কাহিনির উৎস ভারতীয় উপাখ্যান। কাব্যটিতে গভীর প্রেম ও সংযমবোধের পরিচয় রয়েছে। মিয়া সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' রচনা করেন। কাব্যটির শেষ অংশ অনুবাদ করেন আলাওল। মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ধর্মীয় পশ্চাৎপদ থেকে মুক্ত করে মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। ফলে অনুবাদ সাহিত্যে মানুষের প্রাধান্য বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারা সৃষ্টিতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান তিনটি নিদর্শন হলো—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত। অনেকের মতে, বাংলায় ইসলামি শাসন শুরু হলে সুলতান সভা কবিদের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতে চাইলে সভাকবিরা অনুবাদ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। মালাধর বসুকে তাই ভাগবত অনুবাদের জন্য বরবকশাহ গুণরাজ খান উপাধি দেন। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ। এই গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশের বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। নিম্নে বর্ণিত ছকের (ছক নং — ১) সাহায্যে রামায়ণের কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও সেইসব অনুবাদকদের কাব্যের নাম দেওয়া হল।

ছক নং—১

শতাব্দী/সময়/খ্রিস্টাব্দ	**কবির নাম**	**কাব্যের নাম**
পঞ্চদশ শতাব্দী (১৫০০-১৬০০ সাল)	কৃত্তিবাস ওঝা	শ্রীরাম পাঁচালী
	মাধব কন্দলি	শ্রীরাম পাঁচালী
ষোড়শ শতাব্দী (১৬০০-১৭০০ সাল)	শঙ্কর দেব	শ্রীরাম পাঁচালী (উত্তর কাণ্ড)
সপ্তদশ শতাব্দী (১৭০০-১৮০০ সাল)	নিত্যানন্দ আচার্য	অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ
	রামশঙ্কর দত্ত	রাম কথা
	চন্দ্রাবতী	রামায়ণ
অষ্টাদশ শতাব্দী (১৮০০-১৯০০ সাল)	রামচন্দ্র	বিভীষণের রায়বার
	কাশীরাম	কালনেমির রায়বার
	জগন্নাথ দাস	লঙ্কাকাণ্ড
	উৎসবানন্দ	সীতার বনবাস

প্রথম বাংলা মহাভারতের অনুবাদ হচ্ছে কবীন্দ্র মহাভারত। লস্কর পরাগল খাঁর নির্দেশে রচিত হয়েছে বলে একে অনেকে পরাগলী মহাভারতও বলে। কবীন্দ্রের মহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব সংক্ষিপ্ত ছিল বলে ছুটি খানের নির্দেশে শ্রীকর নন্দী 'জৈমিনিসংহিতা'র অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বন করে সেটাকে বিস্তৃত আকার দেয়। নিম্নে বর্ণিত ছকের (ছক নং—২) সাহায্যে মহাভারতের কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও সেইসব অনুবাদকদের কাব্যের নাম দেওয়া হল।

ছক নং—২

শতাব্দী/সময়/খ্রিস্টাব্দ	কবির নাম	কাব্যের নাম
ষোড়শ শতাব্দী (১৬০০-১৭০০ সাল)	কবিন্দ্র পরমেশ্বর	পাণ্ডব বিজয়
	শ্রীকর নন্দী	অশ্বমেধ কথা
সপ্তদশ শতাব্দী (১৭০০-১৮০০ সাল)	রামচন্দ্র খান	অশ্বমেধ পর্ব
	কাশীরাম দাস	মহাভারত
অষ্টাদশ শতাব্দী (১৮০০-১৯০০ সাল)	নিত্যানন্দ ঘোষ	মহাভারত
	দুর্লভ সিংহ	ভারত পাঁচালী
	পুরুষোত্তম দাস	পাণ্ডব পাঁচালী

সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সাধারণভাবে ভাগবত নামে পরিচিত। এর বিষয়বস্তু হলো শ্রীকৃষ্ণের জীবন কথা। বাংলায় ভাগবত চর্চার শুরু হয় চৈতন্য-পূর্ব যুগে। তবে এর বিস্তার ঘটে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে। সংস্কৃত ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে বাংলায় প্রথম কাব্য রচনা করেন বর্ধমান জেলার কবি মালাধর বসু। নিম্নে বর্ণিত ছকের (ছক নং—৩) সাহায্যে ভাগবতের কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও সেইসব অনুবাদকদের কাব্যের নাম দেওয়া হল।

ছক নং—৩

শতাব্দী/সময়/খ্রিস্টাব্দ	কবির নাম	কাব্যের নাম
পঞ্চদশ শতাব্দী (১৫০০-১৬০০ সাল)	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়
ষোড়শ শতাব্দী (১৬০০-১৭০০ সাল)	গোবিন্দ আচার্য	কৃষ্ণমঙ্গাল
সপ্তদশ শতাব্দী (১৭০০-১৮০০ সাল)	দ্বিজ মাধব	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গাল
	যশশ্চন্দ্র	গোবিন্দ বিলাস
অষ্টাদশ শতাব্দী (১৮০০-১৯০০ সাল)	অভিরাম দাস	কৃষ্ণমঙ্গাল
	ঘনশ্যাম দাস	শ্রীকৃষ্ণ বিলাস

এরপর বাংলায় ২০০ বছর ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। ইংরেজি সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক বাংলায় অনুবাদের প্রবণতা বেড়েছে। বর্তমানে অনুবাদ সাহিত্যের ধারা বিশেষভাবে সচল সাহিত্য অঙ্গনে। এইভাবে অনুবাদচর্চার মাধ্যমে যেমন সাহিত্যের প্রসার বেড়েছে তেমনি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি, জীবনধারা সম্পর্কেও পরস্পর অবগত হচ্ছে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ
২. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
৩. মুনমুন চট্টোপাধ্যায় : 'ময়মনসিংহ গীতিকা পুনর্বিচার', পুস্তক বিপণী
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গাল কাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি.

বাঙালি-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একটি পর্যালোচনা

মকর মুর্মূ

অবস্থানগত দিক থেকে পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতের স্থান সৌন্দর্যময়। অর্থাৎ 'সারে যাঁহা সে আচ্ছা'। সবচেয়ে সুন্দর। বৈচিত্র্যমণ্ডিত। আমরা যদি ভারতবর্ষকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে ভাগ করি, তাহলে পূর্বভারতের অন্যতম রাজ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গ, ঊড়িষ্যা, বিহার ও ঝাড়খণ্ড। পড়শি দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান।

আমাদের মূল আলোচনার বিষয় যদিও বাঙালি ও আদিবাসী। তবুও প্রাসঙ্গিকি কিছু বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা উচিৎ বলেই মনে হয়। আভিধানগত দিক থেকে 'বাঙালি' বলতে 'বঙ্গদেশের বাংলাভাষী অধিবাসী'। 'বঙ্গ' থেকে বঙ্গাল/বাঙ্গালা থেকে বাঙাল (বাংলায় বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী মানুষ)। 'বাঙালি' শব্দের মূলে রয়েছে 'বঙ্গ' এবং 'আর্য' তথা হিন্দুদের আদিগ্রন্থ 'ঋগ্বেদ'-এ শব্দটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। 'বঙ্গ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ। অনুমান নাম বাচক 'বঙ্গ' শব্দ অস্ট্রিক ভাষাবংশের কাছ থেকে এসেছে। কারণ সাঁওতাল জাতি মনে করে ধারতিতে 'বঙ্গ'হীন স্থান নেই। প্রসঙ্গত প্রবোধকুমার ভৌমিক লিখেছেন—

> পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী গোষ্ঠী ও তাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এমনিতেই বর্ণাঢ্য। 'বঙ্গ' এই শব্দের উদ্ভব খুব সম্ভবত অস্ট্রিক 'বোঙ্গা' শব্দ থেকে, যা বর্তমানের 'সাঁওতাল' বা 'মুণ্ডারী' গোষ্ঠীর লোকের কাছে 'পবিত্র' বা 'দেব' স্পর্শী। এখনও পশ্চিমবঙ্গের স্থান নামের বিচার বিশ্লেষণে এই আদিবাসী প্রভাব স্বীকৃত হয়। 'দা' অর্থে সাঁওতালী ভাষায় জল। তাহলে শিয়ালদা, মালদা, খড়দা ইত্যাদির মাধ্যমে একদা আদিবাসী জন-স্মৃতির স্পর্শ সহজেই অনুমেয়। আমরা কেবল ভাষা নয়, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও বর্তমানের বৃহত্তর বঙ্গজীবনে এই আদিবাসী প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করতে পারি।[১]

'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ 'বঙ্গ' শব্দের সন্ধান পাওয়া গেলেও 'বাঙালি'র জন্ম খুব বেশি দিনের নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষা জন্মের সাথে সাথেই বাঙালির জন্ম। তাও প্রায় হাজার বছর। এই দীর্ঘ চলার পথে আর্য তথা বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি নানান ঘাত প্রতি ঘাতের মধ্যে চলেছে। এই চলার পথে অনেক ক্ষেত্রেই বাঙালিকে আপোষ করতেও হয়েছে। ভারতের অন্যন্য প্রদেশের আর্যদের সাথে বাঙালি আর্যদের সমাজ সাংস্কৃতিক পার্থক্য সেই দিকেরই ইঙ্গিত। এমন কি আর্যদের দুর্বলতা প্রসঙ্গে অতুল সুর লিখেছেন—

> আর্যরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁরা তাঁদের সঙ্গে খুব কমসংখ্যক মেয়েছেলে নিয়ে এসেছেলেন। তাঁদের মধ্যে মেয়েছেলের অভাব বিশেষভাবেই ছিল। এদেশে আসার পর তাঁরা এদেশের অধিবাসীদের খুব ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, গোড়ার দিকে তাঁরা এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কোনরূপ বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করেননি। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁরা এদেশের মেয়েদের বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[২]

ভারতবর্ষ তথা বাঙালির সমাজ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দিকে অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে যে এক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংস্কৃতির জন্মদাত্রী যেমন নারী। তেমনি রক্ষক বাহকও। 'বিয়া ঘরে মিঞা রাজা' গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত এই প্রবাদেও এই বিশেষ দিকের প্রতিই ইঙ্গিত করে। ফলে বাড়ির অন্দর মহলের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীই শেষকথা। এবং পুরুষ এ বিষয়ে নিতান্তই আজ্ঞাবাহক মাত্র। একথার সত্যতা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালেই পরিষ্কার ধড়া পড়ে। আবার বাঙালি তথা বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ থেকে মধ্যযুগের রচনা মঙ্গালকাব্যেও আদিবাসী তথা সাঁওতালি সমাজ জীবনের কথা চিত্রিত হয়েছে।

যাইহোক একথা স্পষ্ট যে সাঁওতাল জাতির সাথে বাঙালির গভীর সম্পর্ক বাঙালির জন্মলগ্ন থেকে। তারপর সময় যত এগিয়েছে বাঙালি জাতি নিজেকে, সমাজকে, সংস্কৃতিকে এক পরিপূর্ণরূপে মর্যাদার আসনে স্থাপন করেছে। প্রসঙ্গত বাঙলা ও বাঙালির নৃতাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে লিখেছেন—

> নরতত্ত্বের দিক হইতে বাঙলার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস আদি-অস্ট্রেলীয় বা 'কোলিড দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নতনাস মিশর-এশীয় বা 'মেলানিড এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন বা 'পূর্ব ব্র্যাকিড', এই তিন জন-এর সমন্বয়ে গঠিত। নিগ্রোবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্ত তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরে এবং সংকীর্ণগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গালীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্ব দিকে সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি-নর্ডিক বা খাঁটি 'ইণ্ডিড' রক্ত প্রবাহও অনস্বীকার্য, সে ধারা অত্যন্ত শীর্ণ ও ক্ষীণ। মোটামুটিভাবে ইহাই বাঙলা ভাষাভাষী জন-সৌধের চেহারা, এবং এই জন সৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র জন লইয়াই বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত।[৩]

সমালোচক বাঙালির মিশ্রণে নিম্নস্তরে কথাকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পৌরাণিক কাল হয়ে প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উচ্চস্তরে সাথে নিম্নস্তরের মিশ্রণের কথাও বেশ পাওয়া যায়। আর দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙালি তার অতীত ঐতিহ্যের ঋণকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, ভুলে যেতে চেয়েছে। না হলে সুদীর্ঘ সময়ের বহমানতায় আধুনিক বাংলায় আদিবাসীকে আলিঙ্গান করতে এত দ্বিধা বোধ করে কেন এটাও ভাবার বিষয়। এজন্যই বোধহয় আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে এক ধরেনের অন্তর্মুখীনতা কাজ করে। কিন্তু আর সে বিশুদ্ধতা বা অন্তর্মুখীনতা আর রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। সেটা আধুনিক আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের দিকে তাকালেই প্রমাণ মিলবে।

পূর্বভারতের অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী জাতির বসবাস। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রচলিত ভাষা যেহেতু বাংলা, তাই নিজস্ব ভাষার সাথে সাথে প্রায় সবাই বাংলা ভাষাতেও পারদর্শী। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের বসবাস থাকলেও বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যাই সর্বাধিক। তার পরেই আসে সাঁওতালি ভাষা। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে সাঁওতালি ভাষার স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে অন্যান্য ভাষায় শিক্ষার সুযোগ থাকলেও সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষার সুযোগ আজও সেভাবে নেই। বা থাকলেও সেটা খাতায় কলমেই থেকে গেছে। বিজ্ঞান সম্মত বাস্তবায়ন আজও সম্ভব হয়নি। ফলে সাঁওতাল জাতিকে দ্বিভাষিক (Bilingual) হয়ে উঠতে হয়েছে। আর এই সত্যতা ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের যেকোন জাতির ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই মাতৃভাষা চর্চার সাথে সাথে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা ভাষাকে রপ্ত করা অনিবার্য হয়ে উঠছে। এজন্য তারা এক মিশ্র ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে চলেছে।

এবার বাঙালি-আদিবাসী সম্পর্কের আলোচনাকে কয়েকটি পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। বাঙালি ও আদিবাসী সংস্কৃতির সুসম্পর্কের কথা সর্বজন স্বীকৃত। কোনো কোনো সমালোচক একটু এগিয়ে বলেছেন—

> বস্তুত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান যেমন—দুর্গাপূজার সহিত সংশিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের থেকেই গৃহীত হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও গৃহীত হয়েছিল আটকৌড়ে সুবচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠীপূজা, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষীপূজার সময় লক্ষীর ঝাঁপি স্থাপন ইত্যাদির আচার যা বর্তমান কালেও বাঙ্গালী হিন্দু পালন করে থাকে, এ সবই তো প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির অবদান।[৪]

আর্যরা তখনও কোথাও থিতু হয়ে বসতে পারেনি। পারেনি তাদের চলমান সমাজ-সংস্কৃতি কোন শক্ত ভীতকে আশ্রয় করে শিকড় ছাড়তে। এই আর্য সভ্যতার কথা প্রসঙ্গে সমালোচকের মত—

> বস্তুত আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়েঘর অথবা পশুনির্মিত তাঁবুতেই ইহারা বাস করিত, গো-পালন জানিত, পশুমাংশ পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া স্থিতিলাভ করিবার পর পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রাম-সভ্যতা এবং নগর-সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্যভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হইল আর্যভাষার বিরাট কীর্তি। অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।[৫]

বৈদিক হিন্দুদের সাথে বাঙালি হিন্দু বা বঙ্গ সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণ প্রাক্-আর্যজাতি বা আদিবাসী তথা সাঁওতালি সংস্কৃতি। পরন্তু বাঙালি আদিবাসীর সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথা আজকের দিনে নতুন কিছু নয়। সমালোচকের ভাষায়—

বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির যে রূপায়ণ হয়, তার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে, বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব, প্রাধান্য ও প্রসার, মিলন মিশ্রণ ও সংঘাত, এবং গ্রহণ-বর্জন ও বিলোপের রীতির মধ্যেই সংস্কৃতির ইতিহাসের সমস্ত রহস্য, রোমাঞ্চ লুকিয়ে থাকে।[৬]

অর্থাৎ বাঙালি সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তি মিশ্রণের সত্যতা স্বীকৃত। এই মেলবন্ধনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে দেখার চেষ্টা করা যাক। সামগ্রিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এমন সব উপাদান, যেমন—'মঙ্গাল ঘট', 'আমগাছ', 'গাত্রহরিদ্রা', 'জলসহা', 'বিয়ের পোশাক', 'পিতৃপুরুষ পূজা', চিত্রশিল্প', 'সিঁন্দুর', 'নারী অলংকার', 'মঙ্গাল ধ্বনি', 'হরিবোল ধ্বনি' প্রভৃতি।

মঙ্গাল ঘট : বাঙালি সমাজে জলপূর্ণ ঘট শুভত্বের প্রতীক। মাঙ্গালিক শুভ যে-কোনো কর্মে এই ঘট সিদ্ধিদাতা গনেশেরও অগ্রগণ্য। জলপূর্ণ মঙ্গাল ঘট সাঁওতাল সংস্কৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাঁওতাল সমাজের মানুষজন বর-কনে দেখার সময়, বিচার ব্যবস্থায়, নতুন গৃহ নির্মানে, অতিথি আপ্যায়নে, মঙ্গাল ঘট স্থাপনা দিয়েই শুরু হয়।

দূর্বাঘাস : দুর্বাঘাস বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্দ অংশ। যে-কোনো মাঙ্গালিক ক্রিয়া কর্ম দূর্বাঘাস ব্যতীত অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয় না। বাঙালির দুর্গাষ্টমী, জন্মদিনে সন্তান আশীর্বাদ, বর-কন্যাকে আশীর্বাদ, লক্ষীপূজাসহ নানা ব্রতকথায় দূর্বাঘাস অনন্য ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গাত দুর্বাঘাসের পৌরাণিক যোগের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। আর সাঁওতালি বিবাহ সংস্কৃতিতে ঐ একই ভূমিকা পালন করে। সাঁওতালি পৌরাণিক মতেও সমাজ সংস্কৃতিতে দূর্বাঘাসের মান্যতা ও পবিত্রতা স্বীকৃত। তাই বিবাহে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ ও মঙ্গাল কামনায় দূর্বাঘাস হাতে বেঁধে দেওয়া হয়।

আমগাছ/আমপাতা : বাঙালির শুভ কর্ম বা পূজার সময় মূল প্রবেশ পথে আমপাতা দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়ার রীতি আছে। আবার জলপূর্ণ ঘট আম ডাল রেখে মূল ফটক বা দরজায় স্থাপন করার রীতি প্রচলিত। এ ধরণের রীতি সাঁওতাল আদিবাসী সমাজেও প্রচলিত আছে। শুধু তাই নয় বিবাহের সময় পাত্রকে প্রথমে আমগাছকেই বিবাহ করে। তারপর নির্দিষ্ট কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। এবং ঐ আমগাছের ফল কোনোদিনই সে খেতে পাবে না— এরকম রীতি প্রচলিত আছে।

গাত্রহরিদ্রা/গায়ে হলুদ : মানব জীবনে হলুদের ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা তথা ভেষজ গুণের কথা প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই হলুদ বাঙালি ও সাঁওতালি সমাজ-সংস্কৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি, বিশেষ করে বিবাহের সময় পাত্র ও কন্যাকে হলুদ মাখানো হয়। এমনকি 'গায়ে হলুদ' নামে এক বিশেষ পর্বও রাখা হয়েছে। আর আদিবাসী সাঁওতালি সমাজেও অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই হলুদ। বিবাহের দিন সকাল থেকেই কাঁচা হলুদ বেঁটে, তাই দিয়ে লালপাড় সাদা কাপড়কে গাবানো হয়। সেই কাপড় নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনকে বিদায় পর্বে প্রদান করা হয় এবং সেই কাপড় পরিধান করেই নিমন্ত্রিত অতিথি নিজের বাড়ি ফিরে যায়। সাঁওতালি বিয়েতে পাত্র-পাত্রী এবং গ্রামের মোড়ল জোড় ছাড়াও আর একজনকে হলুদ মাখানো হয় জামা-ধুতি বা শাড়িতে। সে হল ঘটক। এই হলুদ মাখানো পোশাক দেখেই দেশের মানুষ চিনতে পারে এই বিয়ের ঘটককে।

আবার বিবাবের সময় পাত্রের মাথায় টোপর বা পাগড়ী বা পাত্রীর মাথায় ঘোমটা দেওয়ার ক্ষেত্রেও উভয় সমাজের মিল দেখতে পাওয়া যায়। মনে করা হয় যে বিবাহের সময় কোনো অশুভ

শক্তি যাতে পাত্র-পাত্রীর ক্ষতি সাধন না করতে পারে তাই এ ব্যবস্থা। পারলৌকিক ক্রিয়া কর্মেও উভয় সমাজ-সংস্কৃতিতে মিল পাওয়া যায়। মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মাশন যাত্রাকালে বাঙালি হিন্দু ও আদিবাসী সাঁওতাল একই বোল অর্থাৎ 'হরিবোল' ধ্বনি দেয়। বাঙালি সমাজ মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান করে গঙ্গায় আর আদিবাসী সাঁওতালি সমাজ পিণ্ডদান করে দামোদর-এ কারণ সাঁওতালি সমাজ দামোদরকে গঙ্গার সমতুল্য বলেই মনে করে।

আলপনা বা অলংকরণ শিল্পের ক্ষেত্রেও বাঙালি আদবাসী সমাজে সম্পর্ক গভীর। বাঙালি সমাজে নানা পূজা আচারে যেমন আলপনা দেওয়া হয়, তেমনি বাড়ির দরজা বা দরজার দেওয়ালে বা চৌকাঠে নানান অলংকারের প্রচলন রয়েছে। আর এই অলংকারের ব্যাপকতা কি বিশাল সেটা যে-কোনো অনুষ্ঠানের সময় আদিবাসী পল্লিতে পদার্পণ করলেই প্রতীয়মান হবে। সর্বোপরি বিবাহের সময় সিঁদুর দান, পাত্রীকে নোয়া পরানো, শাঁখাপলা ব্যবহার, নানা ক্রিয়া কর্মে ধুপ ধুনো দেওয়া, নৈবেদ্য হিসেবে ফলমূল অর্পণ, বাড়ির উঠোনে তুলসী মন্দির বা তুলসী থান, গোবরে নিকানো বা গবর শুদ্ধিতা এবং খাদ্যাভ্যাসে ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, শাক-পাতাসহ নানা আচার বিচারে বাঙালি ও আদিবাসী সমাজের মিল পাওয়া যায়। সিঁদুর প্রসঙ্গে সমালোচকের মত—

> ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মপর্বে, অন্যান্য প্রাচীন পুরাণে যে ঘট স্থাপনের ব্যবস্থা আছে সেখানে সিঁদূর দানের ব্যবস্থা নেই। বাঙলার ভট্টভবদেব এবং পশুপতি পণ্ডিত প্রভৃতি সিঁদুর দানের অনুকূলে বৈদিক, স্মার্ত অথবা পৌরাণিক কোন শাস্ত্র খুঁজে পাননি। সুতরাং পালযুগে ভট্টভবদেব এবং পশুপতি পণ্ডিত ভদ্র হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে 'শিষ্ট সমাচারাৎ' মারফৎ সিঁদুর দানের স্বীকৃতি দেন।[৭]

যাইহোক সমাজ-সংস্কৃতির সাধারণ ধর্মই হল পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, আবিষ্কার, সংযোজন, বিয়োজনের পথেই এগিয়ে চলা। গ্রহণ বর্জনের ফলে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি যে মান্য ও সমৃদ্ধশালী বাঙালি হয়ে উঠেছে, সেই সমাজ-সংস্কৃতিও কি আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে? সে বিশেষ দিকটির প্রতিও আলোকপাত করা যেতে পারে।

বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালির জন্ম। বয়স প্রায় হাজার বছর। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে যে আদিবাসী কথা পাওয়া যায় একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম যাত্রা পথে প্রাকৃত, অপভ্রংশ-অবহট প্রভৃতির ধাপে ধাপে নানান ভাষার সঙ্গে ঘটেছে মিলন। ফলে তাদের নিয়েই বাংলা ভাষা তার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার দেশি শব্দকে সংস্কৃতের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ করে বাংলা ভাষায় স্থান দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী তালিকায় সাঁওতালদের স্থান সবার উপরে কারণ আদিবাসী তালিকার শবর, ভূমিজ, মাহালি, কোরওয়া, চেরো, কিসান প্রভৃতি গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আজ লুপ্ত। ওঁরাও প্রভৃতি নিজস্ব ভাষা ছেড়ে সাদরি ভাষাকে আপন করে নিয়েছে, একমাত্র সাঁওতাল, মুণ্ডা, গোণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি জাতি এখনও নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। এবং উপরি উল্লিখিত আদিবাসীর সবাই মূলত দ্বিভাষিক। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা হওয়াতে এই ভাষার প্রতি একটা প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এর মূল কারণ হল শিক্ষামুখী আদিবাসী, শিক্ষালাভের জন্য বাংলা ভাষা শিখতে এক প্রকার বাধ্যই হচ্ছে। আবার পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, জীবন-যাপন পদ্ধতি খুব দ্রুত গতিতে আদিবাসীদেরও প্রভাবিত করছে। যদিও

দীর্ঘসময় পাশাপাশি বসবাসের কারণে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'অ্যাকালচারেশন' বলে। সমালোচকের মতে—

> সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সমন্বয় তিন রকমের হতে পারে—১. দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, এবং তার ফলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হতে পারে; ২. ভিনদেশাগত লোকেরা স্থায়ীভাবে বসতি করে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ঘটাতে পারে; ৩. বিদেশীরা দেশ জয় করে বিজেতাদের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতেও পারে। বাংলার সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ইতিহাসে এই মিলন-মিশ্রণের বা 'অ্যাকালচারেশনের' গুরুত্ব খুব বেশি।[৮]

সর্বোপরি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে আধুনিকতা বা বিশ্বায়ন দেশের প্রতিটি সমাজ-সংস্কৃতিতে যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। তাতে আদিবাসী সমাজের তরফে আশঙ্কারও বটে। আবার এটাই ভবিতব্য। সমাজ-সংস্কৃতি বিশুদ্ধতা রক্ষা করে, যুগের উলটো স্রোতে তরী বাওয়া আদিবাসী সমাজ কেন, যে-কোনো সমাজের পক্ষেই সম্ভব নয়। বর্তমান মানব ইতিহাসের দিকে তাকালেই একথা স্পষ্ট রেখায় দেখা যায়।

উৎসের সন্ধানে

১. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' (প্রথম খণ্ড), বাস্কে পাবলিকেশন, ২০১৩, কলকাতা, ভূমিকা
২. অতুল সুর : 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', আনন্দ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ২৪
৩. নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৮২
৪. অতুল সুর : 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' জিজ্ঞাসা, কোলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪৯
৫. উৎস-৩, পৃ. ৭৩
৬. বিনয় ঘোষ : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব', অরুণা বাগচি অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৬৪
৭. শঙ্কর সেনগুপ্ত : 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি', ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২৬১
৮. উৎস-৬, পৃ. ৭৩

তথ্যের সন্ধানে

১. বিনয় ঘোষ : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব', অরুণা বাগচি অরুণা প্রকাশণী, কলকাতা
২. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' (প্রথম খণ্ড), বাস্কে পাবলিকেশন, ২০১৩, কলকাতা
৩. নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২২
৪. অতুল সুর : 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', আনন্দ, ১৪২১, কলকাতা
৫. অতুল সুর : 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৮২
৬. শঙ্কর সেনগুপ্ত : 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি', ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭২

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে লাঠিখেলা

দয়াল চাঁদ সরদার

মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই লাঠি মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এক বিশেষ সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে। মানুষ প্রথম যখন অস্ত্রের ব্যবহার করতে শেখে তখন থেকেই লাঠি চিনেছে। লাঠির মাথায় পাথর দিয়ে অস্ত্র বানিয়েছে, পরে লোহার ফলা দিয়ে বল্লম বানিয়েছে। আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হবার পরে লাঠির গুরুত্ব কমে গেলেও লাঠির প্রাসঙ্গিকতা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লাঠির গুরুত্ব অপরিসীম। একাধারে লাঠি যেমন ক্ষমতাধরদের কাছে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অন্যত্র অক্ষমদের কাছে অবলম্বন হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলা একসময় জঙ্গল আকীর্ণ পরিবেশ থাকায় মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদে জঙ্গালাকীর্ণ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে লাঠির ব্যবহার করে থাকে। এখনো যারা বিভিন্ন কারণে জঙ্গালে প্রবেশ করে তারা আত্মরক্ষার জন্য লাঠি নিয়ে প্রবেশ করে। আবার কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে কৃষি ক্ষেত্রে গেলেও বিষধর সাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাঠি নিয়ে যায়। বাংলার সমাজ কাঠামোর উপর থেকে নিজ পর্যন্ত লাঠির অবস্থান লক্ষ করা যায়। লাঠির ব্যবহার ক্রমশ অস্ত্রবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পৌরাণিক অস্ত্র গদা চালনার অনুসরণে লাঠি চালনার প্রশিক্ষণ হতে থাকে। যাঁরা লাঠি চালনায় দক্ষ তাঁদের লাঠিয়াল বলা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাঠি চালকরা যখন জনসমক্ষে লাঠির কলাকৌশল প্রদর্শন করে তখন তা হয়ে ওঠে লাঠিখেলা।

গ্রামীণ বাংলার প্রশাসনে প্রাগব্রিটিশ ও ব্রিটিশ আমলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাঠি চালক বা লাঠিয়ালদের গুরুত্ব কম ছিল না। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের নিরাপত্তা রক্ষা ও প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার্থে লাঠিয়াল নিযুক্ত করত। বাগদী, মুচি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, রাজবংশী, ডোম, মুসলমান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে লাঠিয়াল বেশি ছিল। অনেকে বংশপরম্পরায় লাঠিয়াল হয়েছে। লাঠিয়াল পিতা প্রশিক্ষণ দিয়ে পুত্রকে লাঠিয়াল বানিয়েছে। এই বংশপরম্পরায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

লাঠিয়ালদের কাছ থেকে জমিদার ও প্রভাবশালী পরিবারের সন্তানরাও লাঠিখেলার প্রশিক্ষণ নিত। বাংলার বিপ্লবীদেরও লাঠিখেলা বাধ্যতামূলকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। লাঠির প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪) উপন্যাসে লিখেছেন—

> হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছাড় বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালার আব্রু, পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে।

লাঠির গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লাঠিকে পিনাল কোডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ তিনটি উপন্যাস 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭)-এর মধ্যে অনুশীলন তত্ত্বকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। যে অনুশীলন তত্ত্বের অনুসরণে ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি গঠন করা হয়েছে। বাংলায় বিপ্লবী তৈরি করার কাজে যে অনুশীলন সমিতির অবদান অপরিসীম। সেই অনুশীলন তত্ত্বেও বাংলার নিজস্ব মার্শাল আর্ট লাঠিখেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ১৮৭৭-১৯৪৯ ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বিখ্যাত লাঠি খেলার প্রশিক্ষক। তিনি ঢাকার বিখ্যাত লাঠিয়াল ওস্তাদ মুর্তজা সাহেবের কাছে লাঠি খেলার প্রশিক্ষণ নেন। তিনি 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা' নামে একটি গ্রন্থ ও রচনা করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সৌজন্যে লাঠিখেলা গ্রামীণ জমিদার, লাটদার, ইজারাদার, নীলকর ইত্যাদি প্রভাবশালীদের অঙ্গন থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিস্তার লাভ করে। গ্রামীণ বিত্তশালীদের সম্পত্তি রক্ষার কাজে পেশাদার লাঠিয়াল ব্যবহারের প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসেও আছে। বেণী ঘোষাল ও রমা বাঁধ রক্ষার জন্য আকবর ও তার দুই লাঠিয়াল ছেলেকে পাঠালে রমেশের সঙ্গে লাঠালাঠি হয়। রমেশের লাঠির ঘায়ে আকবর ও তার দুই ছেলে আহত হয়—

> আকবর তাহাদের পীরপুরের প্রজা; সাবেক দিনের লাঠির জেরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভালো করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে। সে নিজেই যে এত বড় লাঠিয়াল এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

গ্রাম বাংলার বিত্তশালীরা কেবল সম্পত্তির রক্ষার্থে লাঠিয়ালদের সহযোগিতা নিত তা নয়, বিভিন্ন কাজে লাঠিয়ালদের ব্যবহার করত। তীর্থযাত্রা করার সময় পথে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তীর্থযাত্রীরাও লাঠিয়ালদের সঙ্গে করে নিয়ে যেত। লালন ফকিরের জীবন অবলম্বনে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মনের মানুষ' (২০০৮) উপন্যাসে তার বর্ণনা আছে—"সব বড় দলেই একাধিক পাহারাদার থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরও লাঠি ধরতে হতো। লালুকেও যদু লাঠি খেলা শিক্ষা দেয় রোজ। সন্ধ্যার সময় যাত্রা বিরতি হলে কিছুক্ষণ যদুর সঙ্গে লালুকে লাঠির পাল্লা দিতে হয়।" পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যেমন বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল তেমন সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়েও কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত জাতিতত্ত্বের ভাবনা নিয়েই গড়ে উঠেছিল। যেমন—

১. ১৯১০ সালে রংপুরে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা (১৮৬৬-১৯৩৫) ক্ষত্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি রাজবংশী যুবক ও যুবতীদের শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে লাঠি খেলা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। 'ডাংধরী মাও' নামে কবিতা লিখে তিনি রাজবংশী সমাজের নর-নারীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

২. ১৯২৫ সালে কলকাতার বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন পুলীনবিহারী দাশ। এর অনুসরণে বাংলার বহু স্থানে ব্যায়াম সমিতি গড়ে ওঠে। শিমলা ব্যায়াম সমিতি, ব্যাটরা ব্যায়াম সমিতি, মেদিনীপুরের মিঞাবাজার, তমলুকের রক্ষিত বাড়ি, কাঁথির বন্দেমাতরম গ্রাউন্ড, মুগবেড়িয়া, গড়বেতা প্রভৃতি অঞ্চলে আখড়া করে লাঠিখেলা চর্চা হতো।

৩. ১৯৩২ সালে গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) ব্রতচারী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন এবং লাঠিখেলাকে তিনি ব্রতচারীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

৪. ১৯১৭ সালে স্বামী প্রণবানন্দ (১৮৯৬-১৯৪১) একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন মূলত দুর্গত মানুষের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে, পরে সেই আশ্রম বৃহৎ আকার নিয়ে নাম হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘ।

১৯৩২ সালে ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জে নিজস্ব জমি ও বাড়িতে সংঘের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। এই সংঘ সেবা কার্যের পাশাপাশি তীর্থ সংস্কারের উদ্যোগ নেয় তীর্থক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত ধর্মব্যবসায়ীদের দমন করতে সংঘ লাঠিয়ালদের সহযোগিতা নেয়। ১৯৪০ সালে স্বামী প্রণবানন্দ ভারত সেবাশ্রম সংঘের তত্ত্বাবধানে 'হিন্দু মিলন মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। এই হিন্দু মিলন মন্দিরগুলিতে 'হিন্দু রক্ষীদল' গঠনের ভাবনা-চিন্তা করেন। হিন্দু রক্ষীদলের সদস্যদের লাঠিখেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মূলত হিন্দুর জাতীয় জীবনে বীরত্বের সঞ্চার ঘটাতে লাঠিখেলাকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দেন।

বাস্তবিক বাঙালি জীবনে সাহসিকতা ও বীরত্বের ভাব প্রদর্শনে লাঠি খেলা অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। তার পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' গ্রন্থের 'দ্বিতীয় ভাগে'র দ্বাদশ পাঠে ডাক্তার বিশ্বম্ভরবাবুর চাকর লাঠিয়াল শম্ভুর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে—

> গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভর বাবু পালকি চড়ে চলেছেন সপ্তগ্রাম। পালকির সঙ্গে চলেছে তার শম্ভু চাকর, হাতে এক লম্বা লাঠি।...শম্ভুর গায়ে অদ্ভুত জোর একবার কুস্তীরার জঙ্গালে তাকে ভল্লুকে ধরেছিল সঙ্গে বন্দুক ছিল না। শুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল।...শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন। এমন সময়ে বেহারাদের সর্দার বুদ্ধু এসে বললেন—'ওই যে কারা আসছে ওরা ডাকাত সন্দেহ নেই।'...
> ডাক্তার বললেন 'এখন উপায় কী
> শম্ভু বললে 'ভয় নেই আমি আছি।
> ডাক্তার বললেন, 'ওরা যে পাঁচ জন'
> শম্ভু বললে, 'আমি যে শম্ভু।' এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বললে 'খবর্দার'।...শম্ভু লাঠি ঘুরিয়ে যেই ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি দুজনে দিল দৌড়।

সুতরাং লাঠিখেলা যেন বাঙালির বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা অবলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় তিন ধরনের লাঠিয়াল ছিল—

১. মাসিক বেতনভুক্ত লাঠিয়াল
২. সাময়িক ভাড়া করা লাঠিয়াল
৩. সমাজসেবা ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপেশাদার লাঠিয়াল।

জমিদারী প্রথার অবলুপ্তির পর গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। জমিদার তার জমিদারিত্ব হারিয়ে সাধারণ হয়ে গেলে তাদের অর্থে পালিত লাঠিয়ারা পেশাদারিত্ব হারায়। তারা তাদের প্রশিক্ষণকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে কয়েকজন মিলে এক-একটি লাঠি খেলার দল তৈরি করে। সেই দলে অপেশাদার লাঠিয়ালরাও যোগ দেয়। এই দলগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ও সংস্থার ছত্রছায়ায় চলে আসে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, বিভিন্ন গ্রাম্য মেলা ও উৎসব, এমনকি মহরমের তাজিয়ায় লাঠিখেলার প্রদর্শন হয়। লাঠি ব্যবহার করে রণপা ও রায়বেঁশে নৃত্যের প্রচলন বাংলায় আছে। তবে লাঠি খেলার প্রদর্শন আর এই নৃত্যের প্রদর্শন এক নয়। লাঠিখেলা মূলত বীরত্বব্যঞ্জক লোকক্রীড়া বা ফোক মার্শাল আর্ট। এই লোকক্রীড়ার মধ্যে নাটকীয়তা আছে। এখানে লাঠি নিয়ে লাঠিয়াল যেমন নানান কলা কৌশল প্রদর্শন করে, তেমন পূর্বে সমাজে লাঠি নিয়ে যেভাবে যুদ্ধ কিংবা দাঙ্গা হতো তার নমুনা প্রদর্শন করে থাকে। এই লাঠিখেলা মূলত দুই থেকে তিন ঘণ্টা ধরে চলে।

লাঠি খেলায় আত্মরক্ষার বিভিন্ন কলাকৌশল দেখে দর্শকরাও আনন্দিত হয়। লাঠিখেলার একটা আসরে দুই-তিন ঘণ্টা প্রদর্শনীর মধ্যে কেবলমাত্র লাঠিখেলা থাকে তা নয়। লাঠিখেলার ফাঁকে ফাঁকে লাঠিয়ালরা মাঝে-মধ্যে ছুরি খেলা, তরবারি খেলা, রিং খেলা, দড়িখেলা ইত্যাদি প্রদর্শন করে থাকে। গলা ও পেটে শসা, লাউ, পান ইত্যাদি রেখে ধারালো তরবারির আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা অথবা চক্রাসন করা অবস্থায় পেটে চার-পাঁচটি ইট রেখে শাবল দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলা ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক খেলারও প্রদর্শন করে। ছুরি খেলার মধ্যে জিমন্যাস্টিকসের ব্যবহারও করা হয়ে থাকে। এই ধরনের লাঠিখেলার প্রদর্শনের সময় ঢাক, ঢোল, কাঁশি, ধামসা, মাদল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। এক একটি লাঠিখেলার দলে দশ জনের অধিক খেলোয়াড় থাকে। এক একটি খেলা আসরে দুই থেকে প্রায় দশ মিনিট স্থায়ী হয়। লাঠি খেলার শুরুতে দলের সকল সদস্য লাঠি পৃষ্ঠদেশে নিয়ে আসরে প্রবেশ করে সারিবদ্ধ হয়ে দৌড়ে আসর প্রদক্ষিণ করে। আসর প্রদক্ষিণের পর সবাই বৃত্তাকারে পজিশন নিয়ে পৃষ্ঠদেশ থেকে লাঠি নামিয়ে সকলে একসাথে মাটিতে আঘাত করে। সকল লাঠিয়ালের লাঠির অগ্রভাগ বৃত্তের মধ্যে এক জায়গায় থাকে এবং পশ্চাৎ বামহাতে মুষ্টিবদ্ধ থাকে। এমন অবস্থায় লাঠিয়াল পিছন ফিরে দর্শকদের দিকে মুখ করে ডান হাত মুখে দিয়ে জোরালো আওয়াজ করার মাধ্যমে সমবেতভাবে প্রণাম জানায়। সমবেত প্রণাম জানানোর পর সবাই আসর ত্যাগ করে এরপর বাদ্যযন্ত্রের অনুসঙ্গে এক বা একাধিক লাঠিয়াল আসরে প্রবেশ করে এক একটি বিশেষ খেলা দেখাতে থাকে। লাঠিয়ালরা যে লাঠি নিয়ে খেলা দেখায় সাধারণত তা লম্বায় ৫ ফুট থেকে ৬ ফুটের মধ্যে হয়ে থাকে। খেলার লাঠি মূলত দুই ধরনের। যথা—

১. বেতের লাঠি : এই লাঠিকে বেনেটির লাঠি বলা হয়। বেনেটিতে লাঠির যুদ্ধ দেখানো হয় না। বেনেটি খেলায় মূলত হাতের কব্জি ও আঙ্গুলের কাজ বেশি থাকে। এই খেলায় লাঠিকে শরীরের চারপাশে নানান কৌশলে ঘোরানো হয়। ভালো খেলোয়াড়রা এতটাই দ্রুত লাঠি ঘোরায়, লাঠি কোনোদিক দিয়ে কীভাবে ঘুরছে দর্শক অনেক সময় বুঝতে পারেনা। বেনেটি খেলা মূলত চার ধরনের—১. সরল বেনেটি, ২. বল বেনেটি, ৩. রং বেনেটি, ৪. ডবল বেনেটি। সরল বেনেটিতে হাত এবং পায়ের সঞ্চালনের উপরে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে লাঠি সরলভাবে

ঘোরানো হয়। বিভিন্ন পদ্ধতির নামও আছে। বেনেটির নির্দিষ্ট নিয়ম বা ব্যাকরণ আছে। এই নামগুলি হল—অনুলোম, বিলোম, সম্মুখ ও পৃষ্ঠবেষ্টন, সন্দীপনী চক্র, সম্মুখ ও মস্তকাবর্তন, ঘটিকা চক্র, জঙ্ঘাবর্তন, অঙ্গুলিচক্র ইত্যাদি। রং বেনেটিও এই ব্যাকরণ মেনেই হয়, তবে রং বেনেটিতে জিমন্যাস্টিকসের ব্যবহার থাকে। বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশলের চমকপ্রদ ব্যবহার রং বেনেটিতে থাকে। এই খেলার শারীরিক অঙ্গাভঙ্গিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে একটি বা দুটি আঙুলের মাধ্যমে কিভাবে লাঠি চক্রাকারে ঘোরানো হয়, তা এই রং বেনেটিতে প্রদর্শিত হয়। ডবল বেনেটিতে মূলত দুই হাতে দুটি বেতের লাঠি নিয়ে ঘোরানো হয়। এখানেও বেনেটির নির্দিষ্ট ব্যাকরণ মেনে লাঠি খেলা প্রদর্শন করা হয়।

২. বাঁশের লাঠি : এই লাঠি একটি বিশেষ ধরনের বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। এই বাঁশ সরু ও নীরেট হয়ে থাকে এবং বেশি গাঁটযুক্ত বাঁশ হয়। লাঠি খেলার লাঠি খুবই শক্ত। লাঠির এক দিক শুরু হয় অন্যদিক অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। এই লাঠি ধরার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। লাঠিয়াল লাঠিটিকে দুই হাত দিয়ে ধরে লাঠির সরু একটি উপরের দিকে এবং মোটার দিকটি নিচের দিকে থাকে। ডান হাত দিয়ে লাঠির শুরু অংশের দিকের শেষ প্রান্ত থেকে প্রায় এক ফুট ছেড়ে মুষ্টিবদ্ধ করা হয়। হাতের পাতার উপরিভাগ লাঠির উপরের দিকে থাকে আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় নিচের দিকে থাকে। ডান হাত থেকে বাম হাতের দূরত্ব প্রায় এক ফুট রেখে বাম হাত দিয়ে লাঠির মাঝ বরাবর মুষ্টিবদ্ধ করা হয়। বাম হাতের পাতার উপরিভাগ লাঠির নিচের দিকে থাকে আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় লাঠির উপর দিকে থাকে। লাঠিয়ালরা এভাবেই মূলত লাঠি ধরে থাকে। এই বাঁশের লাঠি দিয়ে তিন ধরনের খেলা হয়—১. হাড়োয়া ২. ফাইট বা আঘাত এবং ৩. ঢাল-লাঠি।

হাড়োয়া হল লাঠির পাঁয়তাড়া। লাঠিয়াল বাঁশের লাঠি নিয়ে সজোরে শরীরের চারপাশে ঘোরাতে থাকে। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খেলা হল হাড়োয়া। দাঙ্গা অথবা লাঠির যুদ্ধ কিংবা ভিড় সামলানোর কাজে এই হাড়োয়া লাঠি ব্যবহার করা হয়। বড় লাঠিয়ালরা হাড়োয়া চালালে আশেপাশে কোনো শত্রু ঘেঁষতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠের শম্ভু হাড়োয়া চালিয়েই ডাকার দলের দমন করে। জেনেটির মতো হাড়োয়ারও কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা ব্যাকরণ আছে। লাঠি খেলার আসরে এক বা একাধিক লাঠিয়াল হাড়োয়া প্রদর্শন করে থাকে।

লাঠি খেলার মধ্যে ফাইট বা আঘাত হল সব থেকে জনপ্রিয় খেলা। এই খেলায় প্রতিটি আঘাতের নাম ও বিশেষত্ব আছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর 'ইছামতী' (১৯৫০) উপন্যাসের একটি চরিত্র হলা পেকে ডাকাতির বাহিনীর বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি আঘাতের নাম নিয়েছে—

> মোদের তখন গাঁয়ের লোক ঘিরে ফেলেচে, পালাবার পথ নেই—ওদিকে দাক্ষায়ণী গোয়ালঘর থেকে সড়কি চালাচ্ছে। অঘোর পালাবার ইশারা করলে—কিন্তু তখন পালাই মোরা কোন রাস্তা দিয়ে। তখন মোদের শেষ অস্ত্র চালালাম—'দুই হাত্তা' বলে লাঠির মার চালিয়ে 'তামেচা', 'বাহেরা' শির ঠিক রেখে পপ করে কুমোরের চাকের মত ঘুরতি ঘুরতি ভিড় কেটে বার হয়ে এসে পথ করে দিই দলের সবাইয়ের। মোদের দলের যে লোকটা যখম হলেন, তার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে সরে পড়ি—আহা লোকটার নাম বংশীধর। সর্দার ভারী সড়কিবাজ ছেলে।

এখানে হলা পেকে যে লাঠি চালনার কথা বর্ণনা করেছে তা মূলত হাড়োয়া। সঙ্গে কয়েকটি

আঘাতের মারও মেরেছে। লাঠিয়ালরা আপদকালীন অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে এভাবেই লাঠি চালাতো। যে মারগুলির মাধ্যমে লাঠির ফাইট খেলা হয় তার বিশেষ কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করলাম—

১. গ্রীবান : বাম কাঁধ ও গ্রীবার সংযোগস্থল লক্ষ্য করে আঘাত।
২. হীনায়ন : ডান কাঁধ ও গ্রীবার সংযোগস্থল লক্ষ্য করে আঘাত।
৩. পালট : ডান পায়ের হাঁটুর নিচের অংশ লক্ষ্য করে আঘাত।
৪. তামেচা : বাম কান ও রগ লক্ষ্য করে আঘাত।
৫. বাহেড়া : ডান কান ও রগ লক্ষ্য করে আঘাত।
৬. আসর : ডান পায়ের হাঁটুর উপরের অংশ লক্ষ্য করে আঘাত।
৭. মন : মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে আঘাত।
৮. ভুজ : বাম কাঁধ ও কনুইয়ের মাঝামাঝি অংশ লক্ষ্য করে আঘাত।
৯. প্রপাত : মাথার মাঝ বরাবর আঘাত।
১০. সাকম : জানু লক্ষ্য করে আঘাত।
১১. হাতকাঠি : ডান হাতের কনুই ও মণিবন্ধের মধ্যবর্তী অংশ লক্ষ্য করে আঘাত।
১২. ভাণ্ডার : ডান কোমর লক্ষ্য করে আঘাত।
১৩. চাকী : বাম কানের উপরের অংশ লক্ষ্য করে আঘাত।
১৪. ত্রিহর : ডান কানের উপরের অংশ লক্ষ্য করে আঘাত।
১৫. ঊর্ধ্বগোড়া : লাঠির ডান হাতের দিকের প্রান্ত ভাগ দিয়ে মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে আঘাত।
১৬. নিম্নগোড়া : লাঠির বাম হাতের দিকের প্রান্ত ভাগ দিয়ে মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে আঘাত।
১৭. শির : মাথার বামদিক লক্ষ্য করে আঘাত।
১৮. কোটি : বাম কোমর লক্ষ্য করে আঘাত।
১৯. হুল : নাভির নিচের অংশ লক্ষ্য করে সোজাসুজি আঘাত।
২০. আলিভূমি : লাঠির অগ্রভাগ দ্বারা বাম অথবা ডান দিকের মাটিতে আঘাত করা ইত্যাদি।

লাঠির ফাইট খেলায় লাঠিয়ালরা মূলত লাঠির যুদ্ধ প্রদর্শন করে। এখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ লাঠিয়াল থাকে। একজন লাঠিয়াল আসরে ফাইট খেলতে পারে না। দুইজন, চারজন, ছয়জন, আটজন লাঠিয়াল মিলে ফাইট খেলে। একজন লাঠিয়াল পক্ষ ও দুইজন বিপক্ষ হয়ে মোট তিনজন লাঠিয়ালের মধ্যেও ফাইট খেলা হয়। ফাইট খেলাতে লাঠির যুদ্ধ প্রদর্শিত হওয়ার জন্য বিশেষ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে এই খেলাই দর্শক মনে সবথেকে বেশি রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। কয়েকটি জনপ্রিয় ফাইট খেলার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. **ককফাইট :** চাকী, পালট, ত্রিহর, ঊর্ধ্বগোড়া, নিম্নগোড়া মারগুলি পরপর মেরে খেলাটি প্রদর্শিত হয়। এটি মূলত লাঠির প্রাথমিক খেলা।
২. **চতুর্মুখী :** কোটিবন্ধ, চাকী, পালট, ত্রিহর ঊর্ধগোড়া, নিম্নগোড়া মেরে ঘুরে গিয়ে হুল মেরে উড়ন মার।
৩. **চতুর্ঘাত :** হাতকাটি, শির, হুল, ভাণ্ডার।
৪. **সপ্তঘাত :** চাকী, শির, চিৎ, ভাণ্ডার, ঊর্ধ্বগোড়া, নিম্নগোড়া মেরে ঘুরে গিয়ে আবার পুনরায় শুরু।
৫. **এগারোবাড়ি :** এখানে ১১ ধরনের খেলা প্রদর্শন করা হয়।
৬. **নব অভিবাদন :** হাতকাটি, চাকী, পালট, ত্রিহর, হুল, ভাণ্ডার, ঊর্ধ্বগোড়া, নিম্নগোড়া ইত্যাদি মারগুলির মাধ্যমে এখানেও বেশ কয়েক প্রকারের খেলা লাঠিয়ালরা প্রদর্শন করে থাকে।

৭. **সামঘাত :** গ্রীবান, পালট, তামেচা, আসর, মন, ভুজ, প্রপাত, সাকম, বাহেড়া, হাতকাটি, ভাণ্ডার মারগুলি পরপর একে অপরের উপর মেরে এই খেলা প্রদর্শিত হয়। সামঘাত অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ভয়ংকর খেলা। একটু অন্যমনস্ক হলেই লাঠিয়ালরা বড় ধরনের আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। পৌরাণিক গদাযুদ্ধের অনুকরণে এই খেলাটি প্রদর্শিত হয়।

৮. **কালঘাত :** হাতকাটি, তামেচা, মেরে ঘুরে গিয়ে পালট মেরে পুনরায় শুরু।

৯. **লাঠির প্যাঁচ :** এই খেলায় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ লাঠিয়াল উভয়ে উভয়ের লাঠির প্যাঁচে আবদ্ধ করে জব্দ করে।

১০. **ফ্রি-ফাইট :** এই খেলায় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় উভয়ে উভয়ের প্রতি যেমন খুশি মার ব্যবহার করে জব্দ করতে পারে ইত্যাদি।

তবে লাঠি খেলার ধরন স্থান বিশেষে ভিন্ন হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে লাঠিয়ালরা তাদের নিজেদের সুবিধামতো লাঠি খেলার পদ্ধতি স্থির করে থাকে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে লাঠি খেলা ফোক মার্শাল আর্ট বা বীরত্বব্যঞ্জক লোকক্রীড়া হিসেবে বাংলায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলার বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লাঠি খেলা প্রদর্শন হতে দেখা যায়। মুসলমানদের মহরম উদ্দেশ্যে লাঠিখেলা বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে আবার হিন্দুদেরও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি) বড় উৎসবে লাঠি খেলার আয়োজন বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে। বাংলায় লাঠি খেলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বিভিন্ন ব্রতচারী সংগঠন এবং বিভিন্ন লোকশিল্পী সংগঠনের অবদান আছে। লাঠি খেলার বড় দলগুলি মূলত ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত হিন্দু মিলন মন্দিরগুলির ছত্রছায়ায় পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে লাঠিয়ালদের মধ্যে হৃষিকেশ মাইতি (১৯৩০-২০০৪) ছিলেন অন্যতম। তিনি মেদিনীপুরে আদি বাসিন্দা; স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। পরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তার ছাত্ররা লাঠি খেলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। খ্যাতিমান ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মথুরাপুর ব্লকের কৃষ্ণনগর পাটকি নিবাসী ধনঞ্জয় নস্কর, অর্জুন নস্কর, ওই ব্লকের কৃষ্ণরামপুর নিবাসী জ্যোতির্ময় হালদার, মগরাহাট থানার ইয়ারপুর নিবাসী হারাণচন্দ্র মণ্ডল, কাকদ্বীপের শেওড়াতলা নিবাসী বীরেন সিং ও শিবু দলপতি, কুলপি থানার বাঁশবেড়িয়া নিবাসী সুকুমার হালদার, কণকরতন হালদার ও প্রশান্ত নস্কর প্রমুখ। এঁদের মধ্যে শিবু দলপতি ও বীরেন সিং জুটি খুবই বিখ্যাত ছিল। এঁরা লাঠি খেলোয়াড় হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়। পরে হৃষিকেশ বাবুর ছাত্রদের প্রশিক্ষণে আরো কয়েকটি দল গড়ে ওঠে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলপি থানার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া, ঢোলা থানার অন্তর্গত ভাজনা ও কেওড়াতলা, মগরাহাট থানার অন্তর্গত মাখালিয়া, হোটর, কাঁঠালবেড়িয়া জয়নগর থানার অন্তর্গত পুনপুয়া এবং হরিণডাঙ্গার অন্তর্গত চিয়াড়ি, মথুরাপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর পাটকি এবং কৃষ্ণরামপুর ইত্যাদি গ্রামের দলগুলি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে লাঠি খেলা প্রদর্শন করেছে। বর্তমানে এইসব দলগুলির সদস্যদের অনেকেই বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকার জন্য লাঠিখেলা থেকে সরে এসেছে এবং দলগুলির অস্তিত্ব তাই সংকটজনক হয়েছে।

বর্তমানে লাঠিখেলা এক প্রকার লুপ্তপ্রায় লোকশিল্প হয়ে গিয়েছে। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে লাঠিখেলা লুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়ার পিছনে যে কারণগুলি লক্ষ্য করা যায়, তা হল—

১. লাঠি খেলা ব্যয় সাপেক্ষ খেলা। লাঠি ভাঙলে বা খেলোয়াড় চোট পেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকের অভাব আছে।
২. যুবসমাজের শরীর চর্চা করার প্রবণতা কমেছে। বিশেষ করে লাঠি খেলা শেখার প্রবণতা আরো কমেছে।
৩. উপযুক্ত প্রশিক্ষকের সংখ্যাও ক্রমশ কমে গিয়েছে।
৪. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবের ফলে লাঠি খেলার মত লোকশিল্পের স্থান খুব একটা হচ্ছে না।
৫. বাংলার একান্ত নিজস্ব প্রাচীন মার্শাল আর্ট এই লাঠিখেলাকে বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ সরকারের পক্ষ থেকেও তেমন দেখানো হয় না।
৬. সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাঠি খেলোয়াড়ের অভাব হওয়ার জন্য বর্তমানে যে দলগুলি কোনক্রমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তারা সেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছে না।

পরিশেষে বলা যায়, লাঠি খেলার মত ঐতিহ্যপূর্ণ লোকশিল্পকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়; শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্যে সমাজে ব্যাপক ভাবে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন আগ্নেয় অস্ত্রের প্রসঙ্গ টেনে অনেকেই লাঠি খেলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তবে এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অমূলক। লাঠির সঙ্গে বোমা বা বন্ধুকের কোনো তুলনাই চলে না। এই খেলা এমন একটি খেলা, যা একাগ্রতা বাড়ায়। খেলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হলেই আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। এই খেলা প্রশিক্ষণ নিলে শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাবের পরিবর্তন ঘটে। আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য তৈরি হয়। সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীর মধ্যে বীর ভাব উদ্দীপ্ত হয়। এই বীরত্বের ভাবকে অবলম্বন করে যুবক-যুবতীরা জীবনের যেকোনো বাধা ও সমস্যাকে অনায়াসে জয় করতে সমর্থ হয়। সুতরাং, লাঠিখেলা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একদিন যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই খেলার কদর বর্তমানে তেমন না থাকলেও এই খেলার প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়েছে বলে মনে হয় না।

তথ্যের সন্ধানে

১. স্বামী সুপ্রভানন্দ : 'আত্মরক্ষা মূলক লাঠিখেলা শিক্ষা', ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ২০১৫
২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বঙ্কিম রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং ২০১৯
৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ইছামতী', www.bengalibook.com. ১০/০৫/২০২৩
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৪
৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'পল্লী সমাজ', www.bengalibook.com ১০/০৫/২০২৩
৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : 'মনের মানুষ', www.bengalibook.com ১০/০৫/২০২৩
৭. ক্ষেত্রসমীক্ষা ও অন্যান্য সহযোগিতায় অর্জুন নস্কর, জগদানন্দ নস্কর, বীরেন সিং, সুকুমার হালদার, কিশোরী মোহন হালদার, উদয় নস্কর, দেবব্রত সরদার, সত্যরঞ্জন মহাপাত্র, সনাতন সরদার, শুভ্র কান্তি ময়রা ও রামকৃষ্ণ মণ্ডল, সুজিত দাস, পুলক রঞ্জন দাস প্রমুখ।

ছড়ার রূপ ও রূপান্তর

রাজু ভুঁই

লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা হল ছড়া। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ ছড়ার অর্থ করেছেন গ্রাম্যকবিতা। আমার ছেলেবেলা কেটেছে ঠাকুমার এমন অজস্র কবিতা ও গাল গল্প শুনেই। আজকের নিউক্লিয়ার ফ্যামেলীর মতো ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার খুব একটা অবকাশ অভিভাবকদের তখন ছিল না। তাই 'হারে রে রে রে রে... আমায় রাখবে ধরে কে রে...যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে...'[১] এমন বাঁধনহারা শৈশব পেয়েছিলাম। গ্রামের আঁকা বাঁকা পথে, বনে বাঁদাড়ে সবুজ শ্যামলিমা দু'চোখ ভরে দেখেছি আর শুনেছি সন্ধ্যায় কৃষ্ণযাত্রার মহড়া, কীর্তন আর মাঝে মাঝে বাউল গান। এ সবই মনে হত ঠাকুমার ছড়া কেটে কেটে বলা রূপকথা, মহাভারতের গল্পের মতো। বিশেষ করে রামায়ণের গল্প। শুনতে শুনতে—"কে তোমরা দুটি শিশু মুনির তপোবনে/তোমাদের দেখে আমার সীতায় পড়ে মনে।"[২] লব কুশের জন্য বেদনার্ত হৃদয়ে কখন ঘুমিয় পড়তাম। কোনো দিন বা ঠাকুমার 'মনোহর দেউল' গল্পের "হেকট কাঠের লাউ/মন পবনের নাউ।/চ বলতে চ সেই বাগ রাজার দেশে চ।"[৩]

এখানে 'নাউ' অর্থে নৌকা অর্থাৎ মনের নৌকার কল্পনায় ভর করে ছড়ার সুরে অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে পাড়ি দিতাম আর নীলপরি লালপরির মতো চোখে কেউ যেন তখন ঘুমের যাদুকাঠি স্পর্শ করাত। ছড়ার একটি বিশেষত্ব এই যে, তাতে একটি সুর বা ছন্দ থাকে যাতে সমসাময়িক জীবনের ছবি অতি সহজেই ধরা পড়ে—'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।'[৪] সেকালের বর্গী হাঙ্গামার ঐতিহাসিক ঘটনা—এই ছড়ার মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই রকম কত ছড়া শুনতে শুনতে শৈশব

কেটেছে। 'ছড়ার গান' শব্দের ব্যবহারে বোঝা যায় গানের সঙ্গে ছড়ার অতি নিবিড় সম্পর্ক। দীর্ঘকাল ধরে গ্রাম বাংলার মা-ঠাকুমাদের মুখে মুখে তা উচ্চারিত হয়েছে। তবে ছড়াগুলি নির্দিষ্ট সীমানায় বন্ধ নয় তা সার্বজনীন। তবে ছড়ার মধ্যে কথান্তর দেখা গেছে। শৈশবের খেলার ছড়া ছিল—"উলুকুচু দুলুকুচু বনের মাসী/বনকে নিয়ে একাদশী/একানল পঞ্চদল/হরেক নামের টিকিট ফল।"[৫] রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়ায়-২' প্রবন্ধে পাই— "উলুকেতু দলুকেতু নলের বাঁশী/নল ভেঙেছে একাদশী/একা নল পঞ্চদল/কে যাবি রে কামার সাগর।।"[৬] গ্রামবাংলার মানুষেরা কথায় কথায় আগে ছড়া কাটত। কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর আসত ছড়ায়। এই ছড়াগুলি আপন মন থেকে উৎসারিত হত। কিন্তু নিতান্ত মেয়েলী ছড়া বা ছেলেভুলানে ছড়া হিসাবে সেগুলি সাহিত্যের আসরে অপাংক্তেয় ছিল বহুকাল।

হারিয়ে যাওয়া এইসব জাতীয় সম্পদকে রক্ষা করতে এবং ছড়াগুলির জীবনরস ও সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনিই গ্রামবাংলার ধূলো, বালি, মাটিমাখা ছড়ানো ছিটানো অনাদৃত গ্রাম্য ছড়াগুলি সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যের সম্ভ্রান্ত দরবারে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর রচনা করেছেন—'ছেলেভুলানো ছড়া-১' ও 'ছেলেভুলানো ছড়া-২'-এর মতো স্মরণীয় প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের একটি স্মরণীয় ছড়া—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান/শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।"[৭] যা রবীন্দ্রনাথের শুধু নবীন শিশুমনকে মাতিয়ে তোলেনি বরং আপামর সমস্ত শিশুমনকেই মাতিয়ে তুলে ছিল। আর "নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে /বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।।"[৮] এই সব ছড়ার টুকরো টুকরো ছবি, বল্গাবিহীন কল্পনা শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই বরং কোন শকের কোন তারিখে কোনটি রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নের কাহারো মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্ব রচিত হইলেও নূতন।[৯]

অবশ্য ছড়ার এই ছবিগুলিকে রবীন্দ্রনাথ 'ঝাঁক বাঁধা পাখির' উপমা দিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেমন ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন অবনীন্দ্রনাথসহ ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদের এ কাজে উৎসাহিত করে।।

প্রায় ৮১টি ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীকেও বলেছিলেন বাংলাদেশের লোককথা উপকথা সংগ্রহ করতে। আমরা অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছি রূপকথার অমর সৃষ্টি 'ক্ষীরের পুতুল'। কিন্তু সেটি অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহ নয়, মৃণালিনী দেবীর সংগ্রহ। অবনীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—কাকীমা ঠিক যেমন করে গল্পটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি করেই তিনি লিখেছেন। তাই বলা যেতে পারে, অবনীন্দ্রনাথের রূপকথার হাতে খড়ি মৃণালিনী দেবীর কাছেই। তাছাড়া 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'ক্ষীরের পুতুল'-এর রচনাভঙ্গি যেন ছড়াই। ছড়া শব্দের অস্তিত্ব আগে ছিল না। আগে ছিল শ্লোক। কোথাও তা সিকলি/ছিকলি আবার কোথাও শোলোক—"মা গো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই?"[১০] এখানে শোলোক অর্থ ছড়া। রবীন্দ্রনাথ যেমন উপকথার স্থলে রূপকথা ব্যবহার করেন তেমনি হয়তো ছড়ার ক্ষেত্রেও হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বে 'সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকা, 'ভারতী', 'সাধনা', 'প্রবাসী' পত্রিকার

অবদান অবিস্মরণীয়। বিশেষ করে যোগীন্দ্রনাথের 'খুকুমনির ছড়া' বিশেষ জনপ্রিয় ছিল—"আটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল/শ্যামলা গেল হাটে;/শ্যামলাদের মেয়ে দুটি/পথে বসে কাঁদে।"[১১] এই সব ছড়া শুধু শিশুদের নয় বড়োদের মনকেও কাছে এবং সকল গবেষকদের কাছেও বড়োই রুচিকার এক প্রিয় প্রসঙ্গ। বাঙালির সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ছড়া মধ্যে হয়েছে। সমস্ত বিষয় ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ব্রত অনুষ্ঠান, ছেলেভুলানো, মন্ত্র-তন্ত্রে-যাদুতে, কর্মজীবনে, ধর্মজীবনে, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নৈসর্গিক প্রভৃতি বিষয়কে ব্যক্ত করতে ছড়ার রীতি গৃহীত হয়। তাছাড়া ধাঁধা, প্রবাদ, লোকগান, লোককথা সবার সঙ্গে ছড়ার নিবিড় বন্ধন। প্রথমে প্রবাদের কথা বলি—প্রবাদগুলি প্রায় ছড়ার আকারে ব্যক্ত—"পিরীত যখন জোটে ফুটকলাই ফোটে/পিরীত যখন ছোটে ঢেঁকিতে ফেলে কোটে।"[১২] ধাঁধা বা হেঁয়ালীর সঙ্গেও ছড়ার গভীর অন্তরঙ্গতা দেখা যায়। পূর্বে বিয়ে বাড়িতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে ছড়ার গান আকারে ধাঁধার ব্যবহৃত হত। যেমন বাঁশ গাছ সম্পর্কে— আংটা আংটা আংটা/ছোটোতে কাপড় পরে বড়তে নেংটা।"[১৩]

লোকসংগীতের স্তরে স্তরে ছড়ার সুরই ব্যক্ত হয়েছে। ভাদু, টুসু (তুষু/তোষলা) ঝুমুর গান মূলত ছড়াই। এইসব গানে শব্দ ও সুরের মিলনে ছড়ার সৌন্দর্য ও রস পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—"আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝমঝম করে গো/উয়ার টুসু হতভাগী আঁচল পেতে মাগে গো।"[১৪] পাঁচালীর কাঠামোতে ও থাকে গান ও ছড়া। পাঁচালী সম্পর্কে বলা হয়—"খানিক তার রাগরাগিনী আর খানিক তার মুখজবানী।" এই মুখজবানী হল ছড়া। কবিগানও ছড়ার সুরেই বাঁধা। পটুয়াদের গান, জারি গান, সারি গান সবই আসলে ছড়াই কাঠামো।

বাংলার ঘরে ঘরে ঐহিক কামনা করে যে মঙ্গল অনুষ্ঠান চলে বিভিন্ন ঋতুতে সেই ব্রতকথাও আসলে ছড়ার সুরেই বাঁধা। সেঁজুতি ব্রতে—"ময়না ময়না ময়না/সতীন যেন হয় না।/হাতা হাতা হাতা/খাঁ সতীনের মাথা।।[১৫] এছাড়া গ্রামবাংলার বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে ভাঁড় সেজে 'সঙ' হয়ে যে ছড়া কাটত তা ছড়ারই একটি দিক। এছাড়াও মনসার ঝাঁপান, মৈমনসিংহ-গীতিকা, গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি রচনাও স্থানবিশেষে ছড়াময়। আর খনা বচন, ডাকের বচন কৃষিকাজ সম্পর্কিত এক ধরনের ছড়া। কালিদাস রায় রামপ্রসাদের শাক্ত সংগীতের মধ্যেও ছড়ার রীতির আভাস দেখেছেন।

শুধু লোকসাহিত্যে নয়, শিষ্ট সাহিত্যেও ছড়ার অবাধ প্রবেশ লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেমন রয়েছে তেমনটি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ছন্দ ও ভঙ্গি আসলে ছড়াই। ছড়াকার রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পেয়েছি 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' অমর ছড়ার গদ্যরূপ। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই' ছড়ার মহাকাব্য। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের 'খুকু ও কাঠবেড়ালী', অন্নদাশঙ্কর রায়ের উড়কি ধানের মুড়কি 'সাত ভাই চম্পা' ইত্যাদি রচনা ছড়ারই সংকলন। তাঁর বিখ্যাত ছড়া-তেলের শিশি ভাঙলে পরে/খুকুর পরে রাগ কর/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ কর।/তার বেলা।[১৫] বুদ্ধদেব বসুর রচনায় ছড়ার সঙ্গে রূপকথা আলৌকিকতা মিশে আছে—"রং মশালের সম্পাদকের চম্পাবরণ কন্যা/ঘর করেছেন আলো/সমস্ত তার ভালো/দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরেতে ঘুমোন না।"[১৬] প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও ছড়ার রঙ লেগেছে—"তলোয়ারটা তাড়াতাড়ি খুলতে গেল বীর/খালি হাতল খুলে এল তাইতো চক্ষুস্থির।"[১৭] সুনির্মল বসুর ছড়া বিস্ময়ে পরিপূর্ণ—"কালকে রাতে তালতলাতে গলাফোলা এক বুড়ি/গাছের থেকে খাচ্ছে পেড়ে গরম গরম মুড়ি।"[১৮] শঙ্খ ঘোষের ছড়া বাস্তব মানুষের জীবনযন্ত্রণা ফুটে উঠেছে—"যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে/যমুনা

তার বাসর রচে বারুদ বুকে নিয়ে—"[১৯] একই রকম ভাবে বীরেন্দ্র দত্ত, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কবিতায় ছড়ার ছন্দ ও আঙ্গিক খুঁজে পাওয়া যায়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়ার রূপকথার অনুসঙ্গ ধরা পড়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া জাতীয় কবিতায় সংগ্রামী ভাবনা ও বিপ্লব, বিদ্রোহের বাণীর উচ্চারিত হয়েছে—"এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর/তার উপর বসে আছে সিপাহী বিস্তর।"[২০] বিষ্ণু দে'র রচনায়— "লাল জুতুয়া পায়ে বেড়ায় হাত দুটো যা দুলে/ধেঁই ধেঁই সে ছুটে বেড়ায় আবার ওঠে কোলে।"[২১] এইভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে স্মরণজীৎ চক্রবর্তীর সাহিত্যে ছড়ার ধারা বহমান। বাংলা সাহিত্যে ছড়ার প্রাসঙ্গিকতা আজ বর্তমান। আদি কাল থেকে শুরু করে আজও আধুনিক কবিরা তাদের ছড়া রচনায় সমৃদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন। অবশ্য বর্তমান সময়ে আবাল বৃদ্ধবণিতা সকলের হাতে মোবাইল ফোনে শিশুর শৈশবের সেই আনন্দ ও ছড়ার সাম্রাজ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। ছড়াগুলি শিশুদের মনে নির্মল রস প্রদান করত কিন্তু মেবাইল তাদের যান্ত্রিক করে তুলছে। একদিন কি ছড়ার এই বিশাল আনন্দের পাঠ শেষ হয়ে যাবে! এইখানেই আমার কথাটি ফুরাল...নটে গাছটি মুড়ালো।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিচিত্র সংগীত সংকলন', ৪৮নং রচনাকাল ১৯১১
২. লোকমুখে প্রচলিত ছড়া
৩. তদেব
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ছেলেভুলানো ছড়া-১', "সাধনা", ১৩০১
৫. প্রচলিত ছড়া
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ছেলেভুলানো ছড়া-২', "সাহিত্য পরিষৎ" পত্রিকা ১৩০১
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ছেলেভুলানো ছড়া-১', "সাধনা", ১৩০১
৮. তদেব
৯. তদেব
১০. যতীন্দ্র মোহন বাগচী : 'কাজলা দিদি' কবিতা
১১. যোগীন্দ্র নাথ সরকার : 'খুকুমণির ছড়া' ১৩০৬
১২. নির্মলেন্দু ভৌমিক : 'বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা'
১৩. তদেব
১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯
১৫. অন্নদাশঙ্কর রায় : 'খুকু ও খোকা'
১৬. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সরল দে সম্পাদিত : 'ছোটোদের ৫০০ কবিতা', ২০০৬
১৭. তদেব, ১৮. তদেব, ১৯. তদেব, ২০. তদেব, ২১. তদেব

তথ্যের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯
২. নির্মলেন্দু ভৌমিক : 'বাংলা লোকসাহিত্যেচর্চার ইতিহাস', ১৯৭৮
৩. আশরাখ সিদ্দিক : 'লোকসাহিত্য', প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪
৪. মানস মজুদার : 'লোকসাহিত্য—পাঠ', প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯
৫. ভৌমিক নির্মলেন্দু : 'বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা'

ব্রতকথা : নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে

অর্জুন কুমার দাস

'ব্রত' কথাটির সাধারণ অর্থ হল 'নিয়ম'। যা আমার চাহিদা বা আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি তা পূরণের জন্য লোকসমাজ মূলত নারীরা যে অনুষ্ঠান বা নিয়ম পালন করে তাকে বলে ব্রত। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—"কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।"[১] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সংজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়ে সার্বিকভাবে ব্রতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্য এক সমালোচক লিখেছেন—

> সংহত লোকসমাজ থেকে উদ্ভূত, বিশেষভাবে কোন ঐহিক কামনা পূরণার্থে, লৌকিক দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে যে লৌকিক অনুষ্ঠান মূলত নারীদের দ্বারা পালন করা হয় তাকেই বলে ব্রত।[২]

নারী তার সমাজ জীবনে মনের কামনা-বাসনার কথাই প্রকাশ করে ব্রতের মাধ্যমে। তাই স্বামী-সন্তান-সংসার-পরিজন; কোদালকাটা ধন, দরবার আলো বেটা, ঘর আলো জামাই, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গোরু ইত্যাদি মনের চাহিদা থেকেই জন্ম নিয়েছে মাঘমণ্ডল, ভাদুলি, অশ্বত্থপাতা, পুণ্যিপুকুর, সেঁজুতি, বসুধারা, তোষলা নামক ব্রতের। উদাহরণ হিসেবে আমরা তোষলা ব্রতের কামনার কথা তুলে ধরতে পারি—

> কোদাল-কাটা ধন পাব,/গোহাল-আলো গোরু পাব,/দরবার-আলো বেটা পাবো,/সভা-আলো জামাই পাব,/সেঁজ আলো ঝি পাব,/আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব।/ঘর করব নগরে,/মরব গিয়ে সাগরে,/জন্মাব উত্তম কুলে,/তোমার কাছে মাগি এই বর/স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।[৩]

কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাঙালি তার দৈনন্দিন জীবনে একঘেয়েমি কাটানোর জন্য প্রতি মাসে নতুনত্বের রস আস্বাদনের জন্য নানা আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঋতু পরিবর্তনের ফলে বঙ্গ প্রকৃতির সাথে সাথে বাঙালি সমাজে ও মননে যে রং লাগে তারই বহিঃপ্রকাশ এই আচার অনুষ্ঠান।

এদের মধ্যে ব্রত অন্যতম। এই ব্রতগুলিকে আমরা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করি শাস্ত্রীয় ব্রত বা পৌরাণিক ব্রত এবং অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি বা লৌকিক ব্রত। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা পুষ্ট, সেখানে আছে শাস্ত্রের নানা বিধি-বিধান সামান্যকাণ্ড, ভুজ্জি উৎসর্গ, ব্রাহ্মণকে দান ও দক্ষিণা এবং সবশেষে ব্রতকথা শ্রবণ। ব্রতকথা শাস্ত্রীয় তথা পৌরাণিক ব্রতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু লৌকিক বা অশাস্ত্রীয় ব্রতের এত আড়ম্বর নেই। সেখানে না আছে কোনো সংস্কৃত মন্ত্র, না আছে পুরোহিতদের সংস্কৃত শ্লোক ও ক্রিয়াকর্ম। ব্রতিনীরা নিজেদের মনস্কামনার কথা নিজেরাই বলতে চেয়েছে তাদের উপাস্য দেবতাকে। এই ব্রতগুলির কোনোটার 'কথা' আছে, কোনোটার বা নেই। ক্রিয়াকর্ম ও উপাচারের দিক থেকেও এগুলি আড়ম্বরহীন, অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত। আসলে পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে নারী মনস্তত্ত্বের কথাই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ব্রতগুলিতে।

ব্রতের প্রধান চারটি অঙ্গ কামনা, ক্রিয়া, ছড়া ও ব্রতকথা। ব্রতকথা হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস। সাধারণভাবে বলা যায় লোককথার যে বিশেষ ভাগটিতে ব্রত পালনের শেষে সেই ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাহিনি শোনানোর রেওয়াজ তাকেই বলে ব্রতকথা। ব্রতকথায় নির্দিষ্ট ব্রতের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। মেয়েলি ব্রতের মতো ব্রতকথাগুলিও একান্তভাবে বঙ্গাললনাদের সৃষ্টি। তারাই ব্রতকথাগুলির কথক ও শ্রোতা। অবনীন্দ্রনাথের অনুকরণীয় ভাষায় বললে দাঁড়ায়—"এ অনেকটা ক্রিয়াকর্ম শেষ করে গল্পগুজব করা গ্রামের পাঁচজনে মিলে।"[৪]

অন্যান্য ব্রতীরাও মূল ব্রতীর চারপাশে বসে হাতে ফুল নিয়ে ভক্তিমতিচিত্তে ব্রতকথা শোনে। ব্রতের কাহিনি অনুযায়ী ব্রতকথা শ্রবণে ব্রতীর মনে কখনো ভক্তি, কখনো ভয়, কখনো বা বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে। ব্রতকথা শেষ হলে ঈপ্সিত বর কামনা করে ভক্তি ভরে ব্রতের দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানানো হয়। এই ঈপ্সিত কামনা অনুযায়ী গড়ে ওঠে ব্রতকথাগুলি। ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়ে বঙ্গারমণীদের গল্প শোনার আগ্রহ যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি লক্ষ করা যায় গল্প রচনায় তাদের পটুত্বও। এই গল্পগুলিতে নানান বিশ্বাস-সংস্কার কিংবা ট্যাবু-টোটেমেরও পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রের মধ্যে মানুষ, দেবতা, পশুপাখি ছাড়াও প্রকৃতির বর্ণনা লক্ষ করা যায়। মানব চরিত্রগুলির বর্ণনায় বিশেষ কোনো বৈচিত্রের সন্ধান মেলে না। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের প্রতীক রূপে বিশেষ এক একটি চরিত্র্যই সেখানে নির্দেশিত—

> সৌভাগ্যের চিত্র নির্দশে করিতে হইলে কথার প্রধান চরিত্র হইবেন রাজা কিংবা সদাগর এবং দুর্ভাগ্যের চিত্র নির্দশে করিতে হইলে তাহার প্রধান চরিত্র হইবে বামুন। এক বামুন কথা দুইটির সঙ্গে দারিদ্র্য কথাটি জড়িত; বামুন হইলেই বুঝিতে হইবে তিনি দরিদ্র, এমন কি ভিক্ষুক। কোন কোন ব্রতকথা 'এক ভিক্ষাসুর (ভিক্ষুক) বামুন' দিয়াই আরম্ভ হয়। রাজা, সদাগর, বামুন ব্যতীত কদাচিৎ আরও একটি চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় যেমন এক বুড়ী; বুড়ীও সাধারণতঃ দুর্ভাগ্যেরই অধিকারিণী, পরে বিশেষ কোনও দেব কিংবা দেবীর অনুগ্রহ লাভ কবিয়া সৌভাগ্যের অধিকারিণীও হইতে পারেন।[৫]

ব্রতকথাগুলিতে মানুষ ও দেবতা, স্বর্গ ও মর্তের নিবিড় সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে। এগুলিতে যে গল্পের উপাদান রয়েছে তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো ব্রতাদির মন্ত্রধর্মী ছড়া এবং ব্রতকথাগুলিতে কাব্য-নাট্য-উপন্যাস এবং শিল্পের বীজ পর্যন্ত অঙ্কুরিত হতে দেখেছেন। ব্রতকথায় রূপকথার মতো নিয়তি এবং ভাগ্যের স্থানও রয়েছে। বিশেষ বিশেষ দেব বা দেবীকে

তুষ্ট করতে পারলে সুখের সন্ধান মেলে, নয়তো জীবনাকাশে নেমে আসে অশেষ দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য গুলিতে সুচারু ভাবে এর প্রতিফলন ঘটেছে। প্রায় সব ব্রতকথাই শুরু হয় একটি অভাববোধের মধ্য দিয়ে। নায়ক বা নায়িকার অভাব কিংবা কষ্টের বর্ণনা দিয়েই শুরু হয় ব্রতকথা। তারপর তারা স্বপ্নে বা চোখের সামনে কোনো দেব বা দেবীর দর্শন পান, দর্শন পেতে পারেন কোনো দৈবানুগৃহীত ব্যক্তিরও, যারা তাদের দুঃখ দুর্দশা ঘোচানোর জন্য ব্রত পালনের নির্দেশ দেন। ব্রতপালনের পর নায়ক বা নায়িকা ধীরে ধীরে তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পান এবং বিপুল সুখের অধিকারিণী হন। তাদের দেখে অন্য নারীরাও ঐ ব্রতপালনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। লোককথায় যেমন কতকগুলি সাধারণ মোটিফ রয়েছে, তেমনি তা ব্রতকথার মধ্যেও বিদ্যমান। মোটিফের দিক থেকে রূপকথার সঙ্গে ব্রতকথার অনেক মিল দেখা যায়। ব্রতকথার কাহিনিগুলি যেন রূপকথাধর্মী। কেউ কেউ ব্রতকথাগুলিকে বলতে চেয়েছেন 'বয়স্কদের রূপকথা'। ব্যবহারিক প্রয়োজনে রূপকথাগুলিই যেন ব্রতকথায় পরিণতি লাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সঙ্কটার ব্রতকথা'র উল্লেখ করেছেন কোনো কোনো সমালোচক। তা বলে রূপকথা ও ব্রতকথা যে অভিন্ন তা নয়। ড. শীলা বসাক লিখেছেন—

> রূপকথার সঙ্গে ব্রতকথার মিলও যেমন আছে, আবার কিছু পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল যে রূপকথাতে দৈব উপস্থিতি নেই, কিন্তু ব্রতকথা দৈব উপস্থিতি ছাড়া হয় না। তাই রূপকথা ধর্মনিরপেক্ষ, ব্রতকথা দৈবমাহাত্ম্য নির্ভর। রূপকথার রাজা-রানি, রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-দৈত্যের পরিবর্তে ব্রতকথায় স্থান পায় সাধারণ মানুষ। রূপকথায় মিলনাত্মক পরিণতিকে মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু ব্রতকথাতে প্রয়োজন ও প্রচারই শেষ কথা। গল্প শোনার আগ্রহ মেটানো বা অবসর বিনোদন হল রূপকথার কাজ, আর ব্রতকথার কাজ হল গার্হস্থ্য কর্তব্যসাধন। যেসব অসম্ভব বিষয় রূপকথায় স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে থাকে, ব্রতকথায় সেক্ষেত্রে দেবতার হস্তক্ষেপের উল্লেখ থাকে।[৬]

ব্রতকথাগুলি সমাজ-ইতিহাসেরও দর্পণ। বহু ব্রতের কথায় আমরা তখনকার বহুবিবাহ প্রথা, সতীনবিদ্বেষ (সেঁজুতি ব্রত), নারীর বহু সন্তানকামনার প্রত্যাশা (বনদুর্গা/চাপড়া-ষষ্ঠীর ব্রতকথা) প্রভৃতির প্রসঙ্গ পাই, এছাড়াও পাই ঝাড়ফুক-তুকতাক-তন্ত্রমন্ত্র-যাদুবিদ্যায় তখনকার মানুষের আস্থা কতখানি ছিল তার পরিচয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে যে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর ব্রতকথা শুনিয়েছেন তা থেকে একালের গবেষক অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত আবিষ্কার করেছেন তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বণিককে অর্থসাহায্য করা হত।

ব্রতকথাগুলি বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যায় সেগুলি শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক হয়ে ওঠেনি। কাহিনির মাঝে মাঝে যে ক্লাইমেক্স কিংবা সাসপেন্স রয়েছে তাও অনবদ্য। অনেক 'কথা'য় উপকাহিনিও যুক্ত হয়েছে। মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা যেমন এতে আছে তেমনি বাতলে দেওয়া হয়েছে তা থেকে উত্তরণের পথও। ব্রতকথাগুলি গদ্যে ও পদ্যে দু'ভাবেই রচিত হয়েছে। 'দেবতা' ব্রতকথায় মুখ্য হলেও শেষপর্যন্ত মানবজীবনই প্রধান হয়ে উঠেছে। ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন—

> ব্রতকথার মধ্যে মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষারই বিকাশ দেখা যায়। পার্থিব বিষয় আশ্রয় করেই ব্রতকথার বাসনা এবং কামনা ব্যক্ত হয়ে থাকে। সেজন্যে এর মধ্যে অলৌকিকতার, রহস্যময়তার যতই স্পর্শ থাকুক না কেন, এগুলি সাহিত্যগুণ থেকে বঞ্চিত নয়।...এগুলি নিছক আনুষ্ঠানিক

> পূজার মন্ত্র হয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়েনি। সমাজের গার্হস্থ্য পারিবারিক জীবনের নিখুঁত পরিচয় ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বলে এগুলিকে আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক যুক্ত বলেই মনে হয়।[৭]

ব্রতকথায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বঙ্গাললনাদের স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি। মা হয়ে ওঠার এই প্রস্তুতিপর্ব চলে বাল্যকাল থেকেই, কুমারী ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে যার সূচনা। কুমারী ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে কিশোরীরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে তাদের আগামী দিনের ভাবী সংসার, সন্তান ও স্বামীর। সংসার ও সন্তানের মঙ্গালকামনায় তাই কত না ব্রতের আয়োজন ! ব্রতচারিণী এই মাতৃমূর্তিটির সন্ধান পেতে আমাদের পড়তে হবে প্রয়াত অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা সাহিত্যে মা' নামক গ্রন্থটি। তিনি লিখেছেন—

> ব্রতের মা যেন মাটির বুকে প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী। স্বর্গের আশির্বাদ এনে তিনি সন্তানের মাথায় রাখেন। দুঃখের ব্রত জননীর। ব্রতের ফলভোগী সন্তান ও সংসার। ব্রতের জননী তাই ক্লিষ্টা অথচ কল্যাণী, দুঃখে খিন্না অথচ শুচিস্মিতা যেন দগ্ধ প্রদীপের স্বর্ণশিখা।[৮]

অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথায় আপাতভাবে ষষ্ঠীর মহিমা প্রচারিত হলেও সন্তান স্নেহ কীভাবে সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনল, নিরাকুল ব্রতের কথায় রানি কীভাবে সন্তান লাভে সমর্থ হলেন সেসব কথাই বর্ণিত হয়েছে। 'হাতে পো কাঁখে পো' নিয়েই বঙ্গারমণীর জীবনের সার্থকতা। বিভিন্ন ব্রতে ও ব্রতের ছড়ায় বাংলার গৃহবধূদের সেই মাতৃমূর্তিই উদ্ভাসিত। ব্রতপালনের সময় সন্তানকামনার আকুলতায় নারীর চেতন এবং অবচেতনসত্তা যে একাকার হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। এক্ষেত্রে কুমারী, বিবাহিতা, এমনকি বন্ধ্যা নারীও একাসনে অধিষ্ঠিত। বৈশাখে দশপুত্তল ব্রতের ছড়ায় কুমারীদেরও 'কুন্তীর ন্যায় পুত্রবতী হব' বলতে শোনা যায়। বৈশাখে কুমারীদের হরিরচরণ ব্রত পালনের ছড়ায় সুখের মৃত্যু এই বলে কামনা করা হয়েছে—

> এক গলা গঙ্গাজলে, শুক্ল মল্লিকার ফুলে।
> মরণ হয় যেন সোয়ামী পুত্রের কোলে।।

একসময় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের কঠোর সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে অন্তঃপুরে বসবাস করতে হত। ইচ্ছে করলেই তারা বাইরে বেরোতে পারত না। একঘেয়ে পারিবারিক জীবনে অবসর বিনোদনের জন্য অনেক সময় ব্রত পালনের পর নিজের মনের চিন্তা-ভাবনাকে আশ্রয় করে নারীরা ইষ্ট দেবতার ব্রত করলে যে সমাজ ও পরিবারের কল্যাণ হয়, সেই কথাকে ব্রতকথাগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রসঙ্গাক্রমে সুহাসিনী দেবীর 'মেয়েলি ব্রতকথা' গ্রন্থের 'দক্ষিন্দর পূজা'র ব্রতকথাটি স্মরণ করা যেতে পারে। এই ব্রতকথায় দেখি এক রাজা ও পদ্মাবতী নামে তার এক মেয়ে ছিল। রাজা একদিন রাজ্যের সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলত তোমরা সকলে কার কপালে খাও ? সকলেই এক বাক্যে রাজার দয়ায় খেতে পায় বলে জানালেও, তার নিজের মেয়ে পদ্মাবতী বলে, "আমি নিজের কপালে খাই বাবা।" এই কথা শুনে রাজা ভয়ানক রাগে মেয়েকে বললেন, "আমি কাল সকালে সবার আগে যার মুখ দেখব তার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।" সকালে উঠে রাজা দোরগোড়ায় এক কাঠুরেকে দেখে তাকে ডেকে নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাদের বনে যাওয়ার আদেশ দিলেন। রাজার আদেশে কাঠুরে ও পদ্মাবতী বনে গিয়ে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় আশ্রয় নিল। দিনের বেলায় দু'জনে বনের কাঠ কাটে। কাঠুরে সেই

কাঠ গ্রামে গিয়ে বিক্রি করে যা আয় করে তাই দিয়ে দু'জনের অন্নের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে অনেকদিন কেটে গেল। একদিন তারা শুনতে পেল কোথায় যেন কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। তারা ভাবল নিশ্চয়ই কোথাও লোকালয় আছে। পদ্মাবতী কাঠুরেকে সেখানে পাঠাল। কাঠুরে ফিরে এসে জানায় লোকেরা দক্ষিন্দর পুজো করছে এবং এই পুজো করলে চোর, ডাকাত, বাঘ, ভাল্লুকের ভয় থাকে না। এই কথা শুনে পদ্মাবতী খই, মুড়কি, বাতাসা, দই কিনে কাঠুরেকে পাঠালো পুজো দিতে। কাঠুরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে খুব খিদে পেলে প্রসাদ গালে নিয়ে দেখে প্রসাদ খুব শক্ত। সোনালী ঢেলার মতো প্রসাদ। কাঠুরে থু থু করে করে ফেলে দিতে লাগল। বাড়ি এসে পদ্মাবতীকে প্রসাদ দিল এবং জানাল যে এ প্রসাদ এত শক্ত যে খাওয়া যায় না। পদ্মাবতী সব শুনে প্রসাদের পালিটা ঈশান কোণে পুঁতে অন্য একটা পালি নিয়ে বললে, কোথায় পুজো হচ্ছে নিয়ে চল। কাঠুরে তাকে নিয়ে চলল, পথে পদ্মাবতী কাঠুরের ফেলা সোনা (প্রসাদ) পালিতে তুলতে লাগল। অবশেষে পুজোর স্থানে উপস্থিত হয়ে পদ্মাবতী ঠাকুরকে প্রণাম করল এবং বুঝতে পারল মা লক্ষ্মীর দয়া হয়েছে তাদের ওপর। অবশেষে সেই সোনা বিক্রি করে পদ্মাবতী প্রকাণ্ড বাড়ি বানাল। বনের ভেতরে জায়গাটার নাম দিল কাঠুরে পদ্মাবতীর রাজ্য। এইভাবে দক্ষিন্দরের পুজো করে সুখে বাস করতে লাগল তারা।

এদিকে লক্ষ্মীর দয়াতে পদ্মাবতীর বাপের পদ্মাবতীর কথা মনে পড়ল। রাজা ভাবলেন মেয়েটার কতদিন খবর নেওয়া হয়নি। হয়তো এতদিনে বনের মধ্যে মারা পড়েছে। তবুও একবার খোঁজ নেওয়া যাক। এই বলে বনের মধ্যে পদ্মাবতীর খোঁজে বেরোলেন। কিন্তু বন খুঁজে পেলেন না। কারণ পদ্মাবতী সেখানে নগর বসিয়েছে। অবশেষে, কাঠুরে পদ্মাবতীর রাজ্য নাম শুনে বহু চেষ্টা করে রাজা তার কন্যা পদ্মাবতীকে খুঁজে পেলেন। পদ্মাবতীকে চিনতে পেরে রাজা কাঁদতে লাগলেন। আর বললেন, "মা তুই যে কথা বলেছিলি সেই যথার্থ কথা।" আর অন্যান্যরা সবাই আমাকে তোষামোদ করেছিল। এত বড় রাজা হয়েও আমি যা বুঝতে পারিনি তুই তা বুঝেছিস। তুই আমাকে যথার্থ জ্ঞান দিলি অথচ তোকে আমি কত অত্যাচার করেছি। এখন মা তুই আমাকে বল কী করে তোর এত লক্ষ্মী লাভ হল পদ্মাবতী বাবাকে সমস্ত ঘটনা বলল। রাজা শুনে অবাক হলেন। পদ্মাবতী বললে বাবা এবার তোমার রাজ্যে এই ব্রত পূজা প্রচার কর। রাজা পদ্মাবতীকে রাজদরবারে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু পদ্মাবতী যেতে চাইল না। রাজা ফিরে গিয়ে নিজের রাজ্যে দক্ষিন্দর পুজো ব্রতের প্রচলন করলেন।"[৯]

আলোচ্য এই ব্রতকথায় আমরা দেখব অন্তঃপুরবাসিনী নারী তথা পদ্মাবতী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বাবা তথা রাজার আদেশকে অমান্য করতে পারেনি। রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করাতে পদ্মাবতীকে তার পিতা কাঠুরের সঙ্গে বিয়ে দেন। শুধু বিয়ে নয়, শাস্তিস্বরূপ পদ্মাবতী ও তার স্বামীকে বনে পাঠান। নিরুপায় পদ্মাবতী বাবার সব আদেশ মেনে নিয়ে বনে কাঠ কেটে লোকালয়ে তা বিক্রি করে জীবন অতিবাহিত করে। অবশেষে দক্ষিন্দরের কৃপায় তার লক্ষ্মী লাভ হয়। পদ্মাবতীর দুঃখ মোচন হয়। আসলে পদ্মাবতীর মতো বাঙালি মেয়েরা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নিজের মনের প্রতিবাদকে এই ব্রতকথায় তুলে ধরেছে। সমাজব্যবস্থার চাপে নিজের শক্তি না থাকলেও ঈপ্সিত কামনাকে বাস্তবায়িত করতে ইষ্ট দেবতার ব্রত পুজো করে তাই পদ্মাবতী, যে বাবা তাকে পরিত্যাগ করেছিল, তাকে বনবাসে দিয়েছিল সেই বাবাকে সে তার

কাছে আসতে বাধ্য করেছে। বাধ্য করেছে, সে যাতে আবার রাজবাড়িতে যায় সেই অনুরোধ তার বাবাকে করাতে। কিন্তু পদ্মাবতী আর ফিরতে চায় না কারণ নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও কাঠুরে রাজাকে নিয়ে সে সুখে আছে। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বঙ্গনারীর মনের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য ব্রতকথায়। শুধু উপরিউক্ত ব্রতকথা নয়, প্রায় সব মেয়েলি ব্রতকথাগুলিতেই নারী মনস্তত্ত্বের কিছু না কিছু উপাদান আছেই।

উৎসের সন্ধানে

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বাংলার ব্রত', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, সংখ্যা ৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৫
২. সৌগত চট্টোপাধ্যায় : 'বাংলার ব্রত এবং অবনীন্দ্রনাথ', সংস্করণ ২০০৪, পৃ. ৮
৩. উৎস-১, পৃ. ৩৩
৪. তদেব : পৃ. ১৫
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য : 'বাংলার লোক-সাহিত্য', পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ৪৩৯
৬. শীলা বসাক : 'বাংলার ব্রতপার্বণ', তৃতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৬১
৭. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান', প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, ক্যালকাটা পাবলিকেশনস, কলকাতা, পৃ. ২৯
৮. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী : 'বাংলা সাহিত্যে মা', প্রথম প্রকাশ, অগ্রাহায়ণ ১৩৬৭, নভেম্বর ১৯৬০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১০
৯. সুহাসিনী দেবী : 'মেয়েলি ব্রতকথা', দ্বিতীয় প্রকাশ, রথযাত্রা, ১৪১২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৩৭-৩৯

রাঢ়ের প্রবাদ দর্পণে ভাষার আনুষঙ্গিকতা

অর্পিতা চৌধুরী

লোকসাহিত্যের পরিমন্ডলে ছড়া, ধাঁধা, কথার মত প্রবাদ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও সাবলীল সমাজ মনস্তাত্ত্বিকতার প্রতিফলক। প্রবাদ লোকসাহিত্যের একমাত্র শাখা যার মাধ্যমে সমাজের ত্রুটিমূলক দিকগুলি অল্প কথাতেই পরিব্যপ্ত হয়। তীক্ষ্ণতা, সংক্ষিপ্ততা অথচ অভিজ্ঞতার গভীরতা প্রবাদের মূল কাঠামো। অঞ্চলভিত্তিক প্রবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হল ঘটনাগত ও বিষয়গত সাযুজ্য থাকলেও আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্য প্রবাদগুলিকে অনেকাংশে বিষয়গত না হলেও আঙ্গিকগতভাবে স্বতন্ত্র করেছে। তাই আমাদের আলোচ্য বিষয় রাঢ়ের প্রবাদে ভাষার প্রভাব সম্বন্ধে যাওয়ার আগে রাঢ় বঙ্গের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাব—প্রাগার্য কাল থেকে রাঢ়ভূমি ছিল এক দুর্গম গহীন দেশ। জঙ্গালাকীর্ণ রাঢ় ভূমির বসবাসকারী সন্তান ছিল অনার্য আদিবাসী গোষ্ঠী। কোল, ভিল, মুন্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া, ওঁরাও, শবর, খেড়িয়া, মাহালী, ভূমিজ, মুন্ডা, কোড়া, বাউরী, ডোম, হাঁড়ি, খয়রা, কুর্মী প্রভৃতি অরণ্যচারী আদিম অধিবাসীদের বাসস্থান ছিল এই রাঢ় অঞ্চল। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীমঙ্গাল, চৈতন্যভাগবত, এমনকী ধর্মমঙ্গাল কাব্যে রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে মূলত প্রোটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর মানুষজন বসবাস করতো যাদের অনার্য বা আদিবাসী বলে সম্বোধন করা হতো। আদিবাসী ভাষায় 'রৌঢ়' শব্দের অর্থ পাথর বা পাথরের নুড়ি আর 'দিশম' অর্থ দেশ। অর্থাৎ নুড়ি পাথরের দেশ নামে প্রাগার্যকাল থেকেই এই অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল। একসময় শূদ্রদের রাঢ় নামে অভিহিত করা হোত। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কালকেতুকে 'রাঢ়' নামে অভিহিত করা। প্রাচীন রাঢ় ছিল প্রধানত দু ভাগে বিভক্ত—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিন রাঢ়। সুকুমার সেনের মতে অজয় ও দামোদরের উত্তরে উত্তর রাঢ়; অজয়ের পূর্বে ও দামোদরের দক্ষিনে ও পূর্বে দুপাশে দক্ষিন রাঢ়।[১]

সাধারণভাবে বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চল বলতে এক বিস্তৃত অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায় যার উত্তরে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী সীমা দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা পূর্বে বর্ধমান ও হুগলির আরামবাগ মহকুমা থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়া সীমান্ত অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ বাদে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ সমেত বিহার ও উড়িষ্যার সংলগ্ন অংশগুলি নিয়ে বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চল ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বিচারে এই বৃহৎ ভূখণ্ডকে পূর্বরাঢ় এবং পশ্চিমরাঢ় দুভাগে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে পশ্চিম রাঢ় হল বৃহত্তর রাঢ়ের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ বাঁকুড়া পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলার সমগ্র অংশ বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা এবং মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা। অবশিষ্ট অংশ পূর্বরাঢ়। এই পশ্চিমরাঢ় হল প্রধানত লাল কাঁকুরে মাটির দেশ। আমাদের আলোচনা স্থল হল এই পশ্চিম রাঢ় অংশের দক্ষিন বাঁকুড়া অঞ্চল।

ভৌগৌলিক পরিমন্ডল : মূল শহর অঞ্চল বাদ দিলে দক্ষিণ বাঁকুড়ার অংশ বিশেষত খাতড়া, অম্বিকানগর, রাইপুর, সিমলাপাল, সারেঙ্গা, রানীবাঁধ, ঝিলিমিলি অঞ্চলগুলি এখনো তাদের মানভূম ও ঝাড়খন্ডী উপভাষার মিশ্রনের ভাষাগত রীতি বৈশিষ্ট্য বহন করে। ফলে এই ভাষাকে তুচ্ছার্থে বা স্বতন্ত্র করার উদ্দেশ্যে বাঁকড়ি ভাষাও বলা হয়ে থাকে। তবে রাঢ়ীয় ভাষা বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রিত হয়নি বলে এটি শহুরে মানুষের কাছে প্রথাগতভাবে মার্জিত মনে না হলেও এর প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সবসময় গবেষকদের আকৃষ্ট করেছে। বাঁকুড়ার ৬৮টি জাতির মধ্যে বহু আঞ্চলিক উপভাষা (বাঁকড়ি) ব্যবহৃত হয়ে আসছে এ অঞ্চলে।

সাঁওতালী ও অন্যান্য জনজাতির নিজস্ব ভাষা এ অঞ্চলের ভাষাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। প্রায় ছশো বছরের অধিকাংশ পূর্বের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা আজও বেঁচে আছে এ অঞ্চলে।

সাঁওতালী ভাষা	অর্থ
গড়	প্রনাম
কাড়া	মহিষ
ডিঙ্গা	পা বাড়িয়ে অতিক্রম করা
কুমা	ঝুপড়ি ঘর
জিরান	বিশ্রাম
পারাংগত	পরিত্রান
পুষ	পৌষ[২]

এরকম বহু বহু শব্দ এখনো মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে, নির্দ্বিধায় তারা সেগুলি দৈনন্দিন জীবন চর্যায় ব্যবহার করেন। এ অঞ্চলের শব্দ, প্রবাদ, ছড়া, গান, কবিতার মধ্যে কথ্য উপভাষাগুলি মণিমুক্তো হয়ে ছড়িয়ে আছে গ্রামে গ্রামে। এই উপভাষাগুলি ভাষাবিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ, এই নিরিখে দক্ষিণ বাঁকুড়াকে লোকসংস্কৃতির স্বর্ণ খনি বলা হয়ে থাকে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তার 'শব্দ কথা' গ্রন্থে লিখেছেন—

> ভাষাবিজ্ঞানের নিকট গ্রাম্য ভাষা হইতে ভাষার মূল প্রকৃতি ও ভাষার সহিত জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যত সহজে বোঝা যায় সাধু ভাষা হইতে তেমন হয় না। এইজন্য গ্রাম্য slang শব্দের সংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন এই সংগ্রহ কার্যে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

অর্থাৎ এ থেকে বুঝতে পারি লোক জীবনের গভীরে প্রবেশ করার সঠিক পথই হল আঞ্চলিক

উপভাষা। পশ্চিম রাঢ়ের প্রবাদ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় ভাষা বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। মূলভাষার থেকে বিষয়গত বিভিন্নতা বিশেষ না থাকলেও এর প্রকাশ ভঙ্গিমা, তীক্ষ্ণতা, ব্যঙ্গাত্মক বাচন, শ্লেষ সর্বোপরি আঞ্চলিক ভাষা চয়ন অনেক সময় মার্জিত কানে বিসদৃশ ঠেকলেও তা জীবন অভিজ্ঞতা ও মনের ভাব প্রকাশের সহজাত উপায়। এই অঞ্চল মূলত জঙ্গল আর চাষবাসের উপর নির্ভরশীল, জাতপাতের বিধিনিষেধ, আত্মীয়স্বজন পরিবৃত সেইসব ছোটোখাটো বৃত্তিয় জীবনাচরণের সামগ্রিক পরিচর্যা হল প্রবাদ। পশ্চিম রাঢ়ের প্রবাদগুলিকে বোঝার সুবিধার্থে এখানে বিভাজনের প্রয়াস নিলাম—

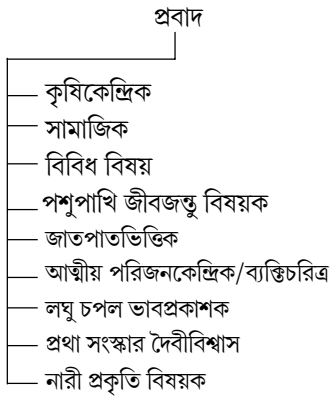

❖ কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ

রাঢ় অঞ্চলের উষরতায়, রুক্ষ লাল অনুর্বর মাটিতে সারাবছর চাষ প্রায় অসম্ভব। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে সারাবছর চাষের নির্ভর করতে হয়। তাই বর্ষার সময় ছাড়া প্রায় সারা বছরই তড়া (ডাঙ্গা) জমি পড়ে থাকে শস্যহীন হয়ে। আজন্ম প্রকৃতি লালিত, প্রকৃতি পালিত রাঢ়ের মানুষ তাই কৃষিকেন্দ্রিক রীতিনীতি মেনে চলে এবং মনে রাখার জন্য সতর্কমূলক প্রবাদগুলির সৃষ্টি করেছে।

১. কপাল টলে রোহিনী টলে নাই : রোহিনী নক্ষত্রে বীজ বপন করলে তা কখনোই ব্যর্থ হয় না। জৈষ্ঠ মাসে রোহিনী নক্ষত্র ধরে চাষীরা বীজ বপন করে। এই প্রয়োজনীয় লগ্নটিকে মনে রাখার জন্য প্রবাদটির উপস্থাপনা।

২. অমাবস্যা পূন্নিমায় যে ধরে হাল তার দুখ্যু চিরকাল : অমাবস্যা পূর্ণিমায় হলকর্ষণ নিষিদ্ধ।

৩. শাবনে পূব্যা দেখ তাই বলদ বিকে কিন গাই : নিরক্ষর অথচ প্রকৃতিপাঠে পরম্পরাগত শিক্ষায় অভিজ্ঞ চাষী জানে শ্রাবন মাসে পূবদিক থেকে বাতাস বইলে ভারী বর্ষনের সম্ভাবনা কম, অল্প বৃষ্টিতে ঘাস ভালো হবে, ধানগাছ নয়। তাই চাষের বলদকে অহেতুক না বসিয়ে রেখে বিক্রি করে দিয়ে গাই গরু কেনার কথা বলা হয়েছে, যা থেকে দুধ পাওয়া যাবে।

৪. শাবণের পূরা ভাদরের বার এর মধ্যে যত পারো : শ্রাবণমাসের ভরা বর্ষায় পুরো মাস, ভাদ্র মাসের বারো তারিখ পর্যন্ত যতখুশি ধান রোপণ করা চলে। এতে ফলন ভালো হয়।

৫. কুঁড়্যা গরুর আইঢ় অংঠন : অলস গরু কৃষিকাজে অনুপযুক্ত।

৬. শিং সরু ল্যাজ মটা/এমন গরু কিনিস না ব্যাটা : যে বলদের সরু সিং লেজ মোটা সেই বলদ লাঙ্গাল টানার অনুপযোগী।

৭. অঙা গুনে পঙা/গাছ গুনে ঝিঙা : যেমন বীজ তেমন তার চারা।

৮. ভূতমুড়ি ধানে আসনলয়া : ভূতমুড়ি একরনের মোটা কালো দেশি চাল আর আসনলয়া সুন্দর সরু সুগন্ধী চাল, এক্ষেত্রে সুন্দরী ফরসা মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন সবাই যদি কালো হয়, সেক্ষেত্রে প্রবাদটি প্রচলিত।

৯. আঁতে পুতে চাষ : চাষের কাজে ঘরের সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

১০. খেইটা লইটা আড়াইয়া/সইন্ লা বারোমাস : খেটে ও নটে শাক অল্পদিনের কিন্তু সজনে শাক বারোমাস নিম্নবিত্তের ভরসা।

১১. ভাদর পিতা বলদ/আঘন পিতা মরদ : ভাদ্রে বলদের, অঘ্রানে পুরুষের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১২. মকরে পানি টিকরে ধান : মকর সংক্রান্তির দিন বৃষ্টি অনুর্বর জমিতেও ভালো ফলন দেয়।

১৩. শুনা কথা বুনা ধান/আধেক আগড়া আধেক ধান : অন্যের থেকে শোনা কথার যেমন দাম নেই তেমনি অনুর্বর জমিতে ফসলের ফলনের পরিমাণও কম হয়। আগড়া অর্থ ভুয়া।

❖ **জাতপাতভিত্তিক প্রবাদ**

১. অভ্যাস না ছাড়ে চোরে/ঠুঁটা হাতেও সিঁদ করে : প্রবৃত্তির পরিবর্তন সহজে হয় না।

২. আবর তাঁতি গোরুর খায়/মাগের কথায় মাইরতে যায় : তাঁতীদের বোকামি সম্বন্ধীয় প্রবাদ সমাজে প্রচলিত আছে।

৩. কল, কুড়মি, কড়া/ বেদবিধি ছাড়া : কোল, কুড়মি এবং কোড়া জাতিভুক্ত মানুষেরা বৈদিক বিধিবিধান মানে না, সেই কথাই প্রবাদটিতে বলা হয়ে থাকে।

৪. কুড়মির মাড়, উৎকলের তাল/শুঁড়ি-তামলির মুড়ির থাল : প্রচলিত জীবনযাপন সম্বন্ধীয় প্রবাদটিতে সুন্দরভাবে তিন জাতির খাদ্য বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

৫. গঙ্গার ঘাট নাই/বইষ্টমের জাত নাই : বোষ্টম জাতির প্রতি ব্যাঙ্গার্থে প্রবাদটি রচিত হয়েছে।

৬. ভূমিজ গেল রাগে/কুড়মি গেল ভাগে : ভূমিজরা একটুতেই রেগে গিয়ে কাজ পন্ড করে, আর কুড়মিরা নিজেদের মধ্যে বিভাজন নীতির জন্য দুরবস্থার শিকার হয়।[৮]

❖ **ব্যক্তিচরিত্র ভিত্তিক প্রবাদ**

১. গুড় খাল্যে যেমন জলকে টানে/ব্যুনের তেমনি ভাইকে টান্যে : ভাইবোনে আত্মিকতা বোঝাতে অতি সহজ উপমা ব্যবহার করেছে লোকসমাজ।

২. অপযস্যা লোকের খরখস্যা নাম লো : যার বদনাম আছে তার নামটাও অমসৃন বা অমঙ্গল

৩. ছেল্যা লয় পিল্যা/ইহা উয়ার ঘঁড়া রোগ/পাড়ার লোকের বিথাই শোক : সন্তানের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটের ভিতর পিলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাজানো শখের অসুখে শোক বা সহানুভূতি দেখানো বৃথা।

৪. কেষ্ট বিষ্টুর দেশ সেবা/ঠুঁটা হাতে জনসেবা : সমাজ চিটিংবাজ সমাজসেবী তে ভরে গেছে, এরা কাজ করতে পারে না শুধু অক্ষমের আস্ফালন করে।

৫. উদমা মরদের ঘর করা/গলায় কলসী ডুবে মরা : উদমা অর্থ ফালতু। মরদ > স্বামী কর্মহীন অলস স্বামীর সঙ্গে সংসার করার সমস্যার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত জনসমাজ বা নিম্নবিত্ত সমাজের পুরুষেরা বেশিরভাগ সময় আড্ডা দিয়ে, মদ খেয়ে, বৌ পিটিয়ে সময় কাটায়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কোনো নারীন্ট্রে এই প্রবাদটির উৎপত্তি বলে মনে হয়।

৬. আমার ঘরে খাইচ্ছ্যে দাইচ্ছ্যে/পরের ঘরে মকমকাচ্ছে : এ যেন কতকটা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো বিষয়।

❖ **লঘুচপল ভাবপ্রকাশক প্রবাদ সমূহ**

১. খাবেক নাই চাটবেক : ভালো রান্নার প্রসঙ্গে এবং যে ব্যক্তিকে দেওয়া হবে তার পছন্দ অপছন্দ বোঝাতে ব্যাঙ্গার্থে প্রবাদটি তৈরী হয়েছে।

২. ব্যাটা ছায়ের মুতে কড়ি : পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা যতই স্বামীর অকর্মন্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলুক শাশুড়ির বা বয়োজ্যোষ্ঠদের প্রশ্রয় থাকতো কিন্তু ঘরের বাউন্ডুলে ছেলেটির প্রতি যথেষ্ট সমাদর থাকত।

৩. ঘাস কাটা কঠিন কাম/টসকি টসকি পড়ে ঘাম : দরিদ্র লোকজীবন চাষবাসে নির্ভরশীল, গাই বলদের জীবন, তাই গরু চরানো, লাঙ্গাল দেওয়া, ঘাস কাটার মত পরিশ্রম সাধ্য কাজ এদের দৈনন্দিন জীবন কর্ম। এখানে ঝাড়খন্ডি উপভাষার বৈশিষ্ট্যে কাজ > কাম-এ রূপান্তরিত হয়েছে। টস্‌টস করে ঘাম গড়িয়ে পড়াকে টসকি টসকি অনুষঙ্গের মধ্যে একটি চিত্রধর্মীতার সৃষ্টি হয়েছে।

৪. শিখলি কুথায়/না ঠকলম যুথায় : খুব সহজ কথায় জটিল দর্শনের প্রকাশ। ঠকা থেকেই শেখার অর্থাৎ না ঠকার বিদ্যা আয়ত্ত করতে শুরু করে মানুষ।

৫. হাড়ে বাসাত লাগে লালায় জল যায়/ভুলুকে তালি : বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে বাতাস > বাসাত এর অর্থ এর অতি সহজ অর্থ হল অপ্রয়োজনে প্রচুর অর্থ খরচ হয় অথচ প্রয়োজনীয় খরচ বন্ধ করা হয়।

৬. চোক কান বুইজ্যে/পরের ছেঁদা খুঁইজ্যে : আমাদের আশেপাশের অনেক মানুষ থাকেন যারা নিজেদের সমস্যা বা ত্রুটির সমাধান না করে অন্যের বাড়ির ত্রুটি বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

৭. রঁহে সঁহে খা/লুকাই ছুপায় জমা : লোকসমাজ খুব স্পষ্টবাদী, তাদের হারাবার কিছু নেই, তারা সে আশাও বিশেষ করে না, এজন্য তাদের যে আক্ষেপ আছে তাও নেই। তাই তাদের মধ্যে অতি সহজেই সহজ ভাবে সমাজের নেতা মন্ত্রীদের কার্যকলাপ বা টাকাপয়সা লুঠের গল্প পরিস্কার ভাবে উঠে আসে এইসব প্রবাদের মধ্যে দিয়ে।

৮. ঠারে ঠুরে উনিশ বিশ : অর্থাৎ কেউ ভালো নয় এই অর্থে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। দুজন মানুষের চরিত্রের তারতম্য বোঝাতে এরকম প্রবাদ গ্রাম বাংলায় প্রচলিত। অর্থাৎ একজনকে আরেকজনের চেয়ে ভালো মনে হলেও দুজনেই চরিত্রগতভাবে সমান।

❖ **প্রথাসংস্কার/দৈবী বিশ্বাস সংস্কার বিষয়ক**

১. দিতে থুতে নাই শক্তি/পেস্যাদ খাত্যে দমে ভক্তি : কাজকর্ম করার বালাই নেই অথচ ফললাভের বেলায় ভক্তির চোটে পাহাড় উলটানো ব্যাপার। দমে শব্দটি এসেছে বেদম > দম > দমে।

২. ভরাল্লে আ-ভরা ভালো/যদি ভরাইতে যায় : গ্রামবংলার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কোনো শুভ কাজ করতে যাওয়ার সময় গ্রামের মেয়ে বউরা কলসি নিয়ে জল আনতে যাওয়ার দৃশ্য চোখে পড়লে সেই কার্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে শুভ কাজে বেরোবার মুহূর্তে এই দৃশ্য কার্যকে সফল করে বলে মানুষের ধারণা।

৩. লি-সাথির ভগমান সাথি : যার কেউ নেই তার ভগবান আছে এই বিশ্বাসে সরল মানুষগুলো জীবন তরনীর ভার অদেখা ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে নির্বিবাদে বংশ পরম্পরায় জীবনধারন করতে থাকে।

৪. যা থাকে কপালে তা হবেক সকালে : টেনশন বা চিন্তা করে যে কার্য সমাধান সম্ভব নয় অথবা দৌড়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয় তাই ব্যতিব্যস্ত না হয়ে সেই জায়গায় অবস্থান করা উচিত, যা হবে সকালে উঠে দেখা যাবে যেহেতু এসব অঞ্চলগুলি জঙ্গলে ছিল যোগাযোগ প্রায় ছিল না, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলি অন্ধকারে ঢেকে যেত, বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত

সকাল না হওয়া পর্যন্ত বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ অসম্ভব ছিল। এই কারণেই হয়তো প্রবাদটি তৈরি হয়েছিল।

❖ **নারী চরিত্র বিষয়ক**

১. ঘর জ্বালানী/পর ভালানি : ঘরে কোনো কাজ না করলেও বাইরের লোকের কাছে যে নারী অত্যন্ত সুশীলা তার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি করা হয়ে থাকে।

২. চালুনির পোঁদ ঝরঝর করে চালুনি সুঁচের বিচার করে : নিজের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে লোকের বাড়ির হাল হাকিকত জানে এবং সেই কথা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে সেইসব ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়।

৩. দুই সতীনের ঘরকইন্যা শাশুড়িবুড়ি ভাত পায় না : বাংলাদেশে সতীন সমস্যা যে বিদ্যমান ছিল তা তা এই প্রবাদটি থেকে বুঝতে পারি। দুই সতীনের কোন্দলের ফলে বয়স্ক শাশুড়ি সারাদিন খেতে পায় না অথবা দুজনের রেষারেষির ফলে কে আদৌ ভাত দেবে সেই ভাগাভাগিতে বয়স্ক শাশুড়ি মাতা ভাত পায় না এ এক জীবন্ত জ্বলন্ত সমস্যার উদাহরণ যা ঘরে ধরে অনেক সংসারেই দেখা যেত।[৫]

বিবিধ বিষয়ক প্রবাদ

❖ **জীবজন্তু বিষয়ক :**

১. খেদে ক্যাকলাশ গায়ে তোলা : ক্যাকলাস হল গিরগিটি শ্রেণির, এই গিরগিটিগুলি প্রয়োজনে রং বদলাতে পারে সেগুলিকে ক্যাকলাস বলা হয়। এখানে প্রবাদটির অর্থ হল অপরের দায়ভার বা কার্যভার নিজে থেকে গায়ে নেওয়া বা দায়িত্ব নেওয়া। অথবা যেচে দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না : একেবারে শেষ মুহূর্তে কার্য সমাধান করার জন্য দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তখনই মানুষ তার সমাধান করতে পারে না। এটাই মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এটিকে বিড়ালের গাছে ওঠার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বিড়াল যেমন তারা না খেলে গাছে ওঠে না। সেই রকম একেবারে শেষ মুহূর্ত ছাড়া কাজ শেষ হয় না।

৩. কাড়া মরে হদে/ মানুষ মরে মদে : সামাজিক অবক্ষয় বোঝাতে প্রবাদটির উপমাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নবর্গীয় রাঢ়বঙ্গের মানুষের হাতে পয়সা কড়ি না থাকলেও দৈনন্দিন জীবনে নেশা করা একটি প্রতিদিনের কাজ। যার জন্য সমাজে এত সমস্যা এই কারণেই উক্ত প্রবাদটির উৎপত্তি ঘটেছে।

৪. ছাগল বিয়ায়/শিয়ালে খায় : একের পরিশ্রমের ফল অন্যের ভোগ করা অর্থে এরকম প্রবাদ রাঢ় বঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ার চল আছে।

❖ **লারি আর পারি মুহে কেনে হারি**

এরকম বিভিন্ন বিষয়-আশয়কে আশ্রয় করে মুখে মুখে রোজকার জীবনে প্রবাদগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমজীবি মানুষ। সমাজের ত্রুটিগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এর জন্য এরা লজ্জিত নয় বরং প্রবাদের মধ্যে দিয়ে সমাজকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। প্রবাদ হল লোকসাহিত্যের সেই ফসল যার মধ্যে তীক্ষ্ণতা, ব্যঙ্গ ও নারী মনস্তত্ত্বের অন্তর্লীন তীর্যকতা প্রকাশ পায়। প্রবাদ হল লোক সমাজের জীবন্ত মনস্তত্ত্ব, যার মধ্যে দিয়ে নিম্নবৃত্তীয় শ্রমজীবি মানুষের দৈনন্দিন জীবন বৃত্তান্ত অতি পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত হয়।

উৎসের সন্ধানে

১. শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'লোকায়ত পশ্চিমরাঢ়', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প্রকাশ জুন ২০০৭, পৃ. ২-৬
২. অমলেন্দু মন্ডল প্রকাশ সম্পাদিত : 'বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি একাডেমি বাঁকুড়া ভাবনা', ১৩ এপ্রিল ২০১৮ পৃ. ৮-১২
৩. উৎস-১, পৃ. ১৮৮
৪. তদেব
৫. তদেব

তথ্যের সন্ধানে

১. অরুণাভ চট্টোপাধ্যায় : 'সাহিত্য সংস্কৃতি', প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১২
২. বাবুলাল মাহাতো, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, কাঁসাই কুমারী, প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪
৩. বিনয় মাহাতো : 'লোকায়ত ঝাড়খণ্ড', প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
৪. ত্রিপুরা বসু : 'লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্ত', প্রকাশ ১৬ জুন ১৯৮৯
৫. শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'লোকায়ত পশ্চিম রাঢ়', প্রকাশ জুন ২০০৭
৬. গৌতম কুমার মন্ডল : 'লোকমন', প্রকাশ-সেপ্টেম্বর ২০১১
৭. সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কংসাবতী উপত্যকা', সভ্যতা সংস্কৃতি প্রকাশ ২০১৯
৮. সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় পরিক্রমা', প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬
৯. সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রবন্ধ মালা ২, প্রকাশ-২০১৯
১০. সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ সরকার, রাঢ় প্রবন্ধ মালা-৩, প্রকাশ ২০২৩
১১. স্বামী জিতেন্দ্রিয়ানন্দ : 'শব্দ মাধুরী', প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২১

সহায়ক পত্রিকা

১. শ্রী অমলেন্দু মন্ডল : 'বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি একাডেমি বাঁকুড়া ভাবনা', প্রকাশ, ১৩ এপ্রিল ২০১৮
২. শৈলেন দাস, ধনপতি সামন্ত সম্পাদিত : 'বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি একাডেমি', ছড়া প্রবাদ সংখ্যা, প্রকাশ ১৪০১
৩. অমৃত লাল পাড়ুই : 'গ্রামোন্নয়ন কথা', প্রকাশ এপ্রিল জুন ২০০৭
৪. তরণী পাত্র সম্পাদিত : 'লাল ডহর', প্রকাশ ২০১২
৫. শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'লালডহর', প্রকাশ ২০১৩
৬. শ্রমিক সেন : 'ছত্রাক', প্রকাশ-ডিসেম্বর ২০১৫
৭. অচিন্ত্য জানা সম্পাদিত : 'রাঢ় একাডেমি', লোকায়ত, প্রকাশ জুন ১৯৯৩
৮. শ্যাম দাস সম্পাদিত : 'বাঁকড়ি', প্রকাশ ২০১৮
৯. শ্যাম দাস সম্পাদিত : 'বাঁকড়ি', প্রকাশ ২০১৯

কৃতজ্ঞতা

১. শ্রী সুকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাঁকুড়া
২. শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, খাতড়া, বাঁকুড়া
৩. শ্রী চিত্ত দাস, ঝিলিমিলি, বাঁকুড়া
৪. শ্রীমতি বুলু পাল, খাতড়া, বাঁকুড়া

বাংলা প্রবাদ ও ট্যাবুর পরম্পরায় স্বচ্ছতা করোনা অতিমারির অভিজ্ঞতা

পর্ণা মণ্ডল

গ্রামবাংলায় মারি আর মড়ক ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় বলেছেন—"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি।"[১] অর্থাৎ অতিমারির অভিজ্ঞতা বাঙালির ক্ষেত্রে নতুন নয়। দৈব-দুর্বিপাকে ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালি তখন আস্থা রেখেছে প্রবাদ-প্রবচন ও ট্যাবুতে। অস্বচ্ছ, অপরিচ্ছন্ন, সংস্কারবদ্ধ গ্রামবাংলায় বহুযুগ আগে এক নারী জন্মেছিলেন, যিনি পারিবারিক পুরুষতন্ত্রকে উপেক্ষা করেও তাঁর বচনের মাধ্যমে পাড়া-প্রতিবেশী, স্বজন—বন্ধুদের সামাজিক সচেতনতার দায় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আলজিভ ছিন্ন করা হলেও একুশ শতকের অতিমারির সংকটে তাঁর কয়েকটি বচন অবশ্যই স্মর্তব্য—

আলো-হাওয়া বাঁধো না,
রোগে ভোগে মরো না।[২]

ঘরকে আবদ্ধ না রেখে আলো-হাওয়া চলাচলের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রটি একুশ শতকের করোনা অতিমারির যুগেও প্রাসঙ্গিক। এই সময় স্বচ্ছতার গুরুত্ব সীমাহীন। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অর্থে পরিচ্ছন্নতা; যা স্বাস্থ্যবিধির প্রাথমিক শর্ত—

জ্বরো-ভিটার তোলে ঘর
যে আসে তারই জ্বর।।[৩]

অপরিচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে স্থানে গৃহনির্মাণ করলে তা সুস্বাস্থ্যের প্রতিকূল। তাই পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে গৃহের সঠিক অবস্থান বিশেষ জরুরী।

পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে পরম্পরাসূত্রে লোকশিক্ষক প্রবাদ নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। পদ্যের আকারে প্রবাদগুলি জনমানসে সঞ্চারিত ও সচেতনতা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। প্রবাদে যেহেতু সুদীর্ঘ সমাজ-অভিজ্ঞতার ছবি

প্রতিফলিত হয়, তাই প্রবাদের বিষয়বৈচিত্র্যও কম নয়। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে এই প্রবন্ধে প্রবাদের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও স্বাস্থ্যনীতি করোনা পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা কল্পনা করা যায়। স্বাস্থ্যসচেতনতা যথা নিজস্বস্বচ্ছতা ও জনস্বচ্ছতাকেন্দ্রিক সচেতনতাবৃদ্ধির জন্যে প্রবাদের মতো মিশ্র এবং তীক্ষ্ণ বৈদগ্ধ্যময় ভাবনা অথচ সহজ-সরল ভাষায় কাব্যিক প্রকাশ বিশেষ কার্যকারী হবে। যেমন অন্ত্যমিলযুক্ত সত্যতাজ্ঞাপক এই বাক্যগুলিই হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের প্রবাদ স্থানীয়—"বারেবারে হাত ধোবে সাবানে,/করোনা দেবেনা থাবা জীবনে।" অথবা, "নাক রাখো মুখ রাখো মাস্কের আড়ালে,/রোখা যাবে করোনা কালো হাত বাড়ালে।" অথবা, "তিনফুট দূরে থাকো, অন্যের থেকে,/ফিরে যাবে করোনা, তোমায় ডেকে ডেকে।"

করোনা অতিমারির যুগে পোস্টারের আকারে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে এমন জনসচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করলে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে এবং সময়ের স্রোতে এগুলিই হয়ে উঠবে নতুন স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক প্রবাদ। অতিমারির করাল আক্রমণ বিশ্ববাসীর জীবন প্রতি মুহূর্তে ঠেলে দিয়েছে চরম সঙ্কটের দিকে। তাই রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ থেকে সচেতনতা একান্ত জরুরী। তাই এই সূত্রে স্বচ্ছতার সচেতনতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে প্রবাদের মতো প্রয়োগ করা যেতে পারে ট্যাবু (Taboo)। "সারা পৃথিবীর নানা Taboo-র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রিয়াশীলতা দেখে দু'টি 'contary directions' এ একে রেখায়িত করা যেতে পারে, ধরতে পারি তার অর্থবোধক সত্তাকেও।

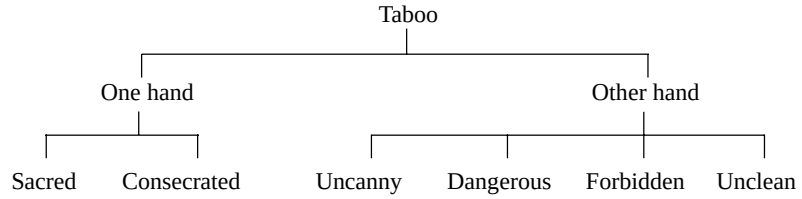

পলিশিয়ান Taboo শব্দের আর এক অর্থ হিসাবে ধরা হয়েছে 'noa' শব্দকে, যার অর্থ 'common on generally accessible.'[৪]

ট্যাবু হল নিষেধজনিত লোকবিশ্বাস। করোনাকালে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এমন নিষেধ ছিল প্রতি মুহূর্তে। W.H.O (World Health Organisation) প্রতি মুহূর্তে নির্দেশিকা দিয়ে চলেছিল নিত্যনতুন গবেষণার প্রেক্ষিতে। যেমন—মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না, হাত অন্ততঃ কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেন্ড না ধুয়ে কোনো খাদ্যগ্রহণ চলবেনা, স্যানিটাইজার ছাড়া বাইরে বেরোনো চলবে না, কোনো জনসমাবেশ করা চলবে না, জ্বর-সর্দি-কাশি-স্বাদ-গন্ধ হ্রাস ইত্যাদি উপসর্গ হলে অবহেলা করে কোভিড পরীক্ষা না করালে চলবে না, হাঁচি বা কাশির সময় মাস্ক কোনোক্রমেই খোলা যাবে না, বাইরে থেকে ঘরে ফিরে গরম জলে গার্গেল না করে কোনো খাদ্যগ্রহণ করা চলবে না, বাইরের পোশাক ভাইরাসনাশক ও গরম জলে পরিষ্কার না করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না, টীকাকরণ অগ্রাহ্য করা চলবে না ইত্যাদি। এই বিধিনিষেধগুলিকে সহজেই লোকসংস্কৃতির আদিম এক ধারা ট্যাবুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ ট্যাবু কেবলমাত্র কুসংস্কার নয়, তা উদ্ভবের পশ্চাতে আছে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। দিদিমা, ঠাকুমারা তাঁদের সময়কালে

করোনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তাঁদের সময় এবং তাঁদের পূর্বপ্রজন্মের যুগ থেকে বলা হয়—সন্তান জন্মের পর শুভ অশৌচ পালনের কথা। এই ট্যাবুর কারণও বৈজ্ঞানিক। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে, মা ও সন্তানকে সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে এবং বলা যায় সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে এই ট্যাবু। করোনাকালে এই ট্যাবুটি আরও প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। করোনাকালে গর্ভবতী নারীর গর্ভাবস্থা থেকে আরম্ভ করে প্রসবকালীন ও প্রসবপরবর্তী সমাজ নির্দেশিত ট্যাবুগুলির মান্যতা একান্ত জরুরী। তাই কালের স্রোতে ও পরিস্থিতিসাপেক্ষে ট্যাবু প্রয়োগ জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিশেষ এক হাতিয়ার—"শরীর মাধ্যম, /খলু ধর্ম—সাধনম।"[৫]

সংস্কৃত হলেও বাংলায় এই প্রবাদটি বহুল প্রচলিত। সর্বাগ্রে শরীর রক্ষা করতে হবে, তারপর ধর্ম-কর্ম। তাই শরীর রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রধান কর্তব্য প্রত্যেকের। জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদে এই অতিমারির সচেতনতা বদলায় না। স্বচ্ছতা বিশ্ববাসী তথা মানব সমাজের প্রত্যেকের জন্য সত্য।

২০২০ সালের পূর্বে যখন 'করোনা' শব্দটির সঙ্গে ভারতবাসী বিশেষ পরিচিত ছিল না, তখন গুরুজনেরা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মান্য করতে শেখাতেন সন্তানদের। পাঠ্যসূচির অন্তর্গত স্বাস্থ্যবিধিও তাৎপর্যের সঙ্গে পাঠ করানো হত। অবশ্যই এর প্রায়োগিক ক্ষেত্রের প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্বপূর্ণ। তখন সাধারণভাবে খাওয়ার আগে ভালোভাবে হাত ধুতে হয়, হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢাকতে হয়, নিয়মিত নখ কাটতে হয়, দীর্ঘকালীন কাটা ফল বা আঢাকা খাবার খেতে নেই, যথাস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করতে হয় ইত্যাদি আরও অনেক স্বাস্থ্যনীতির শিক্ষাদান করা হয়েছে। এখন সময় বদলেছে। পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে আরও সঙ্গীন। তাই এইজাতীয় স্বাস্থ্যবিধিও হয়ে উঠেছে আরও কঠোর। করোনা অতিমারির যুগ দীর্ঘকালীন সামাজিক বহু ধারনাকে বদলে দিয়েছে এক লাহমায়। যেমন, এর আগে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতাবোধসম্পন্ন মানুষকে সমাজ চিহ্নিত করত 'শুচিবায়ুগ্রস্ত' রূপে অর্থাৎ শুচিতা-রক্ষায় অতিরিক্ত মনোযোগপূর্ণ বাতিক বা রোগজর্জরিত হিসাবে। অথচ, মানবসভ্যতার প্রহসন—আজ বিশ্ববাসীকে সত্যিই অতিমারি মোকাবিলায় শুচিতা রক্ষার দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে।

সমাজ-পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখতে যুগে যুগে এগিয়ে আসে সমাজবন্ধু 'মেথর' শ্রেণি। আজ করোনাকাল প্রমাণ করে দেয় সমাজ নির্দেশিত শুধুমাত্র নিম্নবর্গ একদল মানুষই পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখার দায়বদ্ধতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। এই দায়বদ্ধতা আমার-আপনার আর সকলের, বিশ্ববাসীর প্রত্যেকের। তাই আমরা প্রত্যেকেই সেই অর্থে নিজস্বচ্ছতা ও জনস্বচ্ছতা বজায় রাখতে 'মেথর'।

> নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজলে!/নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ;/আর তুমি? তুমি তাকে করেছ নির্মল।/এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে—/কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।[৬]

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেও মানসিক দূরত্ব না রেখে একুশ শতকীয় অতিমারির দাপট থেকে রক্ষা পাওয়ার এক ও অনন্যপথ স্বচ্ছতার সচেতনতা। কারণ স্বচ্ছতা অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতাই সুস্থতার মাপকাঠি। বিশেষতঃ সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে তা অধিকতর সত্য। স্বচ্ছতার প্রায়োগিক ক্ষেত্রের সফলতা আনতে তাই, মাধ্যম হিসাবে পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা প্রবাদ ও ট্যাবুর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে অনুসরণ করে তার নবীকরণ সম্ভব। ঐতিহ্যকে সম্মান করে এবং সময়োপযোগী স্বীকৃতি দিয়ে অতিমারির যুগে স্বচ্ছতার প্রাসঙ্গিকতাকে যুক্তিপূর্ণভাবে সম্প্রচারিত করা সম্ভব জনমানসে। খনা

বলে গেছেন—"চৈতে কুয়া, ভাদরে বান,/সেই বৎসর নরমুন্ড গড়াগড়ি যান।"[৭] ঋতুর অস্বাভাবিকতা মড়কের আশঙ্কা বয়ে নিয়ে আসে। করোনা অতিমারিও শীতে প্রকোপ বৃদ্ধি করতে পারে অথবা গরমে প্রকোপ কমাতে পারে ইত্যাদি সম্ভাবনা নিয়ে চলছে। তবে করোনা অতিমারি পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে নিজের ভালো যাচাই করে, পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে থাকতে হবে সদাসর্বদা সজাগ। খনার ভাষায়—"ছায়া ভালো ছাতার তল,/বল ভালো নিজের বল।"[৮]

উৎসের সন্ধানে

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : 'আমরা', শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ৯৪
২. মোহাম্মদ হানীফ পাঠান : 'বাংলা প্রবাদ পরিচিতি', প্রথম খণ্ড, অবসর, বাংলাদেশ, প্রথম অবসর প্রকাশ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪০
৩. তদেব : পৃ. ৪০
৪. সুফল বিশ্বাস : 'ট্যাবু', 'লোকমনন লোকসাহিত্য : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১৪, পৃ. ২৪৬
৫. উৎস-২, পৃ. ৩৯
৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : 'মেথর', শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ৯৪
৭. উৎস-২, পৃ. ৩৪৪
৮. তদেব : পৃ. ৩৪৪

বিশ্বায়ন ও লোকক্রীড়া : সংকটের প্রশ্নে লোকক্রীড়া ডাংগুলি

সার্থক লাহা

লোকসংস্কৃতি শুধুমাত্র রোমান্টিক আবেগ-সর্বস্ব সংস্কৃতি বিলাসির অবসর বিনোদনের বিষয়মাত্র নয়, লোকসংস্কৃতি সমাজ-বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে একটি অধিতব্য বিষয়। ঐতিহাসিক বিবর্তন বোঝার জন্য লোকসংস্কৃতি একটি অন্যতম উপাদান। লোকসংস্কৃতি নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেকে গবেষণা করেছেন। Falklare শব্দটি প্রথম উদ্ভাসিত হয় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের অ্যাথিনিয়ম পত্রে। পুরোনো স্যাকসন শব্দ 'Folk' (যার আত্মীয় জার্মান শব্দ 'Volk', বাংলায় যা 'লোক' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ওলন্দাজি শব্দ 'Lore' (যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Learning') অর্থাৎ বিদ্যা।[১] লোকসাহিত্য, লোকযান, লোকশ্রুতি, লোককৃতি, লোকগান, লোকনাচ, লোকনাট্যের মতোই লোকক্রীড়া সভ্যতার আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমাজব্যবস্থার চিত্র প্রতিবম্বন করে। লোকক্রীড়া শব্দবন্ধটির সাথে খুব বেশি পরিচিতি সাধারণের মধ্যে না থাকলেও ইতিহাসের আঙ্গিকে এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে লোকক্রীড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকক্রীড়া সম্পর্কে 'লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধানে' বলা হয়েছে—

> যেসব খেলার নিয়মকানুন কোনো গ্রন্থে লেখা নেই, যেসব খেলা বিনা উপকরণে কিংবা সামান্য উপকরণে অনুষ্ঠিত হয়, যেসব খেলার জন্য তেমনভাবে অনুশীলন করতে হয় না। সেগুলিই হল লোকক্রীড়া।[২]

অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী লোকক্রীড়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> আঞ্চলিকতার পরিচয়-বিশিষ্ট, সহজলভ্য উপকরণ নির্ভর অথবা উপকরনবিহীন, ছড়াসম্পৃক্ত অথবা ছড়াবিহীন, ঐতিহ্যানুসারী ক্রীড়া নমনীয় গৃহ্যাভ্যন্তরে অথবা প্রকৃতির উন্ন সান্নিধ্যে অনুষ্ঠেয়তব্য, সাধারণভাবে যে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারীদের নিবিড় অনুশীলন অথবা শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন হয় না, যাতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে ছেলে, মেয়ে কিংবা উভয় লিঙ্গের খেলোয়াড়ের দৈহিক পুষ্টি অথবা বুদ্ধিবৃত্তির

অনুশীলন হয়, যা আপাতভাবে গুরুত্বহীন অথবা সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় যে খেলায় জীবনের অনুকৃতি কিংবা ফেলে আসা অতীত জীবনচর্চার পুনরাভিনয় লক্ষিত হয়, যাতে আমাদের আর্থ সামাজিক ইতিহাসের প্রত্নাবশেষের সন্ধান লভ্য, তাই হল লোকক্রীড়া।[৩] গবেষক অসীম দাস লোকক্রীড়ার সাথে পরিশীলিত বা শিষ্ট ক্রীড়ার পার্থক্য রূপায়ন করেছেন। তিনি লোকক্রীড়া সম্পর্কে বলেছেন—

> ফুটবল-ক্রিকেট-ব্যাডমিন্টন-টেনিস-ভলি প্রভৃতি ক্রীড়াগুলি আমাদের দেশের বিভিন্ন সমাজে একই নিয়মনীতিতে খেলা হয়, এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর রূপরীতির ব্যতিক্রম নেই। এই ক্রীড়াগুলিকে উপভোগ করবার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে ইকির-মিকির, ডাংগুলি, হা-ডু-ডু, গাদি, বৌ বসন্তি প্রভৃতি ক্রীড়াগুলি এক এক অঞ্চলে এক এক রূপরীতিতে খেলা হয়। এক অঞ্চলের নিয়ম-কানুন অন্য অঞ্চলের মনঃপূত নয়। এই জাতীয় ক্রীড়াগুলিকেই আমরা লৌকিক ক্রীড়া বলতে চাই।[৪]

লোকক্রীড়া সম্পর্কে গবেষক হরিদাস মুখোপাধ্যায় মূলত বলতে চেয়েছেন—"যেসব ক্রীড়া বা খেলাধূলায় জনসংখ্যার অনেক মানুষই গোষ্ঠীগত বা সমাজগতভাবে অথবা আঞ্চলিকভাবেও অংশ নিয়ে থাকেন, তাই লোকক্রীড়ার অন্যতম অনুষঙ্গ যা সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের একটি বলিষ্ঠ দিক।"[৫] প্রধানত পল্লি বা গ্রামের লোকেদের নিজস্ব উদ্ভাবিত ক্রীড়া হল লোকরা তবে লোকক্রীড়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শরীরচর্চা 'চিত্ত বিনোদন' অবসর যাপনের মধ্যেই সীমায়িত নয়, অনেক খেলার মধ্যেই জাদু, যৌনতা, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদিও যুক্ত আছে। লৌকিক খেলার উপকরণ যেমন—খোলামকুচি, নুড়ি, গুটি, পাতা, বিচি, ডাল, লাঠি, তেঁতুলবিচি প্রভৃতি সবই প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত। একদিকে লোকক্রীড়ার মধ্যে যেমন স্বতঃস্ফূর্ততা, কৌশল, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও শৃঙ্খলা প্রত্যেকটি জিনিসই সমানভাবে প্রতীয়মান তেমনি অন্যদিকে লোকক্রীড়ার মধ্যে গাছপালা, ফুলফল, নদী-পুকুর, বাগান প্রভৃতির মতনই পশু, পোকা, পতঙ্গ সমস্ত কিছুই একই আঙিনায় আবদ্ধ হয়েছে।

লোকক্রীড়া ডাংগুলি—একটি অনুসন্ধান : লোকক্রীড়ার মধ্যে ডাংগুলি অন্যতম দৃষ্টান্ত। মূলত প্রকৃতিগত ডাং বা গাছের ডালই খেলার উপকরন, মূলত সংবদ্ধভাবে খেলা হত। ডাংগুলির ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় আনুমানিক মৌর্য সময়কালে ভারতবর্শে এর সূচনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মূলত ভারতে গিলি ডাণ্ডা নামে অধিক প্রচলিত এই খেলা বাংলাদেশ, চিন, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্থান, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, কিউবা, ইতালি সহ নানা দেশের অন্যতম খেলা।[৬] আন্তর্জাতিক এই খেলা ভারতের নানা প্রান্তে নানা নামে অভিহিত হত। ইংরেজিতে Tipcat, নেপালি ভাষায় Dandi-Biyo, কন্নড় ভাষায় Chinni-Dandu, মালয়ালয় ভাষায় Kuttiyum Kolum, মারাঠি ভাষায় Viti-Dandu, তামিল ভাষায় Kitti-Pul, তেলুগু ভাষায় ও Gooti-Billa, পাঞ্জাবি ভাষায় Guli-Danda, বাংলায় Daang-Guli প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত।[৭] খেলার একটু প্রকৃতিগত এবং নিয়মগত ভিন্নতা থাকলেও মোটামুটি ডাং বা গাছের ডালই খেলার মূল উপকরণ। খেলার ধরনও মোটামুটিভাবে একইরকম। আলোচ্য নিবন্ধে বাংলার প্রেক্ষিতে ডাংগুলি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই খেলা হত ডাংগুলি। খেলার ধরন, অংশগ্রহণকারী ও উপকরণ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা প্রাপ্তব্য হয় 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ' থেকে। যা নিম্নে বর্ণিত করা হল—

> দেড় ফুট লম্বা ও দেড় ইঞ্চি ব্যাসের একটি ডাং ও নয় ইঞ্চি একটি পুলি পিঠের আকৃতি বিশিষ্ট দুদিকে ক্রম সূক্ষ্মাগ্র একটি গুলি, এই হল খেলার সরঞ্জাম। মাটিতে সাতহাত কিংবা আটহাত

ব্যবধানে দু-পাশে দুটি লম্বা লম্বা দাগ কাটা হয় ডাং দিয়ে। খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে একটি দাগের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গুলিটিকে সম্মুখের দাগের উপরে রেখে তার এক প্রান্তে ঘা মারে ডাং দিয়ে, এক প্রান্তে আঘাত করার ফলে গুলিটি উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে ও লাফিয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আবার ঘা মেরে পরবর্তী দাগের ওপারে ফেলে দেওয়া হয়। এইরকম ফেলার দ্বারা যার সবচেয়ে দূরবর্তী জায়গায় পড়বে, সেই প্রথম খেলার সুযোগ পাবে। বিজিত ব্যক্তি সম্মুখের দাগের উপর দাঁড়িয়ে গুলিটিকে ছুঁড়ে দেয় পরের দাগের ওপারে। তারপর ডাংটিকে ছুঁড়ে দেয় ঐ গুলির উপরে। গুলিকে ছুঁয়ে যদি ডাং পড়ে তবে সে খেলার সুযোগ পাবে, না হয় তাঁর খেলার সুযোগ নাই। যদি ডাং স্পর্শ করে গুলিকে তবে ঐ ডাং দিয়ে গুলির এক প্রান্তে আঘাত করলে গুলিটি লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জোরে আঘাত করে তাতে। এই আঘাতে গুলি যত দূর গিয়ে পড়বে সেখান থেকে ডান দিয়ে মাপতে মাপতে যেখানে গুলি পড়েছিল সেখান পর্যন্ত যত ডাং হবে তত সংখ্যা তার জিত। এইভাবে যার সবচেয়ে কম সেই হল দ্বিতীয়। এইভাবে তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি হয়।[৮]

কীভাবে খেলা হত এবং পয়েন্ট অর্জিত হত, সেই সম্পর্কে আমরা যা বর্ণনা পায়, তা এরূপ—

এক হাত পরিমাণ দীর্ঘ একটি দণ্ডের সাহায্য মাটিতে খোঁড়া ছোট একটি লম্বাটে গর্ত থেকে চার ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ দুইদিক সরু করে কাটা গুলিকে তুলে দেওয়া হয় দূরে। মাটিতে পড়ার আগে বিপক্ষের কেউ গুলিটিকে দিলে দন্ডধারীর দান চলে যায়। ধরতে না পারলে মাটিতে রাখা দণ্ডের দিকে গুলিটি ছোঁড়া হয়। দণ্ড বা ডাং-এ গুলি লাগলে 'ডাং' ধারীর দান চলে যায়। গুলি ডাং-এ না লাগলে 'ডাং' ধারী গুলিকে আঘাত করে দূরে পাঠাতে চেষ্টা করে। দূরস্থিত গুলি থেকে থেকে গর্ত পর্যন্ত 'ডাং' দিয়ে মেপে যত সংখ্যা হবে সেটা হবে 'ডাং' ধারীর পয়েন্ট।[৯]

খেলাটির অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে মতের নানা ভিন্নতা খুঁজে পায়, ড. পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন—"জমি দখল, কৃষি কর্মের বিলি ব্যবস্থা এবং শিকার করা ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপার লুকিয়ে আছে 'ডাংগুলি' খেলার মধ্যে।"[১০] ড. অসীম দাস খেলাটির অন্তর্নিহিত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে—"মাটিতে খোঁড়া গর্তটি নারী যোনীর প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু নয়। খেলোয়াড় নিজের গুলিটিকে ঐ গর্তের মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করার অর্থ হল নারীযোনিতে বীজ স্থাপন করার চেষ্টা চালানো। তার ফলেই ফসল উৎপাদন সম্ভব।"[১১] বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন—

ডাংগুলি খেলায় যে ডাং লাগে সেটি হল আদিম পদ্ধতিতে অনুসৃত কৃষি কার্যে ব্যবহৃত যে খনন যষ্টি তারই প্রতীক। তাছাড়া ডাংটি পুরুষাঙ্গেরও প্রতীক। 'গুলি'টি মাটি থেকে সংগৃহীত 'আহারযোগ্য কন্দ।' যে গর্ত করে ডাংগুলি খেলা হয় সেটি হল স্ত্রী জননাঙ্গের প্রতিরূপ। আবার কেউ কেউ ডাংটিকে শিশুর পিতা এবং গুলিটিকে সদ্যোজাত সন্তানের প্রতীক বলে মনে করেছেন।[১২]

'বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষে' একইভাবে বলা হয়েছে, " 'ডাং' হচ্ছে পিতৃ-অঙ্গ; মাটির গর্তটি মাতৃ-অঙ্গ আর গুলিটি হচ্ছে সন্তান। মাটিতে গুলি পড়বার আগেই ধরে ফেললে আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না তাই 'ডাং'ধারীর (পিতার) দান চলে যায়। গুলি দিয়ে 'ডাং'কে আঘাত করা এবং 'ডাং' দিয়ে গুলিকে আঘাত করা ব্যাপারটিকে কেউ ফ্রয়েডীয় দৃষ্টি দিয়ে পিতা পুত্রের মধ্যে যৌন প্রতিযোগিতা হিসাবেও ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবশ্য পিতা পুত্রের দ্বন্দ্বের কথা নৃবিজ্ঞানেও স্বীকৃত।"[১৩] মূলত খেলাটির মধ্যে আমরা পিতৃতান্ত্রিক ছাপ দেখতে পায়। অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে নারী অংশ থাকলেও তা নিতান্তই স্বল্প। খেলাটি প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন, "ক্রিকেট খেলার সাথে ডাংগুলি খেলার একটা মিল দেখা যায়। ক্রিকেটে বোলারের চেয়ে ব্যাটসম্যানের

দায়-দায়িত্ব বেশি। ডাংগুলি খেলায় ডাণ্ডাধারীরও দায়িত্ব অধিক। ব্যাট ও বল ডাণ্ডা ও গুলির সমতুল পিচ আর গর্ত প্রায় অভিন্ন। ব্যাটসম্যান নানা ভাবে আউট হতে পারে। ডাংগুলিতেও আউট করার নানা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। বলা যায় এটি ক্রিকেট খেলার গ্রাম্য সংস্করণ।"[১৪]

লোকক্রীড়ার গুরুত্ব, বিশ্বায়ন ও লোকক্রীড়ার ভবিষ্যৎ পথ : ক্রীড়ার প্রধান দিক শারীরিক কসরত বা শক্তির প্রদর্শনী। ক্রীড়ার মধ্যে লোকক্রীড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ কেননা এক্ষেত্রে দৈহিক ক্ষমতার পাশাপাশি সমাজবন্ধনও হয়ে থাকে। লোকক্রীড়ার মধ্যে খাতা, পেন বা আধুনিক যন্ত্র লাগে না; মূলত প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত উপাদানই খেলার মূল সরঞ্জাম। গ্রামীণ মানুষের নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ও আনন্দ লাভই এক্ষেত্রে যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজবন্ধনে, ভাতৃত্ব ও ঐক্যতা গঠনে খেলার গুরুত্ব অপরিসীম। 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'—এই অনুঘটকের বা জনস্বাস্থ্যের সুস্থতার ক্ষেত্রে বা ভালো থাকার পিছনে এই ধরনের খেলাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন পণ্ডিত চরকের মতে—

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষানাসারোগ্যাং মূলমত্তমম্।
রোগা তস্যাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।।[১৫]

অর্থাৎ নীরোগ শরীর দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করা হইয়া থাকে। অসুস্থ শরীরে ইহাদিগের মধ্যে কোনোটিকেই আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। এবং শরীর নীরোগ রাখার ক্ষেত্রে অন্যতম অবলম্বন ক্রীড়া বা খেলা। গ্রামীণ পরিবেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা হিসেবে গ্রামবাংলার লোকক্রীড়াগুলি বর্তমান বিশ্বায়িত দুনিয়ায় Modernization, urbanization, information communication technology প্রভৃতি রূপকগুলি ডাংগুলির মতো লোকখেলার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলে দেয়। ইন্টারনেট এক লহমায় খেলার অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিয়েছে।

লোকক্রীড়ার ভবিষ্যৎ পথ ক্রমে রুদ্ধ হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে হরিদাস মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল এসব বিগত কয়েক বছরে ক্রমে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। প্রভাব ফেলেছে বললে কম করে বলা হবে জনসাধারণকে শ্রেণী সমাজ গোষ্ঠী নির্বিশেষে মাতিয়ে তুলেছে।"[১৬] ডাংগুলি প্রসঙ্গে শশীভূষণ দাস জানান, "এটি বহু পুরনো খেলা, মুনি-ঋষিরা খেলেছে এই খেলা। ব্যাট বল আর এই খেলার ধরন একই তাই সবাই এটা আর খেলে না; পাশাপাশি চোখে-মুখে লেগে যাওয়ার ভয় থাকত, যে কারণে অনেকে খেলতে চায় না।"[১৭] প্রসেনজিৎ নস্কর জানান—

> এখনকার খেলা মানে তো পাবজি খেলা, এখন শারীরিক কসরতের দিকে কেও জেতে চায় না, এখন মানুষ বড্ড আরামপ্রিয়। মোবাইলের আগমনের সূত্রেই মূলত এই ধরনের খেলার অবলুপ্তি পাশাপাশি মানুষ ক্রমশ অর্থলোলুপ হয়ে পড়েছে যে কারনে এখন আর কেও এইসব খেলায় অংশ নেননা।[১৮]

মূলত একাধিক সাক্ষাৎকারে লোকক্রীড়ার সংকটের প্রশ্নে দুর্ঘটনাজনিত ব্যাখ্যা, ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা, মোবাইলের আগমন এবং আধুনিক মোবাইল গেম প্রভৃতি অনুষঙ্গই উঠে এসেছে। কিন্তু লোকক্রীড়াকে কালের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে। যদিও ডাংগুলি বাঁচাতে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের নয়ডাতে Gilli Danda International Fedaration (GDIF) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নতুন শিক্ষা নীতির দ্বিতীয় বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার স্কুলে যে ৭৫টি খেলার প্রবর্তনের কথা বলেছেন তাঁর মধ্যে একটি অন্যতম 'গিলি ডাণ্ডা' বা 'ডাংগুলি'।[১৯] কিন্তু

তাসত্ত্বেও আজকের বিশ্বায়িত দুনিয়ায় লোকক্রীড়া ডাংগুলি প্রায় অবলুপ্ত। লোকক্রীড়ার মাধ্যমে ফেলা আসা ও চলমান সমাজের বহু বিচিত্র সুস্পষ্ট জীবনচ্ছবি ফুটে ওঠে। সমাজ বন্ধন বৃদ্ধি পায়, একঘেয়েমি দূর হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং মানসিক শান্তি ও অর্জিত হয়। তাই এ নিয়ে সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশপাশি গবেষণার আঙ্গিকেও বিচার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা করলে আঞ্চলিক ইতিহাস প্রাঞ্জল হবে, লোকসমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি হবে।

উৎসের সন্ধানে

১. তুষার চট্টোপাধ্যায় : 'লোক সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান', কলিকাতা, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং (প্রা.) লিমিটেড, ১৪০১, পৃ. ভূমিকা-ঙ।
২. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধান', কলকাতা, ২০০৯
৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বাঙলার লোকক্রীড়া', কলকাতা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ২০০১, পৃ. ৪-৫
৪. অসীম দাস : 'বাঙলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস', কলকাতা, পুস্তক বিপনী, ১৯৯১
৫. জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় : 'লোকক্রীড়া', জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ (বর্ধমান), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৪১
৬. Robert Wood : 'About Gilli-Danda and Dandi Biyo', Topend Sports Website, March 2017, (https://www.topendsports.com/sport/list/gilli-danda.htm) Accessed on 13 May, 2023
৭. Ibid
৮. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত : বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, কলকাতা, আকাদেমী অব ফোকলোর, ২০০৪, পৃ. ৪২৪
৯. তদেব : পৃ. ৪২৪
১০. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', কলিকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯৫, পৃ. ২৩৫-২৩৮
১১. প্রাগুক্ত, অসীম দাস, 'বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস', পৃ. ১৫৩
১২. প্রাগুক্ত, বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বাঙলার লোকক্রীড়া', পৃ. ১৩-২৩
১৩. প্রাগুক্ত, দুলাল চৌধুরী, 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পৃ. ৪২৪
১৪. ওয়াকিল আহমদ : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ. ৪২৮-৩৬
১৫. চুনীলাল বসু : 'শরীর স্বাস্থ্য-বিধান', কলিকাতা, কান্তিক প্রেস, ১৯১৩ পৃ. ৪
১৬. জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় : 'লোকক্রীড়া', জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ (বর্ধমান), পৃ. ২৪২
১৭. সাক্ষাৎকার: প্রসেনজিৎ নস্কর, গবেষক, ১৪ মে ২০২৩, বয়স-৩১, গ্রাম-গরানকাটি, থানা-কুলতুলি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
১৮. সাক্ষাৎকার : শশিভূষণ দাস, তাঁতশিল্পী, ১০ মে ২০২৩, বয়স-৬৩, গ্রাম-মুস্থুলী, থানা-কাটোয়া, জেলা-পূর্ব বর্ধমান।
১৯. Fareeha Iftikhar : 'Gilli dandaó among 75 'Bharatiya sports : set to be introduced in schools', in Hidustan Times, 31 July, 2022

লোকসংগীত বিবর্তনের ধারাপাত ও গাজন গান : প্রেক্ষিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সুচন্দন মণ্ডল

বালক বালিকাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"গাজনের বাদ্দি বাজে ঐ,/মাগো মা গাজনের বাদ্দি বাজে ঐ,/ঘরে মন টিকে কই,/ঘরে মন টিকে কই/আজ আমাদের ছুটি,/চুটিয়ে মজা লুটি,/আনন্দেতে থৈ থৈ,/ সারাদিন শুধু হৈ হৈ,/ মাগো মা গাজনের বাদ্দি বাজে ঐ।"[১] গাজনের বাজনা বাজলেই আলোড়িত হয়ে ওঠে মনপ্রাণ। শ্রীসুখময় সরকার রচিত 'শিবের গাজন' প্রবন্ধে—"গ্রামে অনেক পর্ব আছে, কিন্তু গাজনের মতো আমোদ কোনোটায় নাই। দুর্গোৎসব বৃহত্তম পর্ব বটে কিন্তু ইহাতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে সমান আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায় না।"[২] সেদিক থেকে গাজন উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত, উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণ সবার উৎসব। গাজন বাঙালির ঘরে ঘরে বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ সবাইকে মাতিয়ে তোলে। বঙ্গভূমির উত্তর থেকে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় গাজনের উৎসব হয়। গাজন অনুষ্ঠিত হয় দেবতা শিব, ধর্ম, বলরামকে কেন্দ্র করে। ধর্মের গাজন বা বলরামের গাজন অপেক্ষা শিবের গাজন সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। শিবের গাজন বহু বহু পূর্বকাল হতে বাংলার কৃষিজীবী গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গত শ্রীসুখময় সরকারের—'শিবের গাজন' প্রবন্ধে—

কতকাল হইতে শিবের গাজন চলিয়া আসিতেছে এখানে সেই কাল অনুমান করিতেছি। আমাদের পঞ্জিকায় চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাজন নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৩১৯ খ্রিস্টাব্দ (গুপ্তাব্দ মুখ) হইতে এই পঞ্জিকার গণনা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং সম্ভবত ঐ সময় হইতেই বঙ্গদেশে ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরা হইতেছে। এক্ষণে শিবের গাজন আমাদের দেশে নববর্ষের পূর্ব দিনের উৎসব (New Year's Eve) পরিণত হইয়াছে। ৩১৯ খ্রিস্টাব্দে সৌর ৩০ চৈত্র রবির মহাবিষুব সংক্রান্তি হইয়াছিল, ইহা জ্যোতিষিক সত্য ঘটনা। অতএব সে বৎসর উক্ত দিবসের পরদিন হইতে বর্ষ গণনা আকস্মিক নহে, ইহার মূলে জ্যোতিষিক

যোগ ছিল। এখন ৭/৮ই চৈত্র মহাবিষুব দিন হয়, কিন্তু আমরা ৩০শে চৈত্র শিবের গাজন করিয়া এবং পহেলা বৈশাখ নববর্ষ ধরিয়া খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকের পুরাতন স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। সে যাহা হউক দেখা যাইতেছে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে অদ্যাপি প্রায় ১৬০০ বৎসর ধরিয়া শিবের গাজন আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে।[৩] এই গ্রন্থের অন্য আর-এক অংশে উল্লিখিত—"শিবের গাজন ৩১৯ খ্রিস্টাব্দের পর বর্তমান রূপ লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বহু বহু পূর্বে এই উৎসবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। হঠাৎ কোনও উৎসব প্রবর্তিত হয় না, হইলেও তাহার আদিরূপ অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়; কালে কালে ইহার ক্রম পরিণতি (evolution) হইতে হইতে পূর্ণতর রূপ প্রাপ্ত হয়। শিবের গাজনের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহীরূহে পরিণত হইতে এবং শাখা-পল্লবে পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইতে বহু শত বৎসর অতীত হইয়াছিল।"[৪]

এছাড়া গাজনের দেবতা শিব সম্বন্ধে শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য রচিত 'গাজন : একাত্মতার এক ভাস্বর প্রতীক' প্রবন্ধে পাই—"গ্রাম বাংলার উৎসবে প্রক্ষিপ্ত এইসব অনুষ্ঠান দেখে অনেকে মনে করেন যে, শিব বৈদিক দেবতা নন—কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যজুর্বেদের রুদ্রাষ্টাধ্যায়ের পঞ্চম অধ্যায়ের এই মন্ত্রটি—"নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্কময় চ নমঃ। সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ নমঃ।"[৫] ওই প্রবন্ধের অন্য অংশে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> চড়ক বা গাজনের উৎস রয়ে গেছে ভাগবতে। দৈত্যরাজ বলির একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বাণ। রাজা বাণ ছিলেন পরম শিবভক্ত। কোনো এক চৈত্রসংক্রান্তির দিন রাজা তার বন্ধুদের মহাদেবের প্রীতি কামনায় করতে থাকেন শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীত। এই নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত হয়ে রাজা স্বীয় গাত্ররুধিরদানে শিবকে করেন তুষ্ট। আশুতোষ হন রাজার প্রাসাদরক্ষী। এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হিন্দুসম্প্রদায় শিবপ্রীতি কামনায় করে আসছেন এই উৎসব। পুরাণে চড়ক বা গাজন শব্দের উল্লেখ না থাকলেও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের-চৈত্র মাস্যথ মাঘেবা যোহর্চ্চয়েং শঙ্করব্রতী। করোতি নর্তনং ভক্ত্যা বেত্রপানি দিবানিশম্ মাসং বাপ্যর্দ্ধ মাসং বা দশ সপ্তদিনানি বা। দিনমানং যুগৎ সোহপি শিবলোক মহীয়তে। শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি চৈত্র অথবা মাঘ মাসে ১।৭।১০।১৫।৩০ দিন হাতে বেতের লাঠি নিয়ে শিবব্রতী হয়ে নর্তনাদি করে সে শিবলোকবাসী হয়। যে সময়ে এবং যেভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা আজকের চড়ক বা গাজনই।[৬]

আবার যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর মতে "সিন্ধু সভ্যতার ধারা বেয়ে লিঙ্গ ও যোনি পূজার প্রচলন রাঢ়ে বিকাশ লাভ করেছে। শিবের গাজন উৎসবে অংশগ্রহণকারী ভক্তগণ অধিকাংশ হলেন নিম্নবর্ণের মানুষ এবং যে-কোনো ব্রাহ্মণ গাজনের শিব পূজা করেন না।"৭ অর্থাৎ প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ থেকে শুরু করে ভাগবতে গাজনের উল্লেখ বা অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। আজকের দিনে আমরা যে সারাবছর জুড়ে গাজনগান অনুষ্ঠিত হতে দেখি তার সূচনা হয়েছে বহু বহু পূর্বযুগে।

এবার আসা যাক শিবের গাজনের মূল বিষয়টি কী? যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে—"শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হল হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাদের গর্জন হেতু 'গাজন' শব্দ এসেছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সঙ্গে ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন।" কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, "সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। চৈত্রমাস হতে বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচন্ড অগ্নিময় রূপ ধারণ করে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও সুবৃষ্টি লাভের আশায় কৃষিজীবী সমাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করেছিল।"[৮] মূলকথা হল মনসামঙ্গাল কাব্যের চাষপালা অংশে যে শিবের পরিচয় পাওয়া যায় সেই শিবই গাজনের শিব। এককথায়

বাঙালিঘরের শিব। যিনি মাঠে ময়দানে কৃষিজীবী, ভিক্ষাজীবী, রঙ্গ-কৌতুকময় বাঙালি গৃহস্থের দেবতা। শিবের গাজনের সময় সম্পর্কে শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় রচিত 'শূন্যপুরাণ' শীর্ষক অধ্যায়ের শূণ্যপুরাণের মূল অংশে পাই, "দক্ষিণ রাঢ়ের গ্রামে গ্রামে ধর্মের গাজন, শিবের গাজন, শীতলার গাজন ইত্যাদি, গ্রামের দেবদেবীর গাজন হইয়া থাকে। শিবের গাজন চৈত্রমাসের শেষ দিন অর্থাৎ নববৎসরারম্ভে হইয়া থাকে। গ্রামের সাধারণের যে শিব তাঁহার গাজন হয়, গৃহস্থের প্রতিষ্ঠিত শিবের হয় না। এই গাজনে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির লোকে দিন কয়েকের তরে সন্ন্যাসী হয়, গলায় উত্তরীয়(যজ্ঞোপবীত) পরে এবং শুদ্ধাচারে থাকে।"[৯] বর্তমান সময়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন আর নির্দিষ্ট দিন মাস মেনে হয় না। সারাবছর জুড়ে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণে চলছে গাজনগান।

এই সমস্ত আলোচনা ব্যাপক আকারে হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। পণ্ডিতমহলে প্রমাণিত হয়েছে গাজনগান বাঙালির একটি প্রাচীনতম উৎসব। আমার মুখ্য অনুসন্ধান এই উৎসবের বিবর্তিত রূপ বা বর্তমান অবস্থা নিয়ে। এই প্রবন্ধের মুল আলোচ্য বিষয় হল শিবের গাজন পরিবর্তিত হতে হতে আজ হুজুগে গাজনে পরিণত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে গ্রামান্তরে এই পরিবর্তিত গাজন কীভাবে টিকে রয়েছে, তারই পর্যালোচনা। যে সমস্ত শিল্পীরা সারাবছর এই গাজনগানকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কিংবা একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে গাজনগান বিরামহীনভাবে এগিয়ে চলেছে সে গাজনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিব ব্যতীত। অর্থাৎ যে দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে গাজনগানের রমরমা আজ সেই শিব ছাড়া হয়েছে গাজনগান। বর্তমান গাজনগান হয়েছে বারোমাসি। আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিয়ে যার সূচনা। আর পরবর্তী রথযাত্রার আগে পর্যন্ত একই ধারা চলতে থাকে। এই গাজনগান বহু মানুষের জীবিকা হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ তারা পেশাদারী গাজন দলে পরিণত হয়েছে। এক একটি পালা গানে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দক্ষিণা নেওয়া হয়। কখনও এই দক্ষিণা আরও বেশি টাকা হতে পারে। সারাবছরে ১৮০ থেকে ২১০টি মঞ্চে অভিনয় করে এক একটি দল। দলগুলি সম্পূর্ণ নারী বর্জিত। অর্থাৎ মহিলারা এই গাজনগান অভিনয়ে বেশি আগ্রহ দেখায় না। পুরুষরা এখানে নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকে। তবে গাজনগান অনুষ্ঠানে মহিলা দর্শকের ভিড়ভাট্টা নজর কাড়ার মতো। এক একটি দলে কুড়ি থেকে পঁচিশ জন সদস্য থাকে। বেশিরভাগ দলে সদস্য সংখ্যা কুড়ি জন। মোট আটজন অভিনেতা। চারজন নারী চরিত্রে এবং চারজন পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করে। চারজন বাদক থাকে। চারজন ধ্বনি ও আলো পরিচালক। দুজন মঞ্চ পরিচালক। একজন গাড়ির চালক এবং আরেকজন রাঁধুনি।

গাজনগানের উৎপত্তির সাথে হিন্দু ধর্মের সম্পর্ক থাকলেও বর্তমান সময়কালে তা ধর্মীয় বেড়াজাল অতিক্রম করে গেছে। মঞ্চেই উপস্থাপিত হয় অহিন্দু ধর্মীয় কাহিনি। গাজনের ছক বা কাহিনিতেও অহিন্দু পরিবারের চিত্র তুলে ধরা হয়। এছাড়া দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিষ্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন। বর্তমান দিনের গাজনপ্রিয় দর্শক বেশিরভাগই হয়ে উঠেছে অহিন্দু পরিবারের। আবার গাজনদল পরিচালনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মুসলমান মানুষজনরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকী গাজন অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে অহিন্দু পরিবার থেকে এগিয়ে আসা অভিনেতাদের। এমনকী মুসলমানদের, খ্রিস্টানদের নানান রকম অনুষ্ঠানে গাজনগান অভিনীত হয়।

গাজনের কাহিনি বহুমুখী। যাত্রা বা নাটকে আমরা যেমন একমুখী কাহিনি দেখি গাজন সে দিক থেকে ভিন্ন। এখানে ছয় থেকে আটটি ঘটনা রাখা হয়। প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের। প্রথমে থাকে একটি সামাজিক পালা তারপর রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক গীতিনাট্য। এরপরে পরপর থাকে 'ছক'। 'ছক' বলতে বোঝায় টুকরো টুকরো সামাজিক ও রাজনৈতিক পালা। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রচার বা প্রসার ঘটানো হয়। যেমন বাল্যবিবাহ রোধ। বিদ্যুৎ চুরির সচেতনতা। বিদ্যুৎ ব্যবহারের সচেতনতা। চাকরিতে স্বজনপোষণ বা ঘুষের বিনিময়ে চাকরি। শিক্ষিত বেকারের যন্ত্রণা। রক্তদান শিবির। রেশন দুর্নীতি। দাম্পত্য সমস্যা। সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প। রাজনৈতিক সমস্যা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা। দিনমজুর মানুষের চিত্র। সুন্দর বনাঞ্চলের খেটেখাওয়া মানুষজন যারা কৃষিজীবী, বনজীবী, জলজীবী, বাউলে, মৌলে, শিউলি, নাপিত, ব্রাহ্মণ, হকার, ফেরিওয়ালা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তাদের দুর্দশার চিত্র। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র। বর্তমান দিনের প্রতিমা বিসর্জনের চালচিত্র। প্রধান গঠন। মেম্বার হরণ বা কেনাবেচা। পঞ্চায়েত দখল। পঞ্চায়েতে জনমুখী প্রকল্পের দুর্নীতি। কাটমানি সমস্যা। কৃষিকাজ। কৃষিজমিতে পরিশোধিত বীজের ব্যবহার। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষার সচেতনতা। বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানের জয়গান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গাজনগান রচনা করে থাকে রচয়িতারা। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদের, সমন্বয়ে প্রাত্যহিক জীবনের মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে তারা এই সমস্ত ছক রচনা করে থাকে। নিম্নে কয়েকটি গাজন পালাগান বা ছকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম।

ছক : ১ দরিদ্র শিউলির জীবন দশা।

- মা নাচিন্দা গাজন সংস্থা। রচয়িতা অশোক হালদার।
- অভিনয়ে স্বামী-বিলাস পাইক। স্ত্রী-যুধিষ্ঠির প্রামাণিক। মেম্বার- চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। মেম্বারের স্ত্রী (আশাকর্মী)-লক্ষ্মণ সরদার।

মূল গান

মেম্বার : নেচে উঠিস পরের কথায়, এটাই তোদের বদভ্যাস।
স্বামী : মাগ-ভাতারে যুক্তি করে, করলি আমার সর্বনাশ।
মেম্বার : আমরা করি উন্নয়ন, কর্মগুনে পেটের ভাত।
স্বামী : গরিব মেরে কাছারি গরম, তোমরা খাবে আমি বাদ।
স্ত্রী : স্পষ্ট কথায় কষ্ট কিসে, দুধের সর ধানের চাষ।
স্বামী : মাগ-ভাতারে যুক্তি করে, করলি আমার সর্বনাশ।

মেম্বারের স্ত্রী : মাটির নিচে পাইপ লাইন, কল বসবে স্যাটাস্যাট।
স্বামী : আর ফটোক তুলে চলে গেল, সেই ঘরটা কেটে বাদ।
স্ত্রী : কাকি তোর ভালোবাসে কচি কচি তালের শাঁস।
স্বামী : মাগ-ভাতারে যুক্তি করে, করলি আমার সর্বনাশ।

মেম্বারের স্ত্রী- দুটোর বেশি সন্তান নয়, ধারায় আছে সার্কুলার।
মেম্বার : নিজগৃহ নিজভূমি, দিচ্ছে মা-মাটি সরকার।
স্ত্রী : নিশ্চয়যান আসুক যবে, সব মায়েদের দিন মাস।
স্বামী : মাগ-ভাতারে যুক্তি করে, করলি আমার সর্বনাশ।

স্বামী : ক্ষমা কর প্রধান কাকা, হচ্ছে আমার বোঝার ভুল।
স্ত্রী : জীবন নদীর জোয়ার-ভাটা, ভাঙে গড়ে আরেক কূল।
মেম্বারের স্ত্রী : অশোক দাদা লিখে গানে, ঘরে ঘরে যাবে নার্স।
স্বামী : মাগ-ভাতারে যুক্তি করে... (নিজেই নিজেকে করাঘাত)

বাদল একজন দরিদ্র শিউলি। সে বছরে ১৭৫টি গাছ কেটে রস উৎপাদনের দায়িত্ব নেয়। এর বিনিময়ে তার পারিশ্রমিক ১১হাজার টাকা। একদিকে বাড়িতে তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অন্যদিকে সে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দিন গুনছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তালিকা থেকে নাম কেটে বাদ দিলে গ্রামের গরিব মানুষ আশাহত হয়। বহুক্ষেত্রে প্রধান মেম্বাররা এধরনের কাজ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নিয়ম অনুযায়ী ভিটেহীন মানুষের জমি কিনে ঘর বেঁধে দেওয়ার কথা। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে অর্থাৎ শ্লেষ অলংকারের দ্বারা এখানে তামাশা সৃষ্টি করা হয়েছে। লেখাপড়া না জানলে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়, সেই বিষয়টি পরিস্ফুট করা হয়েছে। ঘর কেটে বাদ দেওয়ার কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মেম্বারের স্ত্রীর ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কারণ তারা মনে করেছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মেম্বারের স্ত্রী জানায় তাদের তিনের অধিক সন্তান থাকায় জরায়ুর সন্তান ধারণ ক্ষমতার লোপ ঘটানো হয়েছে। অতএব বলা চলে এই ছকের মাধ্যমে যেমন তামাশা সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনই গ্রামীণ মানুষকে বাংলা শব্দ সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

ছক : ২ নাইজেরিয়াতে চাকরির উদ্দেশ্যে। বেকারত্বের যন্ত্রণা ও নাইজেরিয়ান সংস্কৃতি।

● নাট্যমহল গাজন তীর্থ। রচয়িতা গোপাল পাইক।

● অভিনয়ে বেকার ছেলে (বিজয় দাস)—গোপাল পাইক। মেয়ের মা (গিন্নিমা)—উত্তম মণ্ডল। মেয়ে (রিয়া)—প্রদ্যুৎ মিস্ত্রি। নাইজেরিয়ান দুই যুবক—বুদ্ধদেব প্রামানিক ও পূর্ণদাস শিকারি।

● সূচনা সংগীত বিজয়—চাকরির তরে ছুটছে মানুষ চাকরি নেই ভারতে।/কত এম.এ. পাস কত বি.এ. পাস পড়ে আছে ফুটপাতে।/পেপার ব্যাচে পি-এইচ.ডি ম্যান, মাধ্যমিকের ভ্যান।/ হাহাকার করে ছুটছে কত বেকার ইন্ডিয়ান। বেকার ইন্ডিয়ান।

মূল গান

বিজয় : ছেড়ে দে ওরে শালা, নইলে খাবি ঠেলা। আমি বডিগার্ড।
সাদা গাই (গাভী) দেখে এখন ছুটছে কালো ষাঁড়।
নাইজেরিয়ান ১ : চিকনা চিকা ইনা ইকা উনা উকা উনা উঠা সুন।
বিজয় : ম্যাডাম, তোমার কচি হাড়ে ধরাবে এ ঘুন।
রিয়া : টার্গেট ফুল করব আমি, ওরে ও অবুঝ।
বিজয় : আর প্রথম ঝটকায় ছিঁড়ে দিল সায়া ব্লাউজ।
নাইজেরিয়ান ২ : টিগাপ ক্যালুস গই ইনকিড়া সিলাই, পাখিলিয়া ইন্টিজার।
বিজয় : সাদা গাই দেখে এখন ছুটছে কালো ষাঁড়।

বিজয় : কে যেন কাঁদে নাইজেরিয়াতে ভরদুপুর বেলাতে।
গিন্নিমা : গুলি করে মারব তোকে ওরে ভিখারি।
বিজয় : আমার তরে তোমার মেয়ের বেড়েছে ডিগ্রি।
রিয়া : যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হয়েছি রঙিন।

বিজয় : নামে আমি ইঞ্জিনিয়ার, দেখিনি ইঞ্জিন।

রিয়া : এরা বিশ্বের শয়তান, এদের নেই তো মা-বোন জ্ঞান। এ সফর হয়েছে বেকার।

বিজয় : সাদা গাই দেখে এখন ছুটছে কালো ষাঁড়।

কাকদ্বীপ থেকে কলকাতা হয়ে নাইজেরিয়া। পড়াশুনা করে চাকরি না পেয়ে বিজয় দাস কলকাতার একটি বাড়ির বিজ্ঞাপন দেখে কাজ করার জন্য পৌঁছায়। পৌঁছে জানতে পারে ওই বাড়ির মেয়ে নাইজেরিয়াতে পড়াশোনা করতে যাবে। তার বডিগার্ড হিসেবে তাকে যেতে হবে। মাইনে কুড়ি হাজার টাকা। বেকারত্বের যন্ত্রণা মেটাতে পারিবারিক কাজে যোগ দেয় বিজয়। নাইজেরিয়াতে গিয়ে সে প্রথম নাইজেরিয়ান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। প্রথম যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তারা সমাজের অসভ্য শ্রেণির। তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সেখানে কাজ করাতে চেষ্টা করে। ভারতীয় বিবাহিত মহিলারা যেমন কিছুটা সুরক্ষিত থাকে। ওখানে মেয়েটিকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে। পরবর্তীকালে সেখানে গিন্নিমা পৌঁছলে গিন্নিমা মেয়ের শাঁখা-সিঁদুর পরা দেখে অবাক হয়ে যায়। বিজয়ের ওপর হুংকার ছাড়তে থাকে কিন্তু বিজয় বুঝিয়ে দেয় যে শাঁখা-সিঁদুর না থাকার কারণে গিন্নিমা নিজেও একই অবস্থার শিকার। অবশেষে নকল স্বামীর দেওয়া আসল সিঁদুরকে সত্যের রূপ দিয়ে রিয়া বিজয়কে বিয়ে করে। অর্থাৎ নাইজেরিয়াতেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব খাটানোর চেষ্টা। এটি ঠিকঠাক যুক্তিযুক্ত হয়নি। এছাড়া গোটা নাইজেরিয়ানদের খারাপ বলা ঠিক হয়নি।

বর্তমান চাকরির বাজারে বেহাল দশার কারণে কয়েকটি মূল্যবান সংলাপ—"চাকরি চাকরি করে জীবন শেষ।" "লেখাপড়া শিখে ভালো গতর বসিয়ে দেওয়া। লেখাপড়া শেখার প্রতি যুব সমাজের বিতৃষ্ণা। ফর্ম ফিলাপ করতে করতে জীবন অতিবাহিত।" "বিজ্ঞানী মানে যাদের মোটে জ্ঞান নেই সব সময় উল্টোপাল্টা খবর ছাড়ে।" "অসম্ভবকে সম্ভব করাই বাঙালির কাজ।" "আচার ব্যবহার যেমন তাকে তেমন শিক্ষা দিতে হয়।" "বিশ্বের বড়ো ফুটবলার পেলে কালো মানুষ। বিষের বিগম্যান নেলসন ম্যান্ডেলা কালো ছিলেন। আসল পরিবেশটা রূপে নয় গুণে।" "হাইপ্রোফাইল মানুষের জীবন যদি খারাপ হয় সাধারণ মানুষের জীবন আরও বেশি খারাপ হবে।" "বিদেশে বাঙালি বাঙালিকে দেখবে।" "এদের ব্যবহার যেমন গোরুর মতো তেমনি গোরুর মতো শিক্ষা দিতে হবে।" "এদের মা মাসির জ্ঞান নেই।" "শাঁখা সিঁদুর নারীর রক্ষা কবজ।" "সরকারি অফিসের কর্মীরা উপযুক্ত মাইনে পাওয়া সত্ত্বেও ঠিকঠাক কাজ করে না, তাই দেশের আজ এই বেহাল অবস্থা।" "স্বামী নকল হয় কিন্তু শাঁখা সিঁদুর নকল হয় না।" এই ছকে যে প্রবাদের পরিচয় মেলে—"কানা খোঁড়া এক গুনে বাড়া। মেয়েলোক তিন গুনে বাড়া"।

ছক : ৩ কৃষিকাজে পরিশোধিত বীজের ব্যবহার।

● দ্বিগ্বিজয়ী গাজন তীর্থ। রচয়িতা রামকৃষ্ণ হালদার।

● ঠাকুমা : পরেশ মাঝি। নাতি—লক্ষিন্দর পণ্ডিত। এগ্রিকালচার অফিসার (মহিলা)-পল্লব সরদার।

● সূচনা সংগীত নাতি : আমি বসে আছি দোকান পেতে।/খরিদ্দার আসছে দেখে যাচ্ছে চলে।/সবার বেচে লাভ হয় আমার হয় না।/আমার ঘরের গাছের আসল দানা।/এ দানা পুঁতলে পরে লস হবে না।

মূল গান

নাতি : জোর করে কেন তুই ফেলে দিলি মাল।
অফিসার : ইডিয়েট, রাসকেল, হয় বেসামাল।
নাতি : হোক না ছোটো, লাগবে হেব্বি ঝাল।
এ ম্যাডামকে, এ ম্যাডামকে, লাগছে ঝাক্কাস
ঘষে ঘষে করে দেবো লাল।

অফিসার : মূর্খ গোরু সুযোগ পেলে ভাঙে বেড়াখানা।
নাতি : কার ভিতরে কে ঢুকেছে কচি পাকা দানা।
অফিসার : বনের পশু অনেক ভালো, আছে তাদের অনেক জ্ঞান।
নাতি : ফেললি মাল, ঝরছে ঘাম, বাড়ছে শুধু টেনশন।
অফিসার : মুখোশ দেবো খুলে, তুই সব যাবি ভুলে।
নাতি : হোক না ছোটো লাগবে হেব্বি ঝাল।
এ ম্যাডামকে, এ ম্যাডামকে, লাগছে ঝাক্কাস
ঘষে ঘষে করে দেবো লাল।

ঠাকুমা : ছোটো ব্যবসা খাচ্চি করে, হচ্ছে শুধু লস।
অফিসার : নকল দানায় মরছে চাষি হচ্ছে সর্বনাশ।
নাতি : পুঁতলে দানা হবে গাছ দিলে সার জল।
অফিসার : কচি বীজে হবে গাছ, ফলবে না তো ফল।
ঠাকুমা : রামকৃষ্ণ কয় এই আজব দুনিয়ায়।
নাতি : হোক না ছোটো লাগবে হেব্বি ঝাল।
এ ম্যাডামকে, এ ম্যাডামকে, লাগছে ঝাক্কাস
ঘষে ঘষে করে দেবো লাল।

ছক থেকে উদ্ধৃত সংলাপ—"২৫ বছরের পুরোনো দানা নিয়ে একমাস ব্যবসা করছিষ্ণ।" "ওরা বিক্রি করে উঠে যাচ্ছে, আমি বিক্রি করে ঢুকে যাচ্ছি।" "শুধু একটা বার লাগাতে দে (দোকান)।" "বউনি বেলায় সব মাল ছইড়ে দেছে।" "কচি দানায় রং মিশিয়ে বিক্রি (অপুরুষ্ট বীজ)।" "এ তো ছইড়ে ছিয়াশি করে দেছে রে।" "ছোটো ব্যবসা করে খাচ্ছি বলে কি জ্বলে মরতছ।" "তোর একঝুল ধরে মারল তুই আবার ওর বর হতে যাচ্ছি।" "আমার মেরেছে তো তোর বাবার কি?" "নকল দানায় গাছ হয় কিন্তু ফল হয় না।" "কৃষক আত্মহত্যা করছে।" "কৃষি দপ্তরে কৃষি পদ্ধতি সঠিকভাবে জেনে আসল বীজের ব্যবহার করা দরকার।"

গ্রামের কৃষকদের ভরসা বীজের দোকান। কিছু দুষ্ট ব্যবসায়ী অতিরিক্ত লাভের আশায় অপরিশোধিত বীজের কারবার করে। অনেকক্ষেত্রে তারা অপরিপক্ক ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে তাতে দেখা যায় গাছ হচ্ছে কিন্তু ফসল ফলছে না। ফলে ঋণগ্রস্থ কৃষকের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকে না। অন্যদিকে ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তর থেকে এইসমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের ধরার জন্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তেমনি এক কর্মী বা এগ্রিকালচারাল অফিসার ধরে ফেলে এক ব্যবসায়ীকে। অর্থাৎ কৃষক সচেতনতার নিমিত্তে নির্মিত হয়েছে এই কাহিনি।

ছক : ৪ গ্রামীণ সমাজে গ্যাস ব্যবহারের সচেতনতা।

- নিউনটরাজ গাজন তীর্থ। রচয়িতা সুন্দর নাইয়া।
- অভিনয়ে স্বামী (অরুণ)—সুন্দর নাইয়া। স্ত্রী (জয়ন্তী)—অরুণ কুমার। শাশুড়ি (প্রতিমা)-পুতুল মণ্ডল। মাছ ব্যবসায়ী—ভক্তরাম মণ্ডল।
- **কাহিনি :** দিনমজুর স্বামী। বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার, ওভেন আনতে পারেনি বলে অশান্তি। সেই অশান্তিতে ইন্ধন জোগায় শাশুড়ি। রাগ করে স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যায়। শাশুড়ি মেয়েকে না বুঝিয়ে জামাইকে বলে তোমার সাথে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে কুকুরের সাথে বিয়ে দেওয়া ভালো। জামাই শাশুড়িকে বলে প্রতিমা বিসর্জন করে দেব। আসছে বছর আবার হবে। ১৭হাজার টাকা খরচ করে কুকুরের ডাক শিখেছে শাশুড়িকে জব্দ করার জন্য। স্বামী পুকুরে গঙ্গাডিমের মাছ ফেলেছে। মাছ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বাকিতে। তার টাকা দিতে পারছে না। আবার স্ত্রীকে বাড়ি আনার জন্য গ্যাসের ব্যবস্থা করে প্রচুর টাকা খরচ করে। স্ত্রী বাড়ি আসার পর স্বামী অন্ধের অভিনয় করে যাতে মাছ ব্যবসায়ীর টাকা দিতে না হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই স্ত্রী গ্যাসে রান্নার সময় হাত পুড়িয়ে স্বামীর কাছে আসে। তখন অন্ধের অভিনয় করা আর হয়ে ওঠেনি। মাছ ব্যবসায়ীর সামনে সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

ছক থেকে উদ্ধৃত সংলাপ—সুন্দর—টাকা দিতে পারবো না তুই ভাই পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে চলে যা। ভক্ত—দাদা কি ভালো লোক। সুন্দর—কি! তুই আমার ছোটোলোক বললি। ভক্ত-বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। সুন্দর-ও ছাড়াছাড়ি! আমার শালি ভায়রাভাইতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ভক্ত—কি বলব দাদা, চোখের অবস্থা খুব খারাপ। সুন্দর—মাছের খোরাক বস্তা ভর্তি করে বাঁশ দিয়ে পুকুরে গেড়ে দেব। "দিল্লিতে একই পরিবারে সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।" "গ্যাস ব্যবহার করবেন সাবধানে। বাচ্চাদের গ্যাসের কাছে নিয়ে যাবেন না।"

- **ছড়া :** নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।/গ্যাসের জন্য বউ আমার অজ্ঞান হয়েছে।

১ম গান : বউ ছিল, ছেলে ছিল, শুধু গ্যাস ছিল না বলে বউ থাকল না।/কাঠ ছিল, ঘুঁটে ছিল, রান্না করবে না বলে বউ কথা শুনল না।/বউ ছিল ছেলে ছিল।/রাগ ভরে মেরেছিলাম খুন্তি।/একঘর বউ ছিল জয়ন্তী।/গ্যাস কিনে এনে দেবো কথা শুনব না।/বাড়ি ফিরব না বলে বউ কথা শুনল না।/বউ ছিল, ছেলে ছিল।

২য় গান সুন্দর নাইয়া : যখন কেউ আমাকে বাবু বলে, দুমড়ে কচু হই আমি।/ কেন তোমার মা কুকুর বলল, কুকুর খেলা দেখাবো আমি।/ক্ষুণ্ণ আমি ক্ষুণ্ণ হে, কুকুর গ্যাসের জন্য হে।

মূল গান

স্বামী : আই আই আই আই টাক-ডুমা-ডুম, কি আনন্দ হল, এটাই হবার ছিল।
ভক্ত : এবার বুঝি আমার মাছের টাকা গেল।
স্বামী : কত করেছি বারণ। বলে গ্যাসের প্রয়োজন। ফ্যাচাং কলে বিপদ ঘরে এলো।
আই আই আই আই টাক-ডুমা-ডুম।

স্ত্রী : একি যন্ত্রণা, হচ্ছে যে আমার।
স্বামী : কাঁচালঙ্কা বেটে দেওয়া এখনি দরকার।
শাশুড়ি : জামাই, জ্বালার উপরে মারছ যে পালা।

স্বামী : গঙ্গাডিমের মাছ নিয়ে সেজেছি কালা।
ভক্ত : শালা একি চালাকি। মাছের সব টাকা বাকি। বাকি দেওয়ার শিক্ষা আমার হল।
স্বামী : আই আই আই আই টাক-ডুমা-ডুম, কি আনন্দ হল, এটাই হবার ছিল।

স্ত্রী : তোমার কথা না শুনে। আমি করেছি কি ভুল।
স্বামী : টুপি পরে ঘুরতে হতো, পুড়লে মাথার চুল।
ভক্ত : সুন্দর লিখে যায় গানে। গ্যাস জ্বালবে সাবধানে। মানে মানে মাছের টাকা ফেল।
স্বামী : আই আই আই আই টাক-ডুমা-ডুম

তাই বলা চলে এই ছকের মাধ্যমে একদিকে গ্যাস ব্যবহারের সচেতনতার প্রচার যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সংসারের টানাটানির চিত্র। যেখানে বউয়ের গ্যাসের দাবি মেটাতে গিয়ে মাছ ব্যবসায়ীর ঋণশোধ করতে অপারগ গৃহকর্তা।

ছক : ৫ রাজনীতির ময়দানে ঘোড়া কেনাবেচা। পঞ্চায়েতে মেম্বার কিনে নিয়ে প্রধান গঠন।

● বিশ্বমঞ্জরী গাজন সংস্থা। রচয়িতা হরিসাধন মণ্ডল।

● অভিনয়ে স্বামী—হরিসাধন মণ্ডল। স্ত্রী (জয়ী মেম্বার)—সঞ্জয় সরদার। মেম্বারের বডিগার্ড—দীননাথ হালদার। বডিগার্ডের স্ত্রী—শ্যামকুমার নাইয়া।

● **কাহিনি :** প্রার্থীর দর উঠেছে পাঁচলাখ টাকা। প্রধান গঠনের আগে পর্যন্ত তাকে থাকতে হচ্ছে অন্য স্থানে, হোটেলে। প্রধান হতে গিয়ে নিজের সন্তানকে পরস্ত্রী দ্বারা লালনপালন করাতে হচ্ছে। কোলের শিশুসন্তানকে পালনের জন্য প্রার্থীর পরিবারে অন্য নারীকে পাঠানো হয়েছে। জন্মদাত্রী মায়ের কোলে সন্তান কাঁদে পালনের অভাবে। ভোটে জেতার পর মেম্বার তুলে নেওয়ার কীর্তি। প্রার্থী নিয়ে প্রধান গঠনের জন্য খুনোখুনি। বউদি প্রধান হলে পঞ্চায়েতের সুপারভাইজারের কাজ পাওয়ার জন্য মস্তানি করছে প্রতিবেশী দেওর।

● **ছক থেকে প্রাপ্ত সংলাপ :** "আমার স্বামীর যাত্রার দল আর আমি নির্দল।" "ভোটে জিতেও শান্তি নেই প্রধান গঠন পর্যন্ত।" স্বামী—পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ কী? **স্ত্রী**—বিড়ি বাঁধা (স্বামী—পরীক্ষায় ফেল করা)। **স্বামী**—পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ কী? **স্ত্রী**—টোটো চালানো (স্বামী-শীতের সময় লেপ ছেড়ে বের হওয়া)। **স্বামী**—সিরাজদৌলার কয় ভাই? **স্ত্রী**—কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, সিরাজদৌলা। "মেম্বার প্রধানদের মনোভাব, পরের জায়গায় কলা গাছ বসাবো বা নার্সারি করব। যে কারো দিয়ে ফটো তুলব। আর টাকা নিজে নেব।"। "ভোটে জিতলে রাজকীয় ভোগ—মদ, মাংস, পরকীয়া, নিত্যনতুন স্থানে ভ্রমণ, ইলাহী আয়োজন।" "১০০ দিনের কাজের টাকায় যদি ৩৬৫ দিন পেট চালাতে পারে। ১০ মাস ১০ দিনের বাচ্চা কেন তিন মাসে হবে না?" **ছড়া**—"রাজনীতির আর রাজা নেই, পালটে গেছে দেশ।/মাছির মতো মরছে মানুষ তবুও আছি বেশ।/জীবন চলে সুতো কলে প্রেমের ছড়াছড়ি।/সারাদিন নেতা দেশের কথা রাতে বাইজিবাড়ি।/দেশের উন্নয়নের টাকা নিজের ব্যাংকে ভরে।/হালকা ঝড়ে ঘর ভেঙে গরিব কেঁদে মরে।/ঝড় বৃষ্টি হলে নেতা আনন্দ পায় মনে।/তোমার ঘর তিনবার পাস হবে তুমি শুনবে না কানে।/ইংরেজরা চলে গেছে রেখে গেছে তাদের প্রথা।/কুকুরের মতো বেঁচে আছি এই আমাদের স্বাধীনতা।"

মূল গান

স্বামী : উলটোদেশের উলটোনীতি, দেশের করে সর্বনাশ।
ভালোমানুষ পেলে এরা দেবে ধরে গেঁটেবাঁশ।

স্ত্রী : কত আশা নিয়ে ছিলাম, প্রধান হয়ে করব কাজ।
স্বামী : কতজনে চড়ে গেল, আমার আন্দামান জাহাজ।
বডিগার্ড : পরের ক্ষতি করতে গিয়ে, নিজের মাথায় পড়ল বাজ।
স্বামী : কুকুরের মতো মরে আছে আজ যত সব রংবাজ।
পালিত মা : খোকা যখন আমার ডাকবে মা, ভুলে যাব সব ব্যথা বেদনা।
বুকের মাঝে রাখবো তোকে একা ছেড়ে যাব না।

স্ত্রী : মাছমাংস খাই আমরা, সবকিছু করল শেষ।
স্বামী : বঙ্গাদেশের রঙ্গানারী, যৌবনে শেষ করল দেশ।
বডিগার্ড : পার্টি আমার করল মাটি, মস্তানি আর করব না।
স্বামী : একথার না ঠিক থাকলে, বাপের ঠিক থাকে না।
পালিত মা : হরিদা দেখেশুনে লেখে গান, রাজনীতিতে জ্বলছে জনগণ।
স্বাধীনতা পেয়েও মানুষ তবু কেন অসহায়।

বর্তমান সমাজের ঘৃণ্য রাজনীতির চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। রাজনীতিতে আসার মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে আত্মতৃপ্তি। সাধারণ মানুষের জন্য শপথ গ্রহণ অথচ কুর্শিতে বসার পর নিজেকে জনগনের ত্রাতা মনে করাই রাজধর্ম হয়ে উঠেছে। সেবার পরিবর্তে এসেছে শোষণ আর বঞ্চিতকরণ। পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে আজীবন ক্ষমতালোলুপ রাক্ষসে পরিণত হওয়াই রাজনীতির মূল অভিসন্ধি। সমাজকে মুক্ত করার পরিবর্তন করার মতো সচেতন মানুষের আকাল দেখা দিয়েছে। সাধারণ গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য কিংবা প্রধান হওয়া নিয়েই মারামারি, খুনোখুনি, বাস্তুছাড়া, গৃহহারা বহু মানুষ। ক্ষমতার লোভ আর দম্ভ মানুষকে অমানুষ করে তুলেছে।

উপরিভাগে আলোচিত ছকগুলি আমাদের নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেয় যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনগানের বিবর্তিত চেহারা প্রাচীনকালের গাজন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবধারায় চালিত। বৈদিক ভাষা বর্জন করে ঘরোয়া ভাষায় গ্রাম্য ধাঁচে পরিবেশিত হয়ে চলেছে আজকের গাজনগান। অর্থাৎ গাজনগান পৌরাণিক খোলস ত্যাগ করে লৌকিক হয়ে উঠেছে। অশ্লীলতার পরিবর্তে নৈতিক শিক্ষাদান হয়ে উঠেছে মুখ্য অভীষ্ট। মানব মনের ছদ্মবেশী হিংস্র রূপের মুখোশ খুলে দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাবাহক হয়েছে এই গাজনগান। এছাড়া বহু মানুষের জীবিকানির্বাহের অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. মনোরঞ্জন চন্দ্র : 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর', প্রথম প্রকাশ ২০০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪৮৯
২. শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'প্রবাসী', ৫৪শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৬১, কমলা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃ. ৬৯২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫
৫. শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত : 'অমৃত', ৪১শ সংখ্যা, শুক্রবার ১লা বৈশাখ ১৩৭৩, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ১২, পৃ. ৮২৯
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৯
৭. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী : 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৪, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৪৪
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

সাক্ষাৎকার

১. সুন্দর নাইয়া : বয়স ৪০ বছর। গাজনগান রচয়িতা ও অভিনেতা(নায়ক) পুরুষ। জামতলা হসপিটাল মোড়, কুলতলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। হিন্দু। মাধ্যমিক। তারিখ- ২৪/০৭/২০২২।
২. স্বপন গায়েন : বয়স ৫৫ বছর। গাজনগান রচয়িতা ও সরকারি চাকরিজীবী। পুরুষ। ভবানীমারী মোড়, তারানগর, কুলতলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। স্নাতকোত্তীর্ণ। তারিখ- ১৭/০৭/২০২২।
৩. বিলাস হালদার : বয়স ২৮ বছর। কীবোর্ড বাদক। পুরুষ। কাঁটাবেনিয়া, করঞ্জলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। স্নাতক। তারিখ- ২৩/০৪/২০২৩।
৪. অরবিন্দ পাইক : বয়স ৪৫ বছর। গাজনগান রচয়িতা ও অভিনেতা(নায়ক)। পুরুষ। ১৩ নং চণ্ডীপুর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। মাধ্যমিক। তারিখ-২৩/০৪/২০২৩।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিলুপ্তপ্রায় লোকগীতি কাহিনিগান

টুকটুকি হালদার

মুর্শিদাবাদ জেলার লুপ্তপ্রায় লোকগীতি 'কাহিনিগান'। কাহিনিগানের মূলকথা হল, ইতিহাসখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রনাম ব্যবহার করে সেই চরিত্রের অবাস্তব মনগড়া কাহিনি রচনা করা এবং সেই কাহিনি দর্শকদের শোনানো। আর কাহিনি পরিবেশনের সময় জনগণকে অধিক মনোরঞ্জনের বাসনায় উক্ত কাহিনির বিষয়বস্তু নিয়ে তাৎক্ষণিক গান তৈরি করে জনসমক্ষে গাওয়া। কাহিনিকার কাহিনি বলে, কাহিনির গান গায় আর দোহাররা কয়েকবার সেই গানকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুনরায় পরিবেশন করে। কাহিনিগানের পালার নামকরণেও বৈচিত্র্য রয়েছে, ইতিহাসের মুখ্য চরিত্রের নামে নামকরণ হয় কাহিনিগানের, যেমন—আকবর বাদশা পালা, জানে আলম বাদশা পালা, সেকেন্দার বাদশা পালা, আলমগীর বাদশা পালা প্রভৃতি। লোকরঞ্জনের এ এক অভিনব পদ্ধতি। তবে বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় কাহিনিগানের আসর আর বসে না। কিন্তু গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধদের মুখে কাহিনির ছড়া তথা গান আজও কথায় উপমায় প্রচলিত।

একটা সময়ে কাহিনিগান ছিল মুর্শিদাবাদ বাগড়ীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ। বাগড়ীতে বেশি চাষ হয় আউশ ধানের। ভাদ্র মাসে ঘরে ওঠে ধান। তাই তাকে ভাদুই ধানও বলে। নতুন ধানের নতুন চাল রান্নার দিনই বাড়িতে বসে কাহিনিগানের আসর। বাড়িতে বাড়িতে খাঁচা ভরা মোরগ-মুরগি। মোরগের মাংস আর ভাত। তারপর সন্ধ্যার পরে পরেই শুরু হয় কাহিনিগান। মাঝরাত্রি পর্যন্ত কখনও সারারাত চলে সেই আসর। বলা হয় একটা কাহিনি, গীত হয় অনেক গান। কাহিনিকার একজন এবং দোহার দুই থেকে চারজন। কাহিনিকার প্রথমে গান করে। দোহাররা সেইটুকুই আবার কোরাস সুরে গায়। কাহিনিগান কোনো বাড়িতে হওয়া মানে সেই পাড়ায় সপ্তাহ খানেক আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু

হয়ে যায়। জানানো হয় আত্মীয়-স্বজনকে। আত্মীয়-স্বজনের আগমন কাহিনিগানের অছিলায়। গ্রামের মোড়ল মাতব্বরকে নিমন্ত্রণের রীতিও ছিল। কাহিনিগানের অনুষ্ঠান হওয়ার কারণ থাকত দুইটি। হয় আত্মীয়বর্গের মিলন, না হয় মানত শোধ। কলেরা বসন্তর মতো মারণ রোগে পরিবারের কেউ আক্রান্ত হলে রোগ আরোগ্যের কামনায় আল্লার কাছে মানত করা হতো মোরগ ও কাহিনিগান। ভাদুই ধানের ভালো উৎপাদনের আশাতেও মানত করা হতো কাহিনিগানের। ভাদুই ধান ওঠা থেকে বাগড়ীর নিম্নভূমিতে জন্মানো আমনের আগাম প্রজাতির ধান ওঠা পর্যন্ত অর্থাৎ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মূলত এই তিনমাস আত্মীয়বর্গের মিলন উপলক্ষে কাহিনিগান আর সারা বছরের অনুষ্ঠান মূলত মানতের।

১৯৫০-এর দশকে কাহিনিগানের মূল্য ছিল ৩০ টাকা। তার মধ্যে প্রাপ্তব্য ছিল কাহিনিকারের ১৫ টাকা এবং দোহারদের একযোগে ১৫ টাকা। ১৯৬০-এর দশকে মূল্য বেড়ে যায়। ধার্য হয় ৪০ টাকা। কাহিনিকারের ২০ টাকা এবং দোহারদের একযোগে ২০ টাকা। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে কাহিনিগান ভাঁটার মুখে পড়ে। কাহিনিগান শেখার তাগিদহীনতা ও ১৯৭৫-৯০ মধ্যে পুরানো বয়স্ক কাহিনিকারগণের পরপর মৃত্যুতে কাহিনিগান পড়ে যায় গভীর সংকটে। আজ একুশ শতকে এসে কাহিনিগান বিলুপ্তপ্রায়। পূর্বে মুর্শিদাবাদ বাগড়ীর এমন কোনো এলাকা ছিল না যেখানে একজন কাহিনিগানের ওস্তাদ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অনেক কাহিনিকার ও তার দোহাররা মারা গিয়েছে। 'কাহিনি' শব্দের আক্ষরিক আভিধানিক অর্থ বিবরণ, গল্প, উপন্যাস, বৃত্তান্ত, প্রস্তাব। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোনো ঘটনাকে গল্পের আকারে বিবরণ দেওয়া, অথবা বৃত্তান্তকে উপাখ্যানের ঢঙে উপস্থাপনা করাই 'কাহিনি'। কাহিনির সাথে গান যুক্ত থাকায় বিবরণ, বৃত্তান্ত, গল্প এখানে গৌণ, মূল বিষয় হল সেই গল্পকে, বিষয়-বৃত্তান্তকে, উপাখ্যানের বিবরণকে গানের মাধ্যমে তুলে ধরা। কাহিনিগানের কোনো পালা বা বিষয়ে আগে থেকে গান তৈরি করা থাকে না। মঞ্চে তাৎক্ষণিকভাবেই কাহিনিকার তৈরি করে ফেলে গানের কলি। এখানেই কাহিনিকারের ওস্তাদি বা বিশেষত্ব। কবিত্ব শক্তি না থাকলে কাহিনিগানের কাহিনি বা গান গাওয়া যায় না। যেমন ধরা যাক, আকবর বাদশার পালা। পূর্বের লিখিত কোন পালা নয়, কিংবা ইতিহাসের সাথেও কোনো মিল নেয়। কাহিনিকার কাহিনি ও গান গাওয়ার সময় যখন যা মনে পড়ে তখন তাই-ই উপস্থাপনা করে। উপস্থাপিত বিষয় গানের সুরে ও ছন্দে গীত হয়। তাই, কাহিনিগান মুর্শিদাবাদ বাগড়ীর নিজস্ব ঘরানার লোকগান—আপন সম্পদ।

একজন কাহিনিকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন দোহারের কাজ করলে তবেই কাহিনিকার হতে পারে। এ গান শেখানোর নয়, কিংবা লিখে রাখার জিনিসও নয়, এ গান অনুভবের—অনুধাবনের, ঐকান্তিক চেষ্টার—হৃদয়বৃত্তির ও তাগিদের। তাই কাহিনিকার মারা গেলে তৈরি হয় না নতুন কাহিনিকার। ১৯৫০, ১৯৬০, ১৯৭০ দশকে অন্যতম কাহিনিকার আবুবাক্কার, হারু, বারী, রইসুদ্দিন, খেলাবর চুটিয়ে কাহিনিগান করে বেড়িয়েছেন। তাদের সঙ্গে থেকেছে অনেক দোহার; যেমন—জামাত, ইয়ারবক্স, মুনতাজ, মোক্তার, কাজেম, শুকচাঁদ, সৌরভ প্রমুখ। কিন্তু তাঁরা কেউ-ই কাহিনিকার হয়ে উঠতে পারেননি।

❑ কাহিনিগানের শিল্পী

- **আবুবাক্কার কারিকর :** মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার ফতেপুর গ্রাম। গ্রামটি ডোমকল

থানার ৪৬নং ভগীরথপুর মৌজার অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা স্বতন্ত্র জনপদ। এই গ্রামে বাস করতেন হেরেশতুল্লা, দেরেশতুল্লা নামে দুই ভাই। তাঁরা ছিলেন জমিদার বাড়ির লাঠিয়াল। আর বাস করতেন রিয়াজুদ্দিন। তিনি ছিলেন দেরেশতুল্লা ও হেরেশতুল্লার ভাগ্নে। তাঁদের সকলের বাড়িতেই ছিল হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রবয়নের কাজ। এই তিনজনের ছিল একটি সাংস্কৃতিক দল। লাঠিয়াল কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা জারিগান, সারিগান, হাঁচোগান, কাহিনিগান, একদিল গান করতেন। তখন তুখোড় দোহার আবুবাক্কার ও নওশাদ। আবুবাক্কার রিয়াজুদ্দিনের ছেলে আর নওশাদ হেরেশতুল্লার ছেলে। দেরেশতুল্লা ও হেরেশতুল্লার জীবদ্দশাতেই জারিগানে ও একদিল গানে নওশাদ এবং কাহিনিগানে আবুবাক্কার গায়কের হাল ধরে। আবুবাক্কার চর্চা করেছেন কাহিনিগানের। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিমা, সুর ও স্বরের লালিত্ব, কথন ও বলন তাঁকে পরিচিত করেছিল গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তে। তৎকালীন ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত ও ব্যারাকপুর মহকুমা এলাকাতে যেতেন কাহিনিগান করতে। কিন্তু খুব দুঃখের কথা আবুবাক্কার ১৫.১২.২০২০ মারা গিয়েছেন। আবুবাক্কারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পড়ে করা হয়েছে।

● **আব্দুল বারী সেখ :** আব্দুল বারী সেখ ডোমকল থানার কুলবোনা গরিবপুরের মানুষ এবং ফতেপুরের হেদাতুল্লা সেখের জামাই। তিনিও সংস্কৃতি পাগল মানুষ। ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে নিজ এলাকায় দল তৈরি করেন। জারি, একদিল, হাঁচো গান করতেন। শব্দগানও কিছুদিন করেছিলেন। করেছিলেন কাহিনিগানও। কিন্তু গলার স্বর মোটা ও ভারী হওয়ার কারণে কাহিনিগান তাঁর চলেনি। ১৯৬৭-এর রাজনৈতিক পালাবদলের আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন সংগীত জগতের মানুষ। এই সুবাদে তিনি মানুষের কাছে 'গান্যাবারী' নামে পরিচিত হন। তিনি মারা গেছেন ২০১০ সালে।

● **হারু কারিকর :** হরিহরপাড়া থানার ৫৩নং সিদ্ধিনন্দী ও ৪৮নং তরতিপুর মৌজা মিলে রেজলাপাড়া গ্রাম। তাঁতশিল্পী নইমুদ্দিন কারিকরের ছেলে হারু কারিকর। তিনি গান পাগল মানুষ। দুপুর গড়ালেই হাঁটা দিতেন ফতেপুরের দিকে। জারি, সারি, শব্দ, হাঁচো, কাহিনিগান করতেন। বিয়ে করেছিলেন ওস্তাদ রিয়াজুদ্দিনের মেয়েকে। বিয়ের পর তাঁকে স্বাধীনভাবে গান করার অনুমতি দেন রিয়াজুদ্দিন। ২০০৪ সালে ৭৬ বছর বয়সে মারা যান।

● **খেলাবর ধাত্রী :** ডোমকল থানার বানিয়াখালি গ্রাম। এই গ্রামে জন্ম খেলাবর ধাত্রীর। এলাকায় তিনি পরিচিত 'খ্যালা দাই' নামে। তাঁর পিতার নাম অধর ধাত্রী। লেখাপড়া বলতে পাঠশালায় পড়া। বংশগত পেশা ধাত্রীর কাজ। অবসরে করতেন কাহিনিগান। সুপুরুষ কাঠামো, দারাজ গলা, হাসি হাসি মুখ। কণ্ঠস্বর সুরেলা। পান চিবাতেন সবসময়—

> আমি সেই খ্যালা দাই/তাতে হ্যালা ফ্যালা নাই/তাই কেহ ফ্যালে নাই/গাহিব আজি আকবর বাদশার কাহিনি।/শোন-শোন-শোন—পিতা/মা জননী ভাই ভ্রাতা/শুনিতে আইস সবে আকবর বাদশার কাহিনি।/মানত দিয়াছে আতার ঘরণী।। (আতার—আতা হোসেন সেখ)

তারপর তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে যান নওদা থানা এলাকার টিয়াকাটা গ্রামে শশুরবাড়িতে। সেখানেই তিনি ১৯৮২ সালে মারা যান। তাঁর কাহিনিগানের কোনো উত্তরসূরী নেই।

● **নমি বিশ্বাস :** আরেক কাহিনিকার ছিলেন রানীনগর থানার কাতলামারী গ্রামে। শিল্পীর নাম নমি বিশ্বাস। পিতা হরি বিশ্বাস। পিতামহ তজি বিশ্বাস। তাঁরা কাহিনিগান করতেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তিনি শুধু কাহিনিগানই নয়, হ্যাঁচো গানও করতেন।

● **মীর চাঁদ আলী :** আরেক কাহিনিকার ছিলেন বাগড়ীর ডোমকল থানার গোকুলপুর গোবিন্দপুর মৌজা অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা সাহাবাজপুর গ্রামের মোহনপাড়াতে। ভৈরব নদীর বাঁকে। তিনি মীর চাঁদ আলী। তাঁর পিতার নাম এরাদ আলী মীর। চাঁদ আলী মীর ১৯৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে পরিণত বয়সে মারা গিয়েছেন। গলার স্বর মিহি ও সুললিত। শুধু কাহিনিগানই নয়, ভাসান, একদিল, ভারবোল, ভাটিয়ালি গানও করতে পারতেন।

● **কমর আলি মণ্ডল :** ডোমকল থানার ১৫ নং জিতপুর মৌজা অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা শিরোপাড়া গ্রামের কমর আলি মণ্ডল। পিতা ফারাতুল্লা মণ্ডলও করতেন কাহিনিগান। হালকা-পাতলা ছিপছিপে মানুষ ছিলেন তিনি। জমি জায়গা ভালো ছিল। ছিল দুখান হাল-বলদ। সুখী সংসার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কাহিনিগান করেছেন। গলার স্বর ভালো না থাকলেও দোহাররা ছিল ভালো। দোহারদের জৌলুসে আশেপাশের গ্রামে গান করতেন। কিন্তু তিনি কোনো পয়সা নিতেন না। দোহাররা মরে যাওয়ার পর তিনিও গান ছেড়ে দেন। ১৯৯৮ সালে তিনি পরিণত বয়সে মারা গিয়েছেন।

● **রইসুদ্দিন মণ্ডল :** ডোমকল থানার ২৮নং মৌজাগ্রাম বিলাসপুর। এই গ্রামে বাস করতেন রইসুদ্দিন মণ্ডল, পিতা-নানকু মণ্ডল। তাঁর গানের ভালো গলা ছিল। ফর্সা সুন্দর চেহারার মানুষ। কিন্তু তিনি খোঁড়া। গান করতেন দরদ দিয়ে। জারিগান, ভাদুগান, শব্দগানের সাথে কাহিনিগান করতেন। তবে প্রতিষ্ঠা পান কাহিনিগানে। গানের দৌলতে তাঁর নাম পালটে যায়। তিনি পরিচিত হন 'গান্যা রইসুদ্দি' নামে। সুখী পরিবারের সন্তান। পয়সার কোনো চাহিদা ছিল না। গান করার পর কেউ পয়সা দিলে নিতেন। না দিলেও কিছু বলতেন না। কারণ তিনি গান পাগল মানুষ। তিনি মারা গেছেন ২০ বা ২২ বছর আগে।

● **ধনী খাঁ :** হরিহরপাড়া থানার ৫৯ নং মৌজা চোঁয়া। এই চোঁয়া নতুনপাড়া গ্রামের একজন বাসিন্দার নাম ধনী খাঁ। তাঁর পিতার নাম কালু খাঁ। তাঁর ৭৮ বৎসর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ২০১৮ সালে। ধনী খাঁ কাহিনিগান করতেন। সোভান খাঁ ও জঙ্গালী খাঁ ছিলেন ধনী খাঁর কাহিনিগানের দোহার। ১৯৪০ দশক থেকে ২০১২ পর্যন্ত তিনি এলাকায় ও এলাকার বাইরে দাপটের সাথে কাহিনিগান করেছেন।

● **আসরাফ সেখ :** হাসনাবাদ মুর্শিদাবাদের লালবাগ শহরের শহরতলি। মুর্শিদাবাদ থানার ৭৭নং মৌজাগ্রাম হাসনাবাদ। এই হাসনাবাদ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এলাহি মিস্ত্রি ও নাস্তার সেখের মতো জারি গানের শিল্পী, সাবুমিস্ত্রী ও বাহারমিস্ত্রীর মতো আলকাপ শিল্পী, রাহাতুল্লা সেখের মতো দেহতত্ত্ব ও মারফতি গানের শিল্পী এবং কাহিনিগানের যুগান্তকারী শিল্পী আসরাফ সেখ। আসরাফ সেখ কৃষক ঘরের সন্তান। কাহিনিগান তাঁর জীবনের সাধনা। দোহার না থাকলেও তিনি একাই কাহিনি বলতে ও গান গাইতে পারতেন এবং সেইভাবেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন।

❑ কাহিনিগানের নমুনা

বাগড়ীর কাহিনিগানের আসরে আবুবাক্কার কারিকর বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। আবুবাক্কার কারিকরের শিক্ষাগত মান গ্রামের পাঠশালা। বাপ-চাচার গান শোনার নেশায় পড়াশোনা হয়নি। কিন্তু পড়াশোনা না হলেও তাঁর চর্চা ছিল। গানের আসর না থাকলে বাংলা পুঁথি পড়তেন। কাহিনিগানের গল্প-ঘটনায় যত চরিত্রই থাকুক না কেন, তিনি সব চরিত্রের অভিনয় একাই করতেন।

তিনি অবলীলাক্রমে মহিলা চরিত্রের ক্ষেত্রে মহিলা কণ্ঠ ও পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে পুরুষ কণ্ঠ দিয়ে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য কাহিনির কথা ও গান গাইতে পারতেন। এইখানেই তাঁর কাহিনিগানের সার্থকতা। কাহিনি কথনের এই নাটকীয়তা তাঁকে কাহিনিকারদের জগতে রাজা করে রেখেছে। ০৪.১০.২০২০ তারিখে আবুবাক্কারের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাৎকারে তাঁর বলা কথাগুলি তুলে ধরার প্রয়াস করছি

● **আবুবাক্কার :** ২০০১ সাল থেকে এই ২০২০ সালের আজকের দিন পর্যন্ত আমি আর কাহিনিগান করিনি। এর নেপথ্যে কারণ আছে।

● **লেখক :** কী কারণ?

● **আবুবাক্কার :** খ্রিস্টীয় ২০০০ সালের বন্যার পর কাহিনিগানের একটি প্রতিযোগিতার আসর বসে নওদা থানার ঝাউবোনা গ্রামে। সাতদিন ধরে চলে সেই গানের অনুষ্ঠান। বাগড়ীর সমস্ত কাহিনিকার, গায়ক, দোহার উপস্থিত হয়েছিল। শ্রোতা-দর্শক ছিল অগণিত। আমি গান করেছিলাম প্রথম রাউন্ডে 'কোঠ্যারাজা', দ্বিতীয় রাউন্ডে 'লোহাচোরের বেটা পাত্যা চোর'। কোয়ার্টার ফাইনালে 'রাধাবল্লভ', সেমিফাইনালে 'কহক কুণ্ডল পাখি' ও ফাইনালে 'জানে আলম বাদশা'। 'কোঠ্যারাজা', 'লোহা চোরের ব্যাটা পাত্যা চোর' ও 'রাধাবল্লভ' কাহিনি ছোটো, গানও কম। কিন্তু গলার স্বর ও ভঙ্গিমাতে আমি উত্তীর্ণ হয়ে যায়। 'কহক কুণ্ডল পাখি' কাহিনির ঘটনাও মিষ্টি, গানও করুণ। আমি সেমিফাইনালে জিতে ফাইনালে উঠি। এমন সময় বাজ পড়লো মাথায়। জেতার বাজ। নেশায় বুঁদ হয়ে গেলাম। আমাকে জিততেই হবে। হৃদয় নিঙড়ানো দরদ দিয়ে ফাইনালে করলাম 'জানে আলম বাদশা' কাহিনি। আমার বিপক্ষ পাল্লাদার হরিহরপাড়া থানার চোঁয়া নতুনপাড়া গ্রামের ধনী খাঁ। তিনি করলেন 'আকবর বাদশা'র কাহিনি। ধনী খাঁ তাঁর কাহিনিগান আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করে দিলেন। তার আধঘণ্টা পরে আমি উঠি গান করতে। সমস্ত লোক মনে করেছিল যে, রাত্রি বারোটার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি শেষ করলাম ভোর চারটেতে। মঞ্চে উঠে প্রথমেই উপস্থিত সর্বসাধারণের নিমিত্তে ভক্তি নিবেদন করি, যা কেউ করে না। তারপর আসর বন্দনা করি। চিরাচরিত প্রথায় আল্লা, আল্লার রসুল, পীরকে বন্দনা না করে পরিস্থিতিকে বন্দনা করলাম। গান তৈরি করা, সুর দেওয়া ও গাওয়া একসঙ্গে। গাইলাম—

> লৈকা ছাড়লাম বদর রে বলে/ও লৈকা ঠেক হইল ঘাটে রে,/ও লৈকা ঠেক হইল ঘাটে।/কি দোষে পেল্যা মা গঙ্গা, ও গঙ্গা, গঙ্গা রে/ও গঙ্গা বাঁধিলি লৈকা ত্রিমোহিনীর ঘাটে।/যাবার ছিল তজির হাটে/বাঁধা পড়লাম ত্রিমোহিনীর ঘাটে, ঘাটে রে,/ও লৈকা ঠেক করিল কে ঘাটেরে/দুখে দুখে দুখের জীবন বিধি, ও বিধি রে/আবার দিলে ত্রিমোহিনীর দুখ রে, ত্রিমোহিনীর দুখ/ত্বরাও বিধি দুখের সাগর, ত্বরাও দুখের সাগর/সইতে নারি বিধি রে, সইতে নারি এ দুখ।।

গান শেষ হতে দোহারসহ আমি উঠে দাঁড়িয়ে সর্বসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তারপর বলি—আমার আজকের কাহিনি পালা 'জানে আলম বাদশা'। বিপুল করতালি পড়ল। কাহিনি শুরু করার আগেই জনগণ ফুল, টাকা ও মিষ্টি দিয়ে আমাকে বিজয়ী ঘোষণা করে দিল। আমি সেগুলোকে কুড়িয়ে স্টেজের পাশে রেখে শুরু করলাম 'জানে আলম বাদশা'র কাহিনি। শুরু করলাম গান দিয়ে—

> নামাজ পড়ে বাদশার চোখে ঝরে পানি গো আল্লা, চোখে ঝরে পানি
> একটা ব্যাটা দাও মোরে আল্লা—ওগো বারিতাল্লা করে মেহেরবানি,
> ওগো আল্লা করে মেহেরবানি।

বেগম বন্ধ্যা, তাই বাদশা নিঃসন্তান। রাজা আছে—রাজ্যপাট আছে কিন্তু রাজপুত্র নেই। সেই রাজ্যের আর কি দাম! বাদশা গোপনে কাঁদাকাটি করে, মনের দুঃখে ছাড়তে চায় সংসার, ছাড়তে চায় রাজ্য। কাউকে মুখ দেখাতে চায় না বাদশা। কারণ প্রজারাও ধিক্কার জানাই বাদশাকে। বাদশার মুখ দেখে কেউ কেউ আবার যাত্রাও করে না। প্রজাদের কাছে বাদশা আঁটকুড়া। প্রজাদের অপবাদ রাজার কাছে বড় যন্ত্রণার। তাই, বাদশা দেশত্যাগ করছেন। ছেড়ে যাচ্ছে রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ। রাস্তায় নেমে বিবির উদ্দেশ্যে প্রবোধ বচন—

থাকো—থাকো—থাকো বিবি, থাকো ইমানেতে
আমারে পাইবা দেখা রোজ-কিয়ামতে
শোনো—শোনো—শোনো—বিবি, থাকো সহি সালামতে।

বিবিকে এই বলে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় চলতে থাকেন বাদশা। রাজাকে চলে যেতে দেখে রাজমহিষী বলেন—'এ আমার কি হলো, স্বামী আমাকে ত্যাগ করে সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছেন!' কাঁদতে থাকেন বিবিও, কান্নাভেজা কণ্ঠে বেগম বলেন—

> শোনো শোনো ওহে বাদশা বলি যে তোমারে,/ওরে তুমি যাচ্ছো ফকির হয়ে/তোমার বাদশাহী করিবে কেডারে।/শোনো শোনো শোনো বাদশাহ বলি যে তোমারে।/বাদশাহ ঘুরে দাঁড়ায় এবং জবাব দেয় বেগমকে—/ইমান ধরে রাখো বেগম, থাকো সহি-সালামতে।/আমার বাদশাহী আল্লা চালাবে তোমার ইমানের দৌলতে।।

বাদশা রাস্তায় চলেছেন। হাঁটছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো। বাদশার দুঃখ দেখে, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা দেখে আল্লা খুশি হলেন। পাঠালেন এক ফেরেস্তা। আল্লা ফেরেস্তাকে নির্দেশ দিলেন, 'বেগমের জন্য এমন একটা ওষুধ দিয়ে আসো, যেন বেগম সন্তানসম্ভবা হয়'। আল্লার নির্দেশে ফেরেস্তা মর্ত্যে নেমে এল। পথ আগলিয়ে ধরল বাদশার। ফেরেস্তা বাদশাকে একটি গাছের শিকড় ও গাছের পাতা তুলে দিল এবং নির্দেশ দিল এগুলি শিলপাটায় বেটে তার রস তৈরি করে আধাআধি বাদশা ও বেগম খেলে বেগম শীঘ্রই সন্তানসম্ভবা হবে। ফেরেস্তা এই আশ্বাসবাণী দিয়ে অন্তর্ধান হল। বাদশা সেই শিকড় ও পাতা নিয়ে সহাস্যে রাজমহলে ফিরে আসলেন। বেগমকে সকল কথা খুলে বললেন এবং ফেরেস্তার নির্দেশ ব্যাখ্যা করলেন। বেগমও সেইমতো শিকড় ও পাতা শিলপাটায় বেটে দুই পেয়ালা রস তৈরি করলেন এবং স্বামী-স্ত্রী মিলে সেই রস সেবন করলেন। তারপর যথাসময়ে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তখন বাদশা আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এইভাবে—

> হায় গো আল্লা বারিতাল্লা/ধনীকে নির্ধনী কর, ও আল্লা আল্লা রে/ধনীকে নির্ধনী কর হে, নির্ধনী কর ধনী/তোমার কুদরতের খেলা কে বুঝিতে পারে/ওগো আল্লা কে বুঝিতে পারে।।

বাদশা নিজের বাদশাহী কর্ম সুখে করতে থাকে। পুত্রও বড় হয়। একসময় বাদশাকে বন্দি করে সেই পুত্রই। এই ভাবে কাহিনি এগিয়ে যায় কথায় ও গানে। কাহিনি ও গান দুই-ই একসময় শেষ হয়। তুমুল হর্ষধ্বনিতে ঘোষণা হয় রায়। প্রথম স্থান অধিকার করে আবুবাক্কার ও তাঁর দল। জিতে নিলাম পিতলের বড়ো ঘড়া। এই খবর ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

● **লেখক :** আপনি কাহিনিগান গাওয়া কেন ছাড়লেন—

● **আবুবাক্কার :** নওদা থানার ঝাউবোনা গ্রামের সাফল্যে আমার চারিদিকে নামডাক হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে কাহিনিগান গাওয়ার ডাক আসে। হঠাৎ ডাক পড়ল শিবনগর গ্রাম থেকে। মাইনুদ্দিন মাস্টারের বাড়িতে গান। গানের পালা 'কোঠ্যারাজা'।

● **লেখক :** 'কোঠ্যারাজা'র কাহিনির ঘটনাটা বলুন।

● **আবুবাক্কার :** পালার কাহিনিটা সংক্ষেপেই বলছি—পালার প্রধান চরিত্র রাজা ও সন্ন্যাসী কোঠ্যা। রাজা নগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পৌঁছেছেন এক জঙ্গালে। সেই জঙ্গালে কোঠ্যার আশ্রম। কোঠ্যা ধূলায় বসে কাঠাকাঠা ধূলাবালি মাপছে আর এক এক নাম করে সেই ধুলোগুলো একপাশে ফেলছে। রাজা জিজ্ঞেস করেন কোঠ্যাকে যে সে কি করছে। এই প্রশ্ন গানের মাধ্যমে এইভাবে করি—"বিধি রে—ও না বিধি/এই না বালুচরে রে/ওরে কিসের ধূলা মাপো তুমি/কিসের ধূলা মাপো।" কোঠ্যা সন্ন্যাসী সটান উত্তর দেয় যে সে সকল লোকের আহার মাপছে। রাজা প্রশ্ন করে, 'মানুষ ধূলা খেয়ে বালি খেয়ে থাকবে নাকি' কোঠ্যা উত্তর দেয়—'আরে না—না, যার নামে আহার মাপব, সে খেতে পাবে আর যার নামে আহার মাপব না, সে হাজার চেষ্টা করলেও খেতে পাবে না'। গানগুলি ছিল এমন—

> আরে এই না কোঠ্যা মাপি কোটায়/এই না বালুচরে রে—এই না বালুচরে।/ওরে সকল লোকের আহার মাপি/সকল লোকের আহার মাপি রুজির নিশানাতে/এই না বালুচরে রে—এই না বালুচরে।

কোঠ্যা সন্ন্যাসীর উত্তর শুনে রাজা বিস্মিত হয়। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তখন কোঠ্যা সন্ন্যাসী খড়ে দুটি গিঁট বেঁধে জোট বাঁধছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে রাজা জানতে চায়, 'কী করছ সন্ন্যাসী' কথাগুলি এমন ছিল—

> বিধি রে আরে ও বিধি/এই না খড়ে রঙ দিয়ে রে/এই না খড়ে গিঁট দিয়ে রে/ওরে কিসের ঝোট বাধো তুমি/হায় রে কিসের ঝোঁট বাধো।

তখন সন্ন্যাসী বলেন—'আমি আল্লার ইচ্ছায় ঝোট (জোট) বাঁধছি। যার সঙ্গে যার বিয়ে হবে, তার নামের সাথে নাম দিয়ে আমি তাদের ঝোট বাঁধি'। রাজা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই রাজার রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে এইসব কর্ম থেকে সন্ন্যাসীকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে। রাজার এমন অবিশ্বাস দেখে কোঠ্যাও চিৎকার করে উঠে বলে, 'ঠিক আছে আমি আপনার সাথে গৌরীর এই ঝোট বেঁধে দিচ্ছি। গৌরীর সাথে আপনার বিয়ে হবে। কারোর রোধ করার ক্ষমতা নেই' এই বলে রাজা ও গৌরীর নাম দিয়ে খড় ধরে মাথায় একটা গিঁট দিয়ে ছেড়ে দিল কোঠ্যা। সঙ্গে সঙ্গে রাজা মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো চলে গেল গৌরীর বাড়ি দিকে। রাজার মুখে শুধু একটাই বচন—'আমি গৌরীকে বিবাহ করব।' "গৌরী—ও গৌরী রে—/কোথায় গৌরী প্রাণেশ্বরী, কোথায় তোমার ঘর/চলে এসো আমার সাথে বাঁধিব সংসার।"

এইভাবে কোঠ্যারাজার কাহিনি ও গান এগিয়ে যায়। রাজা গৌরীকে বিয়ে করে নিয়ে আসে রাজপ্রাসাদে। অন্য রানিরা গৌরীকে মেনে নিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। তখন রাজা ও রাজপারিষদগণ রানিদের বুঝিয়ে শান্ত করে এবং যৌথভাবে সংসার করতে থাকে। কিন্তু গৌরী রাজার সঙ্গে সংসার করলেও তার ভূমিকা কখনও মন্থরার মতো, আবার কখনো বা কৈকেয়ীর মতো। গৌরীর কুপ্রভাবে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা রাজার হাতছাড়া হয়ে গেছে। রাজপ্রসাদসহ সামান্য অংশ রাজত্বের পরিধি। প্রজারা কর দেয় না। বন্যা, খরা, মহামারি লেগেই আছে। গৌরী শুরু করে পরিবারের মধ্যে সামাজিক অত্যাচার। তাড়াতে চায় অন্য রানিদের। অবলম্বন করে কুটিল পথ ও তার নিমিত্তে কুটিল পাথেয়। এইভাবে কাহিনি ও গান টানটান উত্তেজনায় এগোচ্ছে তখন আমার (আবুবাক্কার) ঠিক সামনেই বসেছিলেন মাইনুদ্দিন মাস্টারের বাবা। গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন অভিনয়রূপী কাহিনিগান। গৌরীর চরিত্রে রাগে-ক্ষোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রতিশোধ স্পৃহায় মেতে ওঠেন। মুষ্টিবদ্ধ হাত সটান বসিয়ে দেন গৌরী রূপী আমার স্কন্ধে। আরেক মুষ্টি তুলতেই ধরে ফেলেন মাইনুদ্দিন মাস্টার। হৈ হল্লা শুরু হয়ে যায়। পণ্ড হয়ে যায় কাহিনিগান। আমি আমার দোহারদের নিয়ে দ্রুতপদে পালিয়ে আসি।

● **লেখক :** তারপর কী আর কাহিনিগান করেননি?

● **আবুবাক্কার :** এই ঘটনা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হতে থাকে। ছেলেরা বড় হয়েছে। তারা যখন আব্বার অপমানের কথা শুনল তারা আমাকে গান গাইতে পুরোপুরি নিষেধ করে দিল। পারিবারিক নানা অশান্তির কারণে আমিও ঠিক করলাম আর কোনোদিন গান গাইব না। সেই ২০০০ সালের শেষ মাস থেকে আজ পর্যন্ত আর কোথাও গানও করিনি।

প্রায় কুড়ি বছর আবুবাক্কার গান গাননি, কিন্তু তাই বলে গান ভুলেও যাননি। গলার কণ্ঠস্বরও ঠিক আছে। আবুবাক্কারের বয়স ছিল ৯২ বছর। সক্ষম ও সচল। সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করতেন, হাট-বাজার করতেন। আর করতেন আল্লা-বিল্লা। কিন্তু তিনি আর গান করতেন না। প্রতিবেদক আমি, গবেষক তাজউদ্দিন বিশ্বাস ও সাংবাদিক আশিস জানা তিনজন মিলে গিয়েছিলাম আবুবাক্কারের কাছে গত ০৪.১০.২০২০ তারিখে। তাঁর দোহার চাচাতো ভাই সৌরভের বাড়িতে গিয়ে কাহিনিগানের নমুনা চাইতেই উপরের গানগুলি করলেন। আমাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার দু'মাস পরেই আবুবাক্কার ১৫.১২.২০২০ তারিখে মারা গেছেন। তাই, এই গান অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে।

তথ্যের সন্ধানে

১. আবুবাক্কার কারিকরের কাছে থেকে পাওয়া কাহিনিগানের নমুনা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কাহিনিশিল্পীদের পরিচয়। তিনি বর্তমানে প্রয়াত।
২. গবেষক তাজউদ্দিন বিশ্বাস থেকে প্রাপ্ত কাহিনিগানের তথ্য। তিনি বর্তমানে প্রয়াত।

উত্তর ২৪ পরগনার ব্রতকথা : অন্য ভাবনায়

পুষ্পেন্দু মজুমদার

লোকসাহিত্য সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি ধারা। লোকসাহিত্য ও মূলধারার সাহিত্য ক্রমাগত পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তোলে। 'লোক' (Folk) শব্দে বোঝায় নিবিড় সন্নিবিষ্ট দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বহনকারী কোন জনগোষ্ঠী (Folk Society) এবং তাদের সামগ্রিক কৃতিকেই একত্রে আমরা বলে থাকি লোকসংস্কৃতি (Folk Culture)। আমাদের সমাজজীবনে নানা আচার-বিচার -প্রথা-অনুষ্ঠান, সংস্কার-বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ, লোকায়ত নানা ট্যাবু (Tabu) ও টোটেম (Totem) প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রয়েছে। এসব কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা উদ্ভাবিত নয়, জনমানসই এদের সৃষ্টির উৎসভূমি।

মূলত গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে এগুলির প্রচার ও প্রসার ঘটে। নামহীনতা লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোকসংস্কৃতি একদিকে যেমন তার শিকড় প্রসারিত করে জাতির অতীত ঐতিহ্য ও স্মৃতির গভীরে, ঠিক একই সঙ্গে তার ডানা মেলে দেয়, সমসাময়িক বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে। ফলত লোকসংস্কৃতির যেকোনো ধারায় তা-সে সাহিত্য-সংগীত বা চারুশিল্প যাই হোক না কেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে একটা জাতির জীবনভাবনা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। বর্তমান নাগরিক ব্যস্ততায় আমরা আমাদের নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সৃষ্টির প্রতি ক্রমশ বিমুখ হয়ে পড়ছি। বাংলার ব্রত কথাগুলি লোকায়ত ধর্মসাধনা ও লোকসাহিত্যের মূল্যবান উপাদান হিসেবেই স্বীকৃত হওয়ার দাবী রাখে।

'ব্রত' শব্দটির সাধারণ অর্থ নিয়ম বা সংযম। '√বৃ' ধাতু থেকে 'ব্রত' শব্দটির উৎপত্তি। লোককথার একটি বিশিষ্ট শাখা হল ব্রতকথা। বাংলার লৌকিক দেবতাদের অবলম্বন করে এগুলি রচিত হয়েছে। দেবতার কাছে কিছু কামনা করে সমাজে যেসব আচার-অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে; প্রচলিত অর্থে তাকেই 'ব্রত' বলা হয়। আবার এভাবেও বলা যায়, মানুষের কায়িক বা মানসিক বিপর্যয়

ঘটলে বা পূর্বাবস্থার পরিবর্তন হলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। সেই কামনা-বাসনা পূরণের চাহিদা থেকেই ব্রতকথার উৎপত্তি। ব্রতকথা মূলত আদিমসংস্কার ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির মিশ্রণের ফল। যেহেতু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর যোগ থাকে, সেহেতু বিশ্বাস ও সংস্কারের গভীর সংযোগ লক্ষ করা যায় ব্রতকথার সঙ্গে। মুখ্যত মেয়েরা স্বামী, সন্তান বা পরিবারের মঙ্গল কামনায় ব্রত পালন করে। ব্রতপালনের পাশাপাশি ব্রতকথাটি শোনাও আবশ্যিক। নাহলে ব্রতপালনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মঙ্গলকাব্যগুলির মতোই ব্রতকথা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। তাই ব্রতকথা বলা বা শোনা ধর্মীয় আচার হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই ব্রত মূলত পালনীয় আচারসর্বস্ব। বাংলার প্রতি নিভৃত পল্লিতে প্রতি হিন্দুর গৃহে বিভিন্ন ব্রতের অনুষ্ঠান চলে আসছে। ব্রতকথাগুলি ওই যুগে দেশের সুখ-সমৃদ্ধির অলিখিত ইতিহাস। 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করে থাকে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা-অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য কামনায়, সৌভাগ্য কামনায় ব্রত করে।

বাঙালির ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে সমাজ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বাংলার ব্রতগুলির মধ্যে অনেকগুলি আদিবাসীসমাজ থেকে পাওয়া বেশকিছু গাছ বা গাছের ফল দেবতার প্রতীক হিসেবে ব্রতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন—শিবের বেল, শীতলার নিম, কৃষ্ণের কদম ইত্যাদি। আবার ব্রতের কিছু উপাদান এসেছে আদিম সংস্কৃতি থেকে। যেমন, ধানের ছড়া, আঁখ, কুশ, মঙ্গল ঘট, গোবর, কড়ি, আলপনা, সুপারি, পান, নারিকেল ইত্যাদি। ব্রতের অন্যতম উপাদান হলো ছড়া। ব্রতে যেহেতু প্রধানত মেয়েরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাই ব্রতগুলির মধ্যে নারীমনের কামনা-বাসনা যেমন থাকে, তেমনই সামগ্রিক মঙ্গল ভাবনাও কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গের অতি প্রাচীন এবং বিপুল ঐতিহ্যবাহী জেলা উত্তর ২৪ পরগনার ইতিহাস, শিক্ষা, লোকসংস্কৃতির নানান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় এই জেলার অধিবাসীদের গৌরবান্বিত করেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও বিধাননগর মিলিয়ে মোট পাঁচটি মহকুমা আছে। বারাসাত, ব্যারাকপুর ও বিধাননগর—এই তিনটি মূলত শহরাঞ্চল। বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার একটা বড়ো অংশ গ্রামীণ এবং নদীবেষ্টিত জীবনযাত্রা রয়েছে। জেলার উত্তর প্রান্তরে অবস্থিত বনগাঁ মহাকুমা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী। এই মহকুমা পূর্ব- পাকিস্তানের যশোরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মহকুমার সাংস্কৃতিক জীবনে দুই বাংলার অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জেলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে বসিরহাট মহকুমা। অবিভক্ত খুলনা ও সাতক্ষীরার পশ্চিম অংশে অবস্থিত এই মহকুমায় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

এই মহকুমার দক্ষিণাংশে অবস্থিত বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল এবং পরিশেষে সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে বসবাসকারী নিম্নবর্গের মানুষজন নানা রকম লৌকিক আচার-প্রথা-সংস্কার পালন করে থাকেন। সুন্দরবনসহ অন্যান্য গ্রামীণ জনজীবনে লৌকিক দেবদেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে। জেলার সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হলো পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ। ফলত তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা বহমান রয়েছে। বাঘ, কুমির ও সাপের সঙ্গে লড়াই করে এই অঞ্চলের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। মধু, মাছ ও কাঠ সংগ্রহ করে মানুষকে জীবিকা অর্জন করতে হয়।

দক্ষিণবঙ্গের বাদা অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী (Folk God & Godes) হিসেবে বনবিবি ও দক্ষিণরায় পূজিত হন। জেলার অন্যত্র কলেরা রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে ওলা বিবির দরগায় মানত করা হয়। এই মানত হল গ্রামবাংলার লৌকিক বিশ্বাসের প্রতিফলন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় (Field Work) এখনও দেখা যায়, ধাম-থান-মন্দিরকেন্দ্রিক যে লোকবিশ্বাস (Folk belief) রয়েছে, সেখানে দেখা যায়, মানত একটি বিরাট বড়ো জায়গা করে নিয়েছে। দেখা যায়, জেলার জলা-জঙ্গাল এলাকায় সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে মনসার পূজা করা হয়। বরিশালের লোকেরা শ্রাবণ মাসে বাড়িতে ঘট প্রতিষ্ঠা করে মনসা গান ও মনসার পূজা করে থাকেন। এইসব পূজার অনেকগুলি অন্যতম অঙ্গ ব্রত। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস' অন্বেষণে দেখেছেন যে, ব্রতকথার সম্প্রসারিত রূপ হল এইসব মঙ্গালকাব্য। অর্থাৎ ব্রতকথার আখ্যান ভেঙে মঙ্গালকাব্যের কাহিনি পূর্ণরূপ পেয়েছে।

বনগাঁ মহকুমার সীমান্তবর্তী অংশে বসবাসকারী মানুষের একটা বড়ো অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর থেকে আগত। 'তারার ব্রত' নামাঙ্কিত বিশেষ এক ধরনের ব্রত পালন এখানে লক্ষ করা যায়। সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটি তারার উদ্দেশ্যে মাটির খুড়িতে মুড়ির মোয়া রেখে প্রদীপ জ্বালানো হয়। কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করে থাকে।

নদীবেষ্টিত অঞ্চলে কুমিরের দেবতা কালু রায় পূজিত হন। বসন্ত রোগের হাত থেকে বাঁচতে জেলার প্রায় সর্বত্র শীতলাদেবীর পূজা করা হয়। গোটা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে শিব চতুর্দশী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, অম্বুবাচী, বিপদতারিণী ব্রত, শীতলার ব্রত, সত্যপীরের ব্রত, মঙ্গাল চণ্ডীর ব্রত প্রভৃতি নানাধরনের ব্রত পালিত হয়। লৌকিক ব্রতের মধ্যে কুলুই মঙ্গালচণ্ডীর ব্রত চণ্ডীমঙ্গালের ভিন্ন এক রূপ। ব্রতকথা হিসেবে এখানে প্রচলিত আছে দেবী মঙ্গালচণ্ডীর পূজা প্রচারের অন্য এক কাহিনি। একজন নারীর পরিবার; বংশকে কেন্দ্র করে যে মঙ্গাল ভাবনা, তারই প্রকাশ হয়েছে কলুই মঙ্গালচণ্ডীর ব্রতে। অঘ্রান মাসের যে-কোনো মঙ্গালবারে এই ব্রত পালন করা হয়। বাড়ির উঠোনে আলপনা দিয়ে কুলগাছের ডাল পুঁতে তার সামনে ঘট বসিয়ে চারপাশে কুলো সাজিয়ে সধবা মহিলারা এই ব্রত পালন করেন। ব্রতশেষে নদীতে কুলো ভাসানো হয় এবং মাঙ্গালিক ছড়া উচ্চারণের সঙ্গো সঙ্গো এই ব্রত সম্পন্ন হয়। এই ব্রতে বলা হয়েছে—

কুলো গেল ভেসে
ছেলে এলো হেসে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নদীবহুল অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের দেবতা মাখাল ঠাকুর নিত্য পূজিত হন। মাঝি ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা পাওয়ার অভিলাষে এই 'মাখাল ব্রত' পালন করে থাকেন। জলাশয়ের পাশে মাটির স্তূপ তৈরি করে সিঁদুর দিয়ে পূজা করা হয়। জেলায় শীতলার সঙ্গো সঙ্গোই জ্বরের দেবতা জ্বরাসুর একই মন্দিরের পূজিত হন। শিশু-কিশোরদের মঙ্গালাকাঙ্ক্ষী দেবতা হলেন পাঁচুঠাকুর। পাঁচুঠাকুরের সঙ্গো শিবের সম্পর্ক রয়েছে। বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার দেবতা হলেন আটেশ্বর। মানুষের সার্বিক কল্যাণের দেবতা হিসেবে বাবা পঞ্চানন নিত্য পূজিত হন। চর্মরোগের দেবতারূপে ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু গ্রামীণ এলাকায় পূজিত হন। রোগ মুক্তির কামনায় ঘেঁটুব্রত পালন করা হয়। ফাল্গুন মাসে সংক্রান্তির দিনে হাঁড়ির মধ্যে গোবর দিয়ে ঘেঁটু মূর্তি প্রস্তুত করা হয়। পূজায় দেওয়া হয় ঘেঁটু ফুল বা ভাঁটুই ফুল। রাতে মহিলারা ঘেঁটুর গান

গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি যায়। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বসন্তবুড়িব্রত পালন করা হয়। যারা এই ব্রতটি পালন করে, তারা শীতলাব্রত পালন করে না। বসন্ত রোগ নিরাময়ের কামনায় এই ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। সারাদিন উপবাস থেকে পূজার স্থানে একটি ডাব রাখা হয়। ডাব দিয়ে ঘটকে স্নান করানো হয়। প্রিয়জনদের নিরাপদে ঘরে ফেরার কামনায় ভাদ্র মাসে পালিত হয় ভাদুলি ব্রত। মেয়েরা ব্রতটি পালনের সময় মুখে মুখে ছড়া কাটে—

এ নদী সে নদী একখানে মুখ
ভাদুলি ঠাকুরানী ঘুচাবেন দুঃখ
এ নদী সে নদী একখানে মুখ
দিবেন ভাদুলি তিন কুলে সুখ।

আশ্বিন মাসে অলক্ষ্মী বিদায়ের ব্রত হিসেবে পালন করা হয় গাড়শী ব্রত। কোজাগরী পূর্ণিমায় যে লক্ষ্মীপুজো হয়, তা আসলে শ্রীবৃদ্ধির কামনায় করা হয়। অন্যদিকে অমাবস্যা তিথিতে কালীপুজোর দিন যে লক্ষ্মীপুজো করা হয় তা হল অশুভ বিতাড়নের মধ্যে দিয়ে শুভ শক্তির আগমন প্রত্যাশা। সুতরাং এখানে শুভ-অশুভ শক্তির মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে। লোকায়ত বিশ্বাস (Folk belief) অনুসারে দেখা যায়, মূলত নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে এই অলক্ষ্মী বিদায় সংক্রান্ত ব্রতকথার প্রচলন রয়েছে। আমরা আগেই বলে নিয়েছি, ব্রতকথার সঙ্গে শাস্ত্রাচারের কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত দেশাচার ও স্ত্রীআচার এইসব ব্রতকথার মূলে রয়েছে। মহিলারা ছড়া কাটেন—

পোকামাকড় দূরে যায়
লক্ষ্মী ঠাকুরানী ঘরে আয়

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সংস্কৃতির প্রবাহমান ধারা বহুমাত্রিকতার বহু বিচিত্র আবেদন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ব্রতকথার মতো লোকসংস্কৃতির বহু উপাদান তার মধ্যে অঙ্গীভূত।

তথ্যের সন্ধানে

১. দীপঙ্কর মল্লিক : 'লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গালকাব্য', দিয়া পাবলিকেশন
২. অনিমেষকান্তি পাল : 'লোকসংস্কৃতি', প্রজ্ঞা বিকাশ
৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বাংলার ব্রত', অবনীন্দ্র রচনাবলী, দে'জ পাবলিকেশন
৪. শীলা বসাক : 'বাংলার ব্রত পার্বণ', আনন্দ পাবলিকেশন
৫. শিপ্রা ঘোষ : 'লোকসংস্কৃতির আঙিনায়', পুস্তক বিপণি

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে বাঁকুড়ার লোকশিল্প

দশরথ রজক

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আর্য-অনার্য বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আগমনে শিল্প সৌকর্যের উৎকর্ষতাতে সমৃদ্ধি লাভ করেছে জনজীবন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠী গ্রহণ করেছে এবং সম্পৃক্ত হয়েছে নিজ নিজ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। মানবজীবন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলিকে গ্রহণ করে। সাহিত্য যেমন সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি সমাজও মানে-সম্মানে প্রতিপন্ন হয়েছে শিল্প-সংস্কৃতিকে নিয়ে। সময় ও কালের প্রয়োজনে বহু প্রাচীন লোকশিল্প আজ অবলুপ্তির পথে। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় লোকশিল্পগুলি কোনো একক শিল্পীর শিল্পকর্ম নয়, তা সুসংহত মানবসমাজ থেকে উদ্ভূত। সমাজের প্রয়োজনে আপন আপন গুনে লোকশিল্পগুলি সমৃদ্ধ। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার অন্যতম মৌলিক পথ বলা যেতে পারে লোকশিল্পকে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থেকে শুরু করে লোকায়ত মানুষের অন্তরস্থিত সৌন্দর্যের এবং সাহিত্য শৈলীর প্রকাশ রূপ হল লোকশিল্প। তাই সাহিত্য, সংস্কৃতির ও সভ্যতার স্তম্ভ হল লোকশিল্প।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বহু চর্চিত বিষয়গুলির মধ্যে লোকশিল্প অন্যতম। সাহিত্যে বার বার উঠে এসেছে শিল্প ও শিল্পীর কথা। শিল্পীকে নিয়েই সাহিত্য এগিয়ে চলেছে প্রবাহমান পথে। বহু কবি, ঔপন্যাসিকের লেখনীতে নানা নিম্নবর্গীয় বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের শিল্প উত্তীর্ণ হয়েছে স্বমহিময়। লাল মাটির বাঁকুড়ার জনজীবনের লোকশিল্প সাহিত্যের আঙ্গিনাকে স্পর্শ করেছে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত। বাঁকুড়ার বিভিন্ন লোকায়ত জাতি, এবং তাদের লোকায়ত বৃত্তি, লোকশিল্পীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়ে সংহত এবং জনমনস্ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আর লোকশিল্পীর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ঝরে পড়েছে সাহিত্যিকদের সাহিত্য চেতনায়। তাতে ফুটে উঠেছে লোকশিল্পে প্রান্তিক সমাজবন্ধ মানুষে কর্মমুখর জীবনের প্রতিচ্ছবি। সেখানেই বাঁকুড়ার লোকশিল্পের প্রকৃত

শিল্পীরা অনার্য ও ব্রাত্য-অপাংক্তেয় নিম্নবর্গীয় মানুষ—Prannath Mago তাঁর 'Contemporary Art in India : A perspective' গ্রন্থে বলেছেন—''The tradition on folk art reflects the continuos play of line and colour which in native to the mind of India.''[১] বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করা গেছে বহু জাতির কথা এবং তাদের প্রধান বৃত্তি বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্র করে। সেই সমস্ত শিল্পগুলি নিজ নিজ জাতির পরিচয়কে বহন করে। Encyclopedia Braitannica গ্রন্থে 'Folk Art's অধ্যায়ে লোকশিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> Typically, the people who created the art immediately concerned with producing the necessities of life, as a result, the art is often described as predominantly functional of utilitarian, in spite of the fact that there are important categories that are definitely not utilitarian, such as the widespread miniatures created simply for pleasure. Most commonly used were the natural substances that came readily to hand.[২]

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন লোকশিল্পগুলি উল্লেখ করা হল—

লোকশিল্প	স্থান
ডোকরা শিল্প	বিকনা
মৃৎ শিল্প	পাঁচমুড়া, সোনামুখী, মুরলু ও ইন্দপুর
শঙ্খ শিল্প	হাটগ্রাম, বিষ্ণুপুর
রেশম, তসর, লণ্ঠন	বিষ্ণুপুর
কাঁশা শিল্প	কেঞ্জাকুড়া
শলা শিল্প	বিষ্ণুপুর, সোনামুখী
গালা, লাভা, তসর শিল্প	সোনামুখী
বাঁশ শিল্প	জয়পুর, পাত্রসায়ের, কেঞ্জাকুড়া
কাঠ শিল্প	জগদল্লা, রামপুর, বনকাঠি, ইন্দাস
কোদাল শিল্প	কুলবণী, মগরাগ্রাম

ডোকরা শিল্প : আদিম কাল থেকেই ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় গড়ে উঠেছে। দেশ বা জাতির কৌলিন্য আভিজাত্যের শিল্প এটি। বাঁকুড়া জেলায় বিকনা, লক্ষীসাগর, লাদনা, শরবেড়িয়া, ছাতনা এলাকায় ডোকরা শিল্পের নাম সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে বিকনার ডোকরা শিল্প গর্ব সরুপ। ডোকরা শিল্পের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় এই শিল্পকলার উৎপত্তি আজ থেকে প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগে। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো শহরে ডোকরা শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। সেখান থেকে পাওয়া বিখ্যাত নর্তকী মূর্তি সেটি নাকি ডোকরাতে তৈরি। 'ডোকরা' শব্দটি এসেছে ডোকরার ডামার উপজাতি থেকে। যারা বিভিন্ন রকম হাতের কাজ করত। পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা শিল্পের নাম শুনলেই মনে পড়ে বাঁকুড়া জেলার কথা। ডোকরা শিল্পের জন্য বিকনা গ্রামটিক অনেকের কাছে ডোকরা গ্রাম নামে পরিচিত। রাজ্য সরকার ডোকরা শিল্পীদের জন্য স্থায়ী বসতি এবং সমবায় তৈরি করে দিয়েছে। ডোকরা শিল্পের মধ্যে বহু কিছু শিল্পকর্ম লক্ষ করা যায়—

● **গয়না রুপে :** খাড়ু, হাঁসুলি, নুপুর, আংটি, নাচের ঘুঙুর, বিভিন্ন গলার হার, গলার হারের লকেট, চুরি, বালা, মাথার ক্লিপ, কানের দুল, বিভিন্ন ঘন্টা প্রভৃতি।

● **গৃহস্থালির জিনিসপত্র :** শস্য মাপার পাই, কনা, ছটাক, ফুলের সাজি, রেকাবি, সিঁদুর কৌটো, ফুলদানি, গয়নার বাক্স, প্রদীপ প্রভৃতি।

● **জীবজন্তুর মূর্তি :** বিভিন্ন রকমের ঘোড়া, সিংহ, হাতি, পক্ষীরাজ, পেঁচা, ময়ূর, পায়রা, কচ্ছপ, গরু, সাপ, বানর, নানা রকমের মাছ প্রভৃতি।

● **দেব-দেবীর মূর্তি :** লক্ষী,লক্ষ্মীর সাজ, বাগদেবী সরস্বতী, ভগবতী, কার্তিক, গণেশ, দুর্গা, কৃষ্ণ, রাধাগোবিন্দ, গৌর হরি, নটরাজ, সুদর্শন প্রকৃতি।

● **মহাপুরুষ :** শ্রী রামকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি।

● **যানবাহন :** গরুর গাড়ি, পালতোলা নৌকা, টানা রিক্সা, ঠেলা গাড়ি প্রভৃতি।

উক্ত শিল্পকর্মগুলি ছাড়াও আধুনিক যুগের মানুষের রুচি ও পছন্দের মানকে গুরুত্ব দিয়ে বহু নিত্যনতুন ডোকরা সামগ্রী শিল্পিরা করে থাকেন, মোমের পলপে ব্রোঞ্জ, পিতল, ও তামা গলিয়ে বিভিন্ন ছাঁচের দ্বারা। কর্মকারা বিশেষত এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কমল কুমার মজুমদার তার 'বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থে ডোকরা শিল্প সৃষ্টি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> আগুন যখন গনগনে, পিতল গোলে ক্ষীর, এরা নুনের ছিটে দেয়, সোহাগা দেয়, তারপর সেই মাটি বন্ধ পিতলের ছাঁচটি আগুনে ধরে মোমটি গলিয়ে নালি দিয়ে বার করে নেয়। মোম বার হয়ে গেলে দুই পায়ে চেপে ধরে পিতল ঢালে। মূর্তিগুলো নরুন দিয়ে জট মারে, চিকন করে।[৩]

কাঁশা জাতীয় শিল্প কাঁসারীরা তৈরি করেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের কাব্যে কাঁসারী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তাঁরা শাল পেতেছে কাঁসার বাটি, ঘটি তৈরি করার জন্য—

কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি-খুরি গড়ে থাল
বাটী ঘটী বট-লই শিপ।[৪]

● **মৃৎশিল্প :** লাল কাঁকরে মাটির জেলা বাঁকুড়া জেলা। বহু শিল্পের উদ্ভাব এই জেলায়। তার মধ্যেই অন্যতম মৃৎশিল্প। মাটিকে কেন্দ্র করে যে শিল্পকলা গঠিত হয় তাকেই মৃৎশিল্প বলা হয়। ইংরেজিতে মৃৎশিল্প সাধারণত 'পাটারি' বা 'সিরামিক' আট নামে অভিহিত করা হয়। সিরামিক কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'কেরামিকোস' থেকে এই 'কেরামিকোস' শব্দটি আবার গ্রিক শব্দ 'কেরামোস' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ 'কুমোরের মাটি'। মাটি হল মৃৎশিল্পের প্রধান ও অপরিহার্য্য উপাদান। কুমোরেরা চাকা ঘুরিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করেন। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া মৃৎশিল্পে প্রসিদ্ধ স্থান। মাটির হাতি, ঘোড়া, হাঁড়ি, কলসি, ঘরবাড়ি, প্রদীপ, খাবরি, চায়ের কাপ, খেলার পুতুল, প্রতিমা সবই মৃৎশিল্প রূপে প্রচলিত। সভ্যতার আদি যুগ থেকে একের পর এক বিবর্তনে মৃৎশিল্পীর শৈল্পিক কারুকার্য ফুটে উঠেছে সাহিত্যের পাতাতে। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মাটির ঘড়বারির উল্লেখ আছে। সওদাগর ধনপতি দত্ত চণ্ডীর পূজার ঘটকে অবহেলা করে বলেছেন—

কেমন দেবতা বল পূজিস ঘট বারি
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।[৫]

গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় যেমন মাটির প্রদীপ জ্বলে। ঠিক তেমনি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর স্বপ্নের গুজরাট নগরে প্রতি ঘরে জ্বলেছে প্রদীপ—

প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে মনিময়দীপ জ্বলে
শঙ্খ ঘন্টা বাজে বীনা বেনি।[৬]

● **শঙ্খশিল্প :** বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন কুটীরশিল্পগুলির মধ্যে শঙ্খ অন্যতম। এই জেলার বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম শঙ্খ কাজের দুটি বিশেষ কেন্দ্র। শঙ্খ লোকবাদ্য এবং শাঁখা অলংকার রূপে জনসমাজে প্রচলিত। হিন্দু ধর্মে পূজা পার্বণে জলশঙ্খে প্রবৃত্ত গঙ্গাজল দেওয়া হয়। আবার শঙ্খে ফু দিয়ে সেই ধ্বনিতে পূজা সম্পন্ন করা হয়। হিন্দু বিবাহে শঙ্খ ধ্বনি মাঙ্গালিক রীতি। শঙ্খ অলংকার রূপে হাতের শাঁখা প্রধান হলে, কানের টপ, খোপার কাটা, চুলের ক্লিপ, গলার মালা, আংটি প্রভৃতি অলংকার রূপে পরিগণিত। আবার শঙ্খ দ্বারা নৃত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন ফুলদানি, আয়নার ফ্রেম ইত্যাদি তৈরি করা হয়। হিন্দু বাঙালি ঘরের সদবা নারীর সৌভাগ্য সূচক অন্যতম ভূষণ হল শাঁখার বালা। শাঁখার উৎপত্তি সম্পর্কে কথিত আছে মা দুর্গার সর্বপ্রথম শাঁখা পরিধান করেন। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে যে লোকদেবী 'বাসলী' আছেন তিনিও শাঁখারিদের হাত থেকে শাঁখা পরেছেন। বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যে সুন্দরী খুলনা ব্রত পালন করেছেন এবং শাখা পরেছেন—

গলে সাতেশ্বরি হার শবে নানা অলংকার
করে শঙ্খ শভে তাড়বালা।[৭]

● **বয়নশিল্প :** বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী বয়নশিল্পে বেশ উন্নত। বয়ন বলতে তাঁত, সিল্ক, বালুচুরী, রেশম প্রভৃতি বস্ত্রকে বুঝায়। তন্তুবায় বা তাঁতি চরকায় সুতো কেটে ধুতি, গামছা, শাড়ি, ব্লাউজ প্রভৃতি বস্ত্র বানায়। তাদের জীবন জীবিকার রক্ষার্থে এটি প্রধান শিল্প। বিষ্ণুপুরের বালুচুরি শাড়ি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে খ্যাতি অর্জন করেছে। এছাড়া বিষ্ণুপুর সিল্ক, খাদি প্রভৃতি বস্ত্র উৎপাদনে ও বিকাশে বহুকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিষ্ণুপুরে তিনটি সুতোর উৎপাদন কেন্দ্র আছে—রেশম ও তসর সূতা, খদ্দর সূতা, মসলিন সূতা। এছাড়াও বাঁকুড়া সদর, সোনামুখী, পাঁচমুড়াতে বয়ন শিল্পের কাজ হয়। কবিকঙ্কণ 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যের বণিক খণ্ডে লহনার তসরের শাড়ি পরা প্রসঙ্গে বলেছেন—

কপালের চন্দন চুয়া হাথে পান মুখে গুয়া
পরিধান তসরের শাড়ি।[৮]

● **বাঁশশিল্প :** বাঁকুড়ার লোকসমাজে লোকশিল্পীর একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে বাঁশশিল্প। একসময় বাঙালির ঘর ছিল বাঁশের, বেড়া ছিল বাঁশের, দরজা ছিল বাঁশের। তাই বাঙালির ঘরের শিল্প যে বাঁশ তা বললে ভুল হবে না। বাঁকুড়ার বাঁশ শিল্পের কারুকার্য ফুটে উঠেছে বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ গ্রন্থে—"বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরের গ্রামে দেবেন্দ্র হাজরার ঘরে বেতের বাঁধনে ও কাঠের মানুষ্য, পশুপাখির মুখ উৎকৃষ্ট। বর্ণ বৈচিত্রে, সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্পদেরও অভ্র খচিত মনোহর চারুকলায় ঘরখানি দর্শনীয়।"[৯] ছান্দর গ্রামে বাঁশের নানা ধরনের পুতুল শিল্প বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে বিশেষ স্থান পায়। কেঞ্জাকুড়া, জয়পুর, রাইপুর, ঝিলিমিলি প্রভৃতি স্থানে কুলা, ঝুড়ি, চালনী, চুলুনি, বাঁশি, লাঠি, ফুলদানি, তাঁতের সরঞ্জাম, খেলনা, মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রত্যহিক জীবনের নানা চাহিদা পূরণ করেছে। এই বাঁশ শিল্পকে কেন্দ্র করে—"অভিব্যক্তির শিল্পদের একজন স্বগ্রাম কেঞ্জাকুড়াতে নির্মাণ করেন ত্রিনেত্রী নামে সংস্থা।"[১০] বাংলা সাহিত্যে বাঁশের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। বাঁশের বাঁশি প্রসঙ্গে জসীমউদ্দীন "নকশী কাঁথার মাঠ" কাব্যের 'সুখের বাসর' কবিতায় বলেছেন—

বাঁশের বাঁশিতে ঘুন ধরেছিল, এতদিন পরে আজ,/তেলে জলে আর আদরে তাহার হইল নতুন সাজ।/সন্ধার পরে দাবায় বসিয়া রুপাই বাজায় বাঁশি/মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুররাশি।[১১]

আবার অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বাঁশের বেড়ার প্রসঙ্গ পাই এভাবে—"কালোবরণের বাড়িকে বড়বাড়ি বলে। তার বাড়ি আর এ-বাড়ির মাঝখানে একটা বাঁশের বেড়া। সেই বেড়াতে কাপড় শুখাইতে দিয়াছিল। সেখানা আনিয়া বিছাইয়া দিবে কিনা ভাবিতেছি। তারা ভাবিবার অবসর না দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।"[১২]

● **শোলাশিল্প :** শোলার কাজ সাধারণত মালাকার সম্প্রদায় করে থাকেন এই কুটির শিল্পটি বহু অসুবিধার মধ্যে আজও অভূতভাবে বেঁচে আছে। শোলার ব্যবহার অবশ্য অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। বাঁকুড়ার বেশকিছু জায়গায় যেমন বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, জয়রামবাটী, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ভরা-ধরমপুর, অম্বিকানগর প্রভৃতি এলাকায় প্রায় শতাধিক পরিবারের জীবিকা অর্জনের প্রধান শিল্প শোলা। বিয়ের মকূট, প্রতিমার ডাক সাজ, চাঁদমালা, দেবদেবীর মূর্তি, নানারকম পশুপাখি, খেলনা প্রভৃতি বর্ণময় শিল্পের সন্ধান মেলে শোলার কাজের মধ্য দিয়ে। বাঙালির বিবাহ অনুষ্ঠানের বর সাজের প্রধান উপকরণ শোলার মুকূট। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বিবাহ প্রসঙ্গে বনমালী ও উদয়তারার কথোপকথনে উঠে এসেছে শোলার মকূটে কথা—'উদয়তারা ফেঁ পাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "দাদা, তোমার মাথায় বুঝি আর শোলার মটুক উঠলো না।" 'শোলার মটুক উঠব, মড়াপোড়ার টেকে গিয়া উঠব। তুই কান্দিস না।" বনমালীর সঙ্গে উদয়তারার এই শেষ দেখা।'[১৩]

এভাবেই বারবার সাহিত্যের মধ্যে লোকায়ত শিল্পের প্রসঙ্গ ফুটে উঠেছে। কালের গতিতে বহু বিষয় সাহিত্যের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। সমাজের জীবনযাত্রায় বহু ছোটো বড়ো শিল্প প্রতিনিয়ত নিত্য সঙ্গী হয়ে মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে। বর্ণিত শিল্পগুলি ছাড়াও কদালশিল্প, কাঠশিল্প, পাথরশিল্প, লণ্ঠনশিল্প, পাটশিল্প, ইটশিল্প প্রভৃতি বাঁকুড়ার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। সরলতা, প্রথাগত ফর্ম বা সৃষ্টির শৈলীতে রক্ষণশীলতা যা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত এই শিল্পগুলি। মানব ঐতিহ্যের পটভূমিতে শিল্পীর শিল্পসত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

এই জেলায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকটি শিল্পী ও তাদের শিল্পের নাম উল্লেখ করা হল—

শিল্পী	শিল্প	রাষ্ট্রপতি
রাসবিহারী কুম্ভকার (পাঁচমুড়া)	মৃৎশিল্প	জাকির হোসেন
যুদ্ধ কর্মকার (বিকনা)	ডোকরা শিল্প	আর ভিঙ্কট রমন
অশ্বিনী নন্দী (কাদকুলি)	শঙ্খ শিল্প	,,
জয় গোপাল নন্দী (শাখারি বাজার)	নারকেল শিল্প	,,
কালীপদ কুম্ভকার (বাঁকি সেন্দরা)	পোড়ামাটির শিল্প	,,
নয়ন দত্ত (শুশুনিয়া)	পাথর শিল	,,
হীরালাল কর্মকার ও মানিক কর্মকার (সিমুল বেড়িয়া)	পাথরের কারুকার্যের জন্য	শঙ্করদয়াল শর্মা

● **রাষ্ট্রপতি মেডেল প্রাপক**

বংশীধর মন্ডল (হাটগ্রাম)—শঙ্খ শিল্প
রঞ্জিত কর্মকার (গোপীনাথপুর)—শোলার শিল্প
সুবোধ দত্ত (হাটগ্রাম)—শঙ্খ শিল্প
আস্তিক সিংহ বাবু (শুশুনিয়া)—পাথর শিল্প
ধ্রুব নন্দী (বিষ্ণুপুর)—শঙ্খ শিল্প
সহদেব কর্মকার (শুশুনিয়া)—পাথর শিল্প
গীতা কর্মকার (বিকনা)—ডোকরা শিল্প

উৎসের সন্ধানে

১. Prananath Mago : 'Contemporary Art in India : A perspectiv', National Book Trust : New Delhi, India, 2001, P. 97
২. Encyclopedia, Britannica, Folk Arts, P. 325
৩. কমল কুমার মজুমদার : 'বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', দীপায়ন, কলকাতা, পৃ. ৫৪
৪. সুকুমার সেন সম্পাদিত : মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গাল', সাহিত্য একাডেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৮৬
৫. তাদেব : পৃ. ১৯০
৬. তাদেব : পৃ. ৪৩
৭. তাদেব : পৃ. ১১২
৮. তাদেব : পৃ. ১৫৮
৯. দুলাল চৌধুরী : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', একাডেমি অফ ফোকলোর কলকাতা, পৃ. ৩৮২
১০. 'জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ বাঁকুড়া', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গা সরকার, পৃ. ৫৩
১১. জসীমউদ্দীন : 'জসীমউদ্দীন রচনা সমগ্র', কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৩
১২. অদ্বৈত মল্লবর্মণ : 'তিতাস একটি নদীর নাম, এস.বি.এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৬৮
১৩. তাদেব : পৃ. ২৩৩

বঙ্গে গাজন উৎসব

স্বপন হাজরা

নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজের উদ্ভব হওয়ার পর, মূলত কৃষিকাজের উপর নির্ভর করেই মানুষ সভ্যতার এক এক ধাপ অতিক্রম করেছে। বর্তমানে চাষের উন্নতির জন্য নানান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন হলেও, আদিমকালে তা সম্ভব ছিল না, তাদের কাছে ছিল বিশ্বাস আর সেই বিশ্বাস এর জন্যই তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল কে বাঁচানোর জন্য, ভালো ফলনের আশায়, বৃষ্টির কামনায় নানান দেবদেবী, ব্রত—অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেও অতীতের সেই বিশ্বাস কাল পরম্পরায় চলে আসছে। বহু শতাব্দী ধরে চলা বাংলার গাজন উৎসব অতীতের সেই কৃষিনির্ভর সমাজেরই সংস্কারজাত।

বাংলায় মূলত দুই ধরনের কৃষিভিত্তিক উৎসব হয়—১. কৃষি পূর্ববর্তী উৎসব, ২. কৃষি পরবর্তী উৎসব। গাজন হল প্রথম ধরনের। চৈত্রের সময় থেকে শুরু করে বর্ষার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত সূর্য যখন রুদ্রময় মূর্তি ধারণ করে, তখন সূর্যকে তুষ্ট করার জন্য ও উপযুক্ত বৃষ্টির আশায় কৃষকেরা গাজন উৎসবের প্রচলন করে। ব্রজমিত্র বলেছেন—"বাংলাদেশে দারুণ গ্রীষ্মের দহনে জল যখন শুকিয়ে, তৃণহীন দক্ষ প্রান্তর ধু ধু করে, তখনই হয় বাংলার গ্রামে গ্রামে গাজন।"[১] অর্থাৎ তপ্ত পৃথিবীকে সবুজে ভরিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই চৈত্র শেষে বাঙালিরা গাজনে মেতে ওঠে।

গাজন হল শিব, ধর্মঠাকুর, মনসার পূজাকেন্দ্রিক উৎসব। শিব গাজন সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তিতে হয়। আর ধর্মের গাজন পালিত হয় বৈশাখ পূর্ণিমাতে, তবে স্থান বিশেষে কোথাও কোথাও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। আবার কোথাও কোথাও বছরের যে কোনো সময়েই গাজন উৎসব পালন করা হয়, যাকে হুজুগে গাজন বলা হয়।

প্রাক আর্যযুগের সভ্যতা হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ধ্যানমগ্ন, চক্ষু মুদ্রিত, তিনটি মাথা, তিনটি শিং এবং জীবজন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত এক দেবতার মূর্তি দেখা যায়, যাকে শিবের পূর্ব সংস্করণ বলে অনুমান করা হয়। আবার একটি

সিলমোহরে শিবের বাহন বৃষ এর মূর্তি খোদিত আছে। গবেষকেরা মনে করেন, শিব পূজার উৎপত্তি এখান থেকেই, সময়ের সাথে সাথে তা বিবর্তিত হয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে এ দেশে আর্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আর্যরা বহু অনার্য দেবতাদের ধীরে ধীরে আর্য দেবতায় পরিণত করেন। সেই আর্যীকরণের ফলে শিব পৌরাণিক দেবতা রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যের ওপর আলোকপাত করব, তিনি বলেছেন—"He is the God of the nomad flock-keeper and therefore, rides on the bull. He is a nomad of nomads the spirit of the nomadic horde."[২] বিভিন্ন পুরাণ, শাস্ত্র, ধর্মচর্যায় স্থান লাভ করলেও শিব যে আসলে লৌকিক দেবতা তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তথ্যমূলক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর সমগ্র অনুচ্চ হিন্দু সমাজও শিব কে নিজেদের দেবতা বলে মনে করে সূর্যের রুদ্রমূর্তি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে মহাদিদেব শিবের স্মরণাপন্ন হয়ে শিবের গাজনে মেতে ওঠে। শিবের আর্যীকরণ ঘটলেও, অন্ত্যজ সম্প্রদায়- ডোম, হাড়ি, বাউরি, কোটালদের পূজিত ধর্ম ঠাকুরের আর্যীকরণ ঘটেনি। বর্তমানে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণেরা ধর্ম ঠাকুরের পূজা করলেও, রাঢ় বঙ্গের বহু জায়গায় ধর্ম ঠাকুর এখনও অন্ত্যজ শ্রেণি কর্তৃক পূজিত হয়। আর এই ধর্ম ঠাকুরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানকে বলা হয় ধর্মের গাজন।

গাজন শব্দের উৎপত্তি নিয়ে প্রধানত দুটি মতামত প্রচলিত রয়েছে। এক মতে, গাজনে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসী বা ভক্তরা একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে গর্জন করে শোভাযাত্রা করে। এই 'গর্জন' শব্দ থেকেই গাজন শব্দের উৎপত্তি। অপর মতে, 'গা' অর্থে গ্রাম এবং 'জন' অর্থে জনগণ অর্থাৎ গাজন হল গ্রামের খেটে খাওয়া জনগণের উৎসব। স্থান বিশেষে গাজন এক এক নামে পরিচিত। যেমন—মালদহের গম্ভীরা উৎসব, জলপাইগুড়িতে গমীরা। গাজন উৎসবের উৎপত্তি নিয়ে কথিত আছে, কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শিবভক্ত বাণ রাজা অমরত্ব লাভের আশায় ভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদি ও কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে শিবের পুজা সম্পন্ন করে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। বাণ রাজার এই ভক্তিকে স্মৃতিতে রেখে শিব বন্দনার উদ্দেশ্যে বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে শিবের গাজন এবং বাণ রাজার কৃচ্ছসাধনকে কেন্দ্র করে শিবের গাজনে বাণফোঁড়ার রেওয়াজ চলে আসছে।

গাজন উৎসবের মূলত তিনটি অংশ—সন্ন্যাস গ্রহণ, নীলব্রত ও চড়ক। ডোম, গোপ, কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় গাজনে মূল সন্ন্যাসীর ভার গ্রহণ করে। চৈত্র সংক্রান্তির দশ দিন পূর্বে তারা ক্ষৌরকর্ম দ্বারা পবিত্র হয়, তাদের ক্ষৌরকর্মের নাম 'দশের কামান'। তবে এখন কেউ কেউ চৈত্র সংক্রান্তির সাত দিন আগে কেউবা তিন দিন আগে ক্ষৌরকর্ম দ্বারা পবিত্র হয়ে সন্ন্যাস নিয়ম পালন করে। এই নিয়ম পালনে তারা শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণের মতো পৈতে গ্রহণ করে। এই সন্ন্যাসীদের বলা হয় ভক্ত্যা। নিজস্ব গোত্র ত্যাগ করে গাজনের কয়েকদিন এরা শিবগোত্র ধারণ করে। প্রতিদলে একজন করে প্রধান ভক্ত্যা থাকে। তার নির্দেশে বাকি ভক্ত্যারা পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে গাজনের কয়েকদিন ব্রহ্মচর্য পালন করে থাকে এবং হর-পার্বতী, নন্দী, ভিঙ্গি সেজে বাণেশ্বর কাঁধে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করে বেড়ায়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন হয় নীলপূজা। সমুদ্র মন্থনের সময় হলাহল বিষ পান করে দেবতাদের অমৃত এর সন্ধান দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে অনুর্বর হয়ে থাকা জমির বিষ খণ্ডন করে নতুন সৃষ্টিকে আগমন জানানোর জন্যই নীলপূজার সূচনা। এই পূজায় মায়েরা সন্তানদের মঙ্গল কামনায় নীলের উপোস করে।

গাজনের শেষ উৎসব হল চড়ক। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন সন্ন্যাসীরা গ্রাম লাগোয়া নদী বা পুকুরের জলে নেমে চড়ক গাছকে তুলে নিয়ে আসে এবং পূজার দিন যথারীতি পূজার্চনা করে।

চড়কের মেলা প্রাঙ্গণে চড়ক গাছকে পুঁতে তার সঙ্গে একটি বাঁশ বেঁধে সেই বাঁশে ভক্ত্যাদের পিঠে লোহার বড়শি বিধিয়ে ঘোরানো হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিডন সাহেব আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করে দিলেও এখনও কোথাও কোথাও এ নিয়ম প্রচলিত আছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে বাণফোঁড়া, জ্বলন্ত কয়লায় হাঁটা প্রভৃতি দুঃসাহসিক পীড়নমূলক ক্রিয়াকলাপ এ উৎসবে ভক্তরা করে থাকে।

প্রায় সমগ্র বাংলায় ছোটো বড়ো গাজন উৎসব পালিত হলেও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু স্থানের পাশাপাশি বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলে এটি মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। উৎসবের মূল কাঠামো সর্বত্র প্রায় একই থাকলেও অঞ্চলভেদে এর কিছু নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। নিম্নে অঞ্চলভেদে সেই বিশেষত্ব গুলি ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা হল—

● **মালদহ :** চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব মালদহে 'গম্ভীরা' নামে পরিচিত। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—"উৎসবটি এখন শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে শৈব ধর্ম প্রসারের পূর্বেও এই উৎসব এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তখন তা সূর্যোৎসব বলে পরিচিত ছিল।"[৩] পূর্বের সেই সূর্যোৎসব বর্তমানে আদ্যের গম্ভীরা বা শিবের গম্ভীরা নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গম্ভীরা শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য[৪] গামার কাঠ দিয়ে তৈরি সূর্য ঠাকুরের মন্দিরের কথা বলেছেন। এই গামার শব্দটি পরবর্তীকালে হিন্দু প্রভাবের ফলে গম্ভীরা নামে খ্যাত হয়।

গম্ভীরা উৎসবের নাচ, গান সবেরই মধ্যে দিয়ে শিবকে আরাধনা করা হয়। মূলত চার দিন ধরে চলে গম্ভীরা উৎসব। প্রথম দিন ঘট ভরা' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূজার সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে এক এক দিন ছোটো তামাসা, বড়ো তামাসা, আহারা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শেষ দিন বিভিন্ন দেবদেবীর ছদ্মবেশে ভক্ত্যারা পাড়ায় পাড়ায় নৃত্য করে বেড়ায় এবং চড়ক পূজার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরা উৎসব শেষ হয়।

গম্ভীরা উৎসবের প্রাণ হল গম্ভীরা গান। শিব-চরিত্রের নানান ঘটনার পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন জীবন সমস্যা, সামাজিক নানান ঘটনা প্রবাহ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, দুর্নীতির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে গম্ভীরার গানে। শিল্পীরা দেবদেবীকে সম্বোধন করে নিজেদের সারা বছরের সুখ-দুঃখের কথা গানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলে যা আদ্যের গম্ভীরা নামে পরিচিত। যেমন— শিবকে সম্বোধন করে তারা নানান দৈনন্দিন সমস্যা তুলে ধরে গায়—

> কি করলি হে দশা দৈন্য/দেশের লোক পায় না অন্ন/হায় কি রে পস্তানার কথা/শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।/তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখি/টাকায় আটমণের ভাত চাপ হে/কুণ্ঠে (কোথায়) গেল সে সুখের দিন/হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিব হে।[৫]

দেবদেবীকে সম্বোধনের পাশাপাশি শিল্পীরা নানা-নাতি সেজে সামাজিক সমস্যা, সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যার কথা তুলে ধরে যা পালা গম্ভীরা নামে পরিচিত। বর্তমানে গম্ভীরার জৌলুস অনেকটাই কমে গেছে, তবুও মালদহের ইংরেজবাজার, ফুলবাড়ি, জোহারিতলা প্রভৃতি স্থানে আজও শিব ভক্তগণ গধীরার কয়েকদিন মহোৎসবে সামিল হয়।

● **বাঁকুড়া :** রাঢ় বঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বরের গাজন বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মেলা। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত এক্তেশ্বরের শিব মন্দিরটি প্রায় হাজার বছরের পুরোনো। মাকড়া পাথরের তৈরী প্রায় পয়তাল্লিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরে ল্যাটেরাইট পাথরের তৈরী শিবের পদমূর্তি পূজিত হয়, যা বাংলার স্থাপত্যের এক অন্যতম নির্দশন। জনশ্রুত অনুসারে,

একসময় বিষ্ণুপুর ও সামন্তভূম রাজ্যের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিবাদ তৈরী হয়। তা নিস্পত্তি করার জন্য স্বয়ং শিব তখন ধ্যানে বসেছিলেন। তিনি তখন এক্তেশ্বরের মূর্তিতে দুই রাজ্যের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দন্ডায়মান হন।[৬] এই লোককথা অনুসারে বহুবছর ধরে এক্তেশ্বর শিব মন্দিরে ধূমধাম করে শিবের গাজন পালন করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের রাত থেকে সংক্রান্তির সকাল পর্যন্ত এখানে গাজন উৎসব চলে। ঐতিহ্যবাহী মন্দির হওয়ার কারনে এখানে এই সময় প্রচুর পূর্ন্যার্থীর ভিড় জমে। একসময় এখানে গাজনের দিন রাত্রে জ্বলন্ত চিতার মতো আগুন জ্বালিয়ে ভক্তারা 'সতীদাহ উৎসব' পালন করত। বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। মনস্কামনা পূরণের জন্য বহু পুণ্যার্থী আগেকার মত আজও মন্দির চত্বরে দন্ডি কাটে।

এক্তেশ্বরের পাশাপাশি বাঁকুড়ার বাহুলাডার সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিরে চৈত্র সংক্রান্তিতে ধূমধাম করে শিবের গাজন পালন করা হয়। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে সুউচ্চ সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গের পাশাপাশি গনেশ, জৈন পার্শনাথ ও মহিষমর্দিনীরও মূর্তি রয়েছে। কয়েকশত বছরের পুরোনো এখানকার গাজন মেলায় পূর্বে পিঠে বাণফোঁড়া হতো, যদিও অনেকদিন ধরে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বর্তমানে পিঠে বাণফোঁড়া না হলেও জ্বলন্ত অঙ্গারে হাঁটা কিংবা শরীরের অন্যান্য জায়গায় বাণফোঁড়া সেই পূর্বের মতোই হয়।

বাঁকুড়ার পাঁচালের গাজন বিখ্যাত হয়ে আছে ভক্ত্যাদের বাণফোঁড়া অনুষ্ঠানের জন্য, খয়রা, নায়েক, বাউরি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষ পাঁচালের গাজনে অংশগ্রহন করে। সারাবছর বাহ্মণ এখানে শিবের পূজা করলেও গাজনের দিন নিম্নবর্ণের ভক্ত্যারা পূজা করে থাকে। নিজের শরীরে দৈহিক পীড়নের দ্বারা তারা শিবের বন্দনা করে। বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে এখানকার বাণফোঁড়া অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত 'চৌরঙ্গিবাণ' ও নলিবাণ এর কথা বলেছেন।[৭]

বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়া ধর্ম রাজের গাজন উৎসব বিখ্যাত। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ডোম, বাউরি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকেরা এখানে ধর্মরাজের গাজন উৎসব পালন করে। গাজনের সময় তারা ধর্মঠাকুর, স্বরূপ নারায়ণ ও মাদান দেবতাকে বড়ো বড়ো তিনটি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে শোভাযাত্রায় বের হয়। যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এখানে ধর্মঠাকুর অনুচ্চদের হাতে পূজিত হলেও বর্তমানে ব্রাহ্মণরাই পূজা করে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার গাঁড়রা, খামারবেড়, মশিয়ারা গ্রামের শিবের গাজন, মেট্যালী গ্রামের বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত ধর্মরাজের গাজন বিখ্যাত।

● **বর্ধমান :** বর্ধমানের কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বর শিবের বিখ্যাত শিবের গাজন উৎসব প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন। কিংবদন্তী হল, 'মন্ডল' উপাধিকারী উগ্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ সন্তোষ মন্ডল স্বপ্নাদেশে খড়িনদীর কলমিসায়রের দহ থেকে ঈশানেশ্বর শিবকে নিয়ে এসে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন।[৮] সেই থেকে সন্তোষ মন্ডলের বংশধররাই বংশপরম্পরায় ঈশানেশ্বরের গাজন উৎসব পরিচালনা করেন। কুড়মুনে 'কালাচাঁদ' নামক ধর্মঠাকুর থাকলেও ঈশান্বেশ্বর শিবের প্রভাবে কালাচাঁদ ধর্মঠাকুরের উৎসব এর জৌলুস বর্তমানে অনেকটাই কমে গেছে। একসময় 'মন্ডল' উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয়রা পূজা চালনা করলেও বর্তমানে ব্রাহ্মণরা পূজার কর্তৃত্ব অনেকটাই গ্রহন করে নিয়েছে, এই গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে 'খেস্যা' গান এর লড়াই হয়। যদিও পূর্বের মতো সেইরকম জৌলুস আর নেই এই গানের। কুড়মুন গ্রামের গাজনে নরমুন্ড নিয়ে নৃত্য করে থাকে শ্মশান সন্ন্যাসীরা। এছাড়া এখানে গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে বসা মেলায় পৌরাণিক দেবদেবীদের নিয়ে তৈরি মাটির মূর্তি প্রদর্শিত হয়, যাতে রয়েছে এখানকার লোকশিল্পের ছোঁয়া। শুধুমাত্র শিব নয়, কুড়মুন গ্রামে অতি প্রাচীন কাল থেকে ধর্মঠাকুরেরও উপাসনা করা হয়। গ্রামের মাঝামাঝি একটি

বট গাছের তলায় মাটির মরে কালাচাঁদ নামক এক ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত রয়েছেন। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় চার-পাঁচদিন ধরে এই কালাচাঁদ ধর্মঠাকুরের গাজন কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন হয়ে থাকে। তবে ঈশানেশ্বর শিবের গাজনের ফলে বর্তমানে কালাচাঁদের গাজন অনেকটাই জৌলুসহীন হয়ে গেছে। কালাচাঁদের পাশাপাশি এই গ্রামের সুফল দুলের বাড়িতে আরও একটি ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা বা আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এই ধর্মরাজের পূজা করা হয়। বংশ পরম্পরায় দুলেরাই এই পূজা করে এসেছে। চার-পাঁচদিন ধরে চলা এই গাজন উৎসবে পাঁঠাবলি হয়। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমায় বর্ধমানের জামালপুরে বুড়োরাজার গাজন উপলক্ষ্যে এক বিরাট মেলা বসে, যা বর্ধমানের অন্যতম মেলা হিসেবে স্বীকৃত। অনুষদের ধর্মরাজা ও ব্রাহ্মণদের শিবের সংমিশ্রনে এই উৎসব পালিত হয়। 'বুড়োশিব' এর বুড়ো এবং 'ধর্মরাজ' এর রাজ এই দুয়ে মিলে দেবতার নাম হয়েছে বুড়োরাজা। বুদ্ধ পূর্ণিমার সাতদিন আগে থেকে এখানে নানা অঞ্চলের লোক এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। মনস্কামনা পূরণের জন্য এই সময় গ্রামারের বহু মানুষ এসে বুড়োরাজার চরণে ধরা দেয়। শিব ও ধর্মরাজের একসঙ্গে আরাধনা হলেও নৈবেদ্যের সময় খানায় কাটি দিয়ে দাগ টেনে শিব ও ধর্মরাজের সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝানো হয়।

পূর্ব বর্ধমানের গঙ্গাটিকুরি গ্রামটি গাজনের 'জল সন্ন্যাস' এই বিশেষ দিনের জন্যই বিখ্যাত। চৈত্র মাসের শেষ চারদিন এখানে শিব গাজনকে কেন্দ্র করে ফুল ভাঙা, জল সন্ন্যাস, নীলব্রত চড়ক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রথম দিন সন্ন্যাসীরা গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের ডাল ভেঙ্গে শিবের কাছে উৎসর্গ করে। পরেরদিন শিবকে দোলায় নিয়ে যায়। স্নান সেরে করে সন্ন্যসীরা উপোস ভাসে। এই জল সন্ন্যাস দিনে হাজার হাজার মানুষ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে স্নান যাত্রা করে। কেবল আশেপাশের অঞ্চলের মানুষই নয়, দূর-দূরান্ত থেকে অনেক সাধারণ মানুষও এই সময় এখানে ভিড় করে যা এখানকার গাজনের এক অন্যতম বিশেষজ্ঞ। চড়কের দিনেও এখানে শিবকে দোলায় করে গ্রামে গ্রামে শোভাযাত্রা করা হয়। এছাড়া ভাতার থানার অন্তর্গত রায়রামচন্দ্রপুরে "পোড়া রায় ও ময়না রায়" নামক ধর্মরাজের গাজন, মানকর গ্রামের ধর্মরাজের গাজন কাঠোয়ার সিঙ্গি গ্রামের শিবের গাজন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রতিবছর বহু মানুষের ভিড় জমে।

● **বীরভূম :** বীরভূমের বল্লভপুর ডাঙার গ্রামীণ শিবের গাজন খুব প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী না হলেও আশেপাশের গ্রামের উৎসাহী জনতার ভিড় টারে সক্ষম। এখানকার গাজনের বিশেষত্ব হল চড়ক। শিবসংক্রান্তির রাত থেকে এখানে চড়ক মেলা বসে। পয়লা বৈশাখ চড়ক পূজা হয়। চড়ক গাছের কাছে দুটি ঘর তৈরি করা হয়, যার বারান্দার দুজন মহিলা মাথায় মঙ্গাল ঘট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাঢ় বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও অনুচরা সন্ন্যাস গ্রহন করে। চড়কের দিন এখানে মানত করা পাঁঠা বলি হয় এবং যদি হওয়া পাঁঠার মাথা শিবকে উৎসর্গ করা হয়।

শিব গাজনের তুলনায় বীরভূমে ধর্মঠাকুরের গাজন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ডোম, বাউরি এরাই এই পূজার সন্নাসীর ভার গ্রহন করে, এদেরকে এখানে বলা হয় 'দেয়াসী'। সন্ন্যাসীরা ধর্মঠাকুরকে নিয়ে সংযাত্রায় বের হয়, এই সময় তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বীরভূম জেলার বিশেষত্ব 'বোলান গান' গেয়ে থাকে। নানান পৌরাণিক ঘটনার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাও ফুটে ওঠে সেই গানে—

> ঊর্ধমুখে গাভীগণে, ভাই, হাম্বা হাম্বা ববে।/অজ্ঞানে দাঁড়ায়ে ডাকে কোথায় প্রাণ কেশবে।।/তাদের চক্ষে ধারা বয় রে।/এ দুঃখ কি প্রাণে সয় রে।।[৯]

বীরভূমের মেটেলা গ্রামে বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

শতাব্দী প্রাচীন এই গাজনকে ঘিরে বহু মানুষের আগমন ঘটে, যারা ধর্মঠাকুরকে নিয়ে বের হওয়া শোভাযাত্রায় ও অংশগ্রহণ করে। চড়ক মেলায় অনুষ্ঠিত হওয়া বাণফোঁড়া এখানকার গাজনের এক অন্যতম আকর্ষণ। বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' এর আজ অনেক পার্বণই অবক্ষয়ের পথে। গতিশীল শহুরে সংস্কৃতি দ্বারা গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করার মধ্য দিয়ে সেই অবক্ষয়ের সূচনা। এক সময় সূর্য বন্দনাকে কেন্দ্র করে যে গাজন উৎসব শুরু হয়েছিল, সেখানে সামাজিক কৌলিন্যকে ভেঙে বহু মানুষ একত্রিত হতো তা আজ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেছে। বর্ষের শেষ প্রহরে সূর্যের তপ্ত মূর্তিকে শান্ত করার জন্য সূর্য বন্দনা অপেক্ষা ঠান্ডা ঘরে থাকতেই নাগরিক ভোগবাদী জীবন বেশি সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গ্রামীন সংস্কৃতির পূর্বের সেই সারল্য, উদারতা কোথাও না কোথাও নাগরিক সাচ্ছন্দ্যের কবলে এসে পড়েছে। ফলে বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা নানান গ্রামীন ঐতিহ্য কোথাও পরিবর্তিত হয়েছে, কোথাও বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। এই অবক্ষয়ের যুগে বাংলার গাজন উৎসব তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেও পূর্বের জৌলুস হারিয়েছে। গাজনে অনুষ্ঠিত হওয়া নানা অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের উপর যেমন প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ পড়েছে তেমনি অঞ্চলভেদে গাজনে ব্যবহৃত খেস্যা গান, বোলান গান প্রভৃতি লোকসংগীত শিক্ষিত মানুষজনের কাছে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। তবে বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিকতা গাজন উৎসবকে যতই গ্রাস করুক না কেন, গ্রাম-বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণিরা আজও নাগরিক ভোগবিলাসের ফাঁদে পা না বাড়িয়ে গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে অনাবিল আনন্দের সঙ্গে গাজন উৎসবে মেতে ওঠে।

উৎসের সন্ধানে

১. হীরেন্দ্রনাথ মিত্র (বজ্রমিত্র) : 'বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈত্র ১৪১৫, পৃ. ১০
২. Haraprasad Shastri : Lokoyata &Vratya, Haraprasad Gavesona Kendra, Naihati 1982, P. 58
৩. মাযহারুল ইসলাম তরু সম্পাদিত : 'গম্ভীরা কত প্রাচীন' (ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য), হাজার বছরের গম্ভীরা, প্রতিভাস, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ.১৫৮)
৪. তদেব, পৃ. ১৫-১৬
৫. মাযহারুল ইসলাম তরু সম্পাদিত : 'হাজার বছরের গম্ভীরা', প্রদ্যোত ঘোষ লিখিত ''গম্ভীরা গান'', প্রতিভাস, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৪৩
৬. বিনয় ঘোষ : 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬, পৃ. ৩৬৭
৭. তদেব, পৃ. ৪০০-৪০১
৮. তদেব, পৃ. ২৩২
৯. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, কালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪, পৃ. ৪৯৪

তথ্যের সন্ধানে

১. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা লোক-সাহিত্য', কালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪
২. দুলাল চৌধুরী : 'বাংলার লোকউৎসব', পুস্তক বিপণি, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬
৩. বিনয় ঘোষ : 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬
৪. মাযহারুল ইসলাম তরু সম্পাদিত : 'হাজার বছরের গম্ভীরা', প্রতিভাস, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮
৫. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় মেলায় মেলায়', সুর্দশন প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১৪

ব্রতকথা ও পাঁচালি : বাংলার সম্পদ

সুস্মিতা সাহা

কবি কৃত্তিবাস বিদগ্ধ পণ্ডিত, অনুবাদ করেছেন জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ, সহজ সরল বাংলা ভাষায়। কাব্যের নাম দিয়েছেন 'শ্রীরাম পাঁচালি'। শুধুমাত্র পড়ার জন্য নয়—এটি গেয় কাব্য অর্থাৎ যে কাব্য গান গেয়ে সকলের মনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর কাব্যের প্রথমেই পাই—

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।

এই হল পাঁচালির মাহাত্ম্য। এক মুখের থেকে কথা বা ছড়া বা গান ছড়িয়ে পড়ে দশ মুখে—এই পদ্ধতির উপর ভর করেই গড়ে উঠেছে অধিকাংশ লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত। মধ্যযুগের কাব্য থেকেই তার সূচনা বলা যেতে পারে। গ্রাম বাংলায় তো বটেই—শিষ্ট সমাজেও পাঁচালি অথবা পালাগান যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে।

আমার ছোটবেলা কেটেছে যেখানে, সেখানে মনসার 'রয়ানি' হতো পাঁচালির সুরে। তারপর ধুমধাম করে মনসাপুজো। তুর্কি আক্রমণের প্রেক্ষাপটে অনার্য দেবদেবীদের প্রাধান্য দিতে সৃষ্টি হল—মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম দেবতার পুজো বা ব্রত প্রচারের কাহিনি। মুষ্টিমেয় কিছু পণ্ডিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষজন ছাড়া বাকি প্রজাদের মধ্যে ক'জন বা অক্ষর চিনতে পারে তাদের জন্যই গ্রাম থেকে পালাগানের আসর বসতো, এইসব গানের সঙ্গে জুড়ে আছে একটি করে গল্প-ব্রতকথামূলক গল্প। আর তার সঙ্গে সুর করে দুলে দুলে পাঁচালি পড়া। এই পাঁচালি ও ব্রতকথা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

কোনো বিশেষ মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য একেকটি ব্রত করা হয়। যিনি এই ব্রত পালন করেন তিনি হলেন ব্রতী। বিভিন্ন ধরনের ব্রত হয়। যেমন—নারীর ব্রত, শাস্ত্রীয় ব্রত, কুমারী ব্রত ইত্যাদি। কোনো বিশেষ দেব-দেবীর পুজো প্রচারের

নিমিত্ত একটি নির্দিষ্ট দিনে অথবা মাসে ব্রত পালন করা হয়। পুজোর সব উপাচার নিষ্ঠা ভরে সাজিয়ে এবার ব্রতী তার পরিবার পরিজনকে হাতে ফুল, দূর্বা দিয়ে শুরু করে পাঁচালি পাঠ। সেই কোন্ ছোট্টবেলা থেকে শুনে আসছি লক্ষ্মীর পাঁচালি—

দোল পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ।
মৃদুমন্দ বহিতেছে মলয় বাতাস॥
লক্ষ্মীরে লইয়া বামে বসি নারায়ণ।
করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন॥

এই পাঁচালির পাঠান্তরও পাই। যেমন—দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে কোনো কোনো পাঁচালি গ্রন্থে আছে—"ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস।" এইরকম পাঠান্তর পাই আরও কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে। তবে পাঁচালি শুরুর আগে আরও কয়েকটি রীতি মানতে হয়, ঘট স্থাপন করে 'গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ' বলে স্তব পাঠ করে শ্রীং মন্ত্রে জপ, এবার বিষ্ণু, কুবের,ইন্দ্র ও অষ্টনিধির বন্দনা করে তিনজন অথবা পাঁচজন সধবা নারী দূর্বা ও আতপ চাল নিয়ে ব্রতকথা শুনবে।

লক্ষ্মীর পাঁচালির তিন থেকে চারটি পর্ব—প্রথম পর্বে নারদ মুনি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে মর্ত্যবাসীর দুঃখ-কষ্টের কথা নিবেদন করে। মা লক্ষ্মী নিজের সন্তানদের যন্ত্রণার কথা শুনে খুব কষ্ট পান, তবু স্নেহশীলা মায়ের মতোই তাদের চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ধরিয়ে দিতেও পিছপা হন না—'দিবা নিদ্রা অনাচার ক্রোধ অহঙ্কার।/আলস্য কলহ মিথ্যা ঘিরেছে সংসার।' এরকম নানান কারণে তিনি চঞ্চলা হয়েছেন। দেব দ্বিজে গুরুজনে শ্বশুর শাশুড়িকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিয়ে গৃহের মঙ্গল কামনায় শাঁখ বাজানোর শুভ আচার কবেই ছেড়েছে নারীরা। নারায়ণ বুদ্ধি দেন, যে লক্ষ্মীদেবী তাঁর পুজো পুনরায় প্রচারের জন্য একবার মর্ত্যধামে যান। অবন্তী নগরের অধিপতি ধনেশ্বর রায় একান্নবর্তী পরিবারে ধনে-ঐশ্বর্যে ভালোই ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর ভাইদের মধ্যে কলহ হেতু সংসার ছারখার হয়ে যায়। ফলে লক্ষ্মী নিলেন বিদায়।

বৃদ্ধা মা একাকিনী মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। এই সময়ে মা লক্ষ্মী দেখা দিয়ে গৃহের শান্তি ফেরানোর জন্য বৃহস্পতিবার (গুরুবার) ঘট স্থাপন করে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন এঁকে আমের পল্লব দিয়ে পুজো করে পাঁচালি পাঠ করতে উপদেশ দেন। যথারীতি ধনেশ্বরের সংসার আবার ফুলে ফলে ভরে ওঠে। পরের পর্বে এক রুগ্ন ব্রাহ্মণের ঘরেও লক্ষ্মীর কৃপা হয় তাদের আন্তরিক ব্রতপালনের জোরে।

এই পাঁচালির গল্পে মানুষের স্বভাবের বিভিন্ন দিকগুলি যেমন ফুটে ওঠে তেমনই দেবী তার বিধান দিয়ে দেন। এই লক্ষ্মীর পাঁচালির শেষ পর্বে এক ধনমদে মত্ত সদাগর অহংকারে পূর্ণ হয়ে লক্ষ্মীর পুজোকে অপমান করে। এই চারিত্রিক। ত্রুটির কারণে সে এরপর সর্বস্ব খোয়ায়। অবশেষে নিষ্ঠা ভরে লক্ষ্মীর ব্রতকথা অন্তে পাঁচালি পাঠের পর সমস্ত বিপদ কেটে গিয়ে ফিরে আসে গৃহে সুখ শান্তি। একেবারে শেষে স্তুতি ও বন্দনা করে পাঁচালি শেষ। প্রসঙ্গত মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য চরিত্র চাঁদ সদাগরের সনকার ঘটে লাথি মারার ঘটনাটি মনে পড়ে। অতি অহংকার যেমন ক্ষতিকারক তেমনই অপরের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানাও অশোভন। এই ভারসাম্য বজায় রাখার কাজটি করে এইসব বাংলার ব্রতকথাগুলি। মঙ্গল কাব্যের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রথমটি বন্দনাংশ। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে অবশ্যই থাকবেন আদিদেব গজানন, তারপর একে একে সূর্য এবং থাকবেন

কবির আরাধ্য দেবতা, অর্থাৎ যাঁকে নিয়ে কবি তাঁর কাব্যটি বা পাঁচালিটি রচনা করছেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালি শুরু হচ্ছে গণেশ, ভবানী, বিষ্ণু এবং সত্যপীরের বন্দনা করে। বৃদ্ধ বিপ্রকে কৃপা করতে চান সত্যপীর কিন্তু বরাবরের হিন্দু ব্রাহ্মণের তাতে আপত্তি। একসময়ে অভাবের কারণে তিনি সত্যপীরের সিন্নি দেন এবং কৃপা লাভ করেন। পরবর্তীতে যখনই বিপদে পড়েন তখনই সত্যপীর উদ্ধার করেন। হিন্দু মুসলমান সমপ্রীতির এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাজেই ব্রত ও পাঁচালি শুধুই অন্তঃপুরবাসিনীদের ঘরোয়া পুজোর জন্য নয়, তার মধ্যে ফুটে ওঠে ধর্মের বিদ্বেষ ভুলে মানবতার জয়গান।

'পথের পাঁচালি'-তে পুণ্যিপুকুর ব্রত পালন করতে হচ্ছে বালিকা দুর্গাকে। মায়ের কড়া হুকুমে সে খুব জোরে জোরে পাঠ করতে থাকে মন্ত্র, বুঝে অথবা না বুঝেই। চন্দন, ফুল,দূর্বা ও একঘটি জল—এই ক'টি সামান্য উপাচারেই এই ব্রত করা যায়। মূলত কুমারী কন্যের স্বামী লাভের উদ্দেশ্যে—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালাকে
পুজেরে সকাল বেলা
আমি সতী লীলাবতী
ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।

দেখুন, এই মন্ত্রে 'ভায়ের বোন ভাগ্যবতী', অর্থাৎ ভাই থাকলে মেয়েদের একটু পৃষ্ঠবল বাড়ে, অন্য দিকে পিতার সংসার ভরে থাকে পুত্রসন্তানের মুখ দেখে। যে-কোনো সাহিত্যই সমাজের দর্পণ—এই কথাটি ক্লিশে হলেও চরম সত্য। সেদিক থেকে দেখতে গেলে পাঁচালির মধ্যে মানব চরিত্রের নানান দিক যেমন ফুটে ওঠে, তেমনই সমাজ সংসারের চিরাচরিত রীতিনীতি বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করা যায়। যদিও এক্ষেত্রে 'পথের পাঁচালি'র দুর্গার কপালে এই ব্রতপালনের ফলস্বরূপ জোটে ঘর, বর; না থাকে ভাইয়ের সখ্য। অকালেই ঝরে পড়ে গ্রামবাংলার দুরন্ত মেয়েটি। তবে এই পুণ্যিপুকুর ব্রত ও তাঁর পাঁচালির মন্ত্র আমার মন গেঁথে আছে এই সরলা বালিকার সূত্রে। এটাই চরম বাস্তব যে, দৈনন্দিন জীবনে এই পাঁচালি ও ব্রতকথা বেঁচে থাকার একটি মূল কারণ নারী। তাদের মনের অহেতুক ভীতি, অস্থিরতা ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় তারা উপোস করে ব্রত উদযাপন করে। সেইসঙ্গে চলে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে পাঁচালি পাঠ।

আমাদের বঙ্গাদেশের মাটি ভেজা, এই স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বিষধর সর্প,ং পোকা-মাকড়, কুমীর ও হিংস্র জীবজন্তুর বাস। তার সঙ্গে আছে মহামারী, কলেরা ইত্যাদি ভয়াবহ ব্যাধি। গ্রাম থেকে গ্রাম মৃত্যুর কবলে পড়ে শেষ হয়ে যেত। বিপদের থেকে রক্ষা পেতেই ভয়ে- ভক্তিতে ভক্ত আকুল হয়ে ডাকত এই দেব-দেবীদের। সবাই মিলে আসর করে শুনত পাঁচালি গান। সেই আসর এখনো নিশ্চয় কয়েক জায়গায় আছে—তবে অনেক ব্রত ও পাঁচালি আসন করে নিয়েছে মেয়ে-বৌদের মনে। তারা তাদের ছোট্ট গৃহকোণে বসে সুর করে করে আজও পড়ে চলে বিভিন্ন ধরনের পুজোর পাঁচালি।

এই ব্রতকথার কাহিনিতে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, বাস্তবে হয়তো তা হয় না। যেমন 'হরিষ মঙ্গালচণ্ডীর ব্রত'র কাহিনিতে এক গয়লানী মঙ্গালচণ্ডীর ব্রত পালন করে বেশ সুখের মুখ দেখে। এবার তার আর এতো সুখ সহ্য হচ্ছে না, তার কিছু দুঃখ চাই। কিন্তু সে যে অঘটন ঘটাতে চাইছে তাতেই সোনা ফলছে। অবশেষে তার সুখ গেল দূরে, যখন সে পাঁচালি পাঠ ও পুজো বিসর্জন দিল। তারপর অবশ্য দেবীর কৃপায় ভক্ত আবার হৃত সম্পদ ফিরে পেল। এ না হয় এক

গল্পকথা—কিন্তু ভিতরের অর্থটি মজার ছলে হলেও বেরিয়ে এসেছে। যে যার যেটুকু পাওনা তাকে সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, সুখে থাকলেও সেই সুখকে যত্ন করে ধরে রাখতে জানতে হয়। যা পাচ্ছি তা সুন্দর, তা রক্ষার যোগ্য।

লক্ষীর পাঁচালিতে দেখা যায়, বিবাদ ও কলহের জন্য ভরা সংসার ছারখার হয়ে যায়। নাস্তিক বা আস্তিক, সংযম সর্বত্র জরুরি। আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা এবং অনাচার সবসময়েই ক্ষতিকর। লক্ষ্মীর পাঁচালি সবথেকে জনপ্রিয় অথবা পরিচিত মুখস্থ হলেও নানান ব্রতকথা ও পাঁচালি পাঠ সারা বছর চলে আসছে। লক্ষ্মীর পাঁচালির মতো ইতুর ব্রত গ্রামবাংলায় বেশ জনপ্রিয়। এই আখ্যানে দেখা যায়, দুটি পিঠে বাবার থালা থেকে খেয়েছে বলে জন্মদাতা পিতা তাদের বনের মধ্যে বাঘের মুখে ফেলে আসে। তারপর মেয়ে দুটি ইতুপুজো করে রাজা ও মন্ত্রীর ঘরে স্ত্রী হিসেবে যাওয়ার সুযোগ পায়।

তবে এখানেও দু'বোনের ভাগ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ইতুপুজো করে যে বোন অর্থাৎ ঝুমনো তার ঘর সুখ-শান্তিতে ভরে ওঠে। উমনোর দুঃখের দিন শেষ হল বোনের কথায় এই ব্রত পালন করে। অঘ্রান মাসের প্রতি রবিবার এই ব্রত করে অঘ্রান সংক্রান্তির দিন নদী, পুকুর অথবা গঙ্গায় ইতু বিসর্জন দিতে হয়—"অষ্ট চাল, অষ্ট দূর্বা, কলস পাত্রে থুয়ে।/শোনরে ইতুর কথা এক মন প্রাণ হয়ে॥/ইতু দেন বর।/ধন ধান্যে পুত্রে বাড়ুক তাদের ঘর॥" লক্ষণীয় যে, পুরুষশাসিত সমাজে পুত্র কামনাতেই পিতা-মাতার সমস্ত অভীপ্সা থাকায় সেখানে কন্যার মঙ্গালামঙ্গালের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই ইতুর বরে পুত্র বৃদ্ধির বর একপ্রকার সমাজ মানসিকতার পরিচয়। কবি মল্লিকা সেনগুপ্তর কবিতাটির অসাধারণ পঙ্‌ক্তিটি মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে—"আমাদের পুত্র চাই শুধু...।"

আরও কয়েকটি ব্রতকথা ও পাঁচালির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—বারের ঠাকুরের পাঁচালি, বিপত্তারিণী মায়ের ব্রত, অরণ্যষষ্ঠী ব্রত, কুলুই মঙ্গাল চণ্ডীর ব্রত ইত্যাদি। বেশ কয়েকটি ব্রত শুধু ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ প্রাপ্তির জন্য সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে পরিবেশ ও প্রকৃতি সচেতনতার উদ্দেশ্যে। যেমন—'পৃথিবী ব্রত'। মাটির উপর পিটুলি দিয়ে পদ্মপাতা এঁকে এই ব্রত করতে হয়। মাটি আমাদের ভিত্তি ভূমি। মাটি হল আমাদের কাছে মায়ের মতো। সেই চরম ও পবিত্র সত্যকে বন্দনা করে ব্রতী পাঠ করেন—'এসো পৃথিবী বসো পদ্মপাতে/তোমার পতি শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম হাতে।' এইভাবে আমরা বসুন্ধরার স্তব করার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ শান্তির উপায় লাভ করি। এরকমই একটি ব্রত হল—অশ্বত্থ ব্রত। এই ব্রতটির ফল স্বরূপ নারীগণ সন্তানবতী ও স্বামীর আদরিণী হবে। এইভাবেই চলছে আজন্ম কাল ধরে ব্রতপালন ও পাঁচালি পাঠ।

তবু শেষে এসে দুটো-একটা কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়—লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনবে শুধুই সধবারা। গৃহের শ্রী ভঙ্গা হবে। নারীদের শ্বশুর বাড়ির যত্ন আত্তি না করলে শুধুই বিবাহের জন্য অধিকাংশ ব্রতপালনের নিয়ম। আর সেই সঙ্গে পুত্রসন্তানের মুখ দেখার চিরাচরিত আকুলতা। সধবা নারীদের সঙ্গে পাঁচালি শুনতে বসুক না কেন কুমারী ও বিধবারাও।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অধ্যাত্মভাবনা

মন্দিরা দে

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনায় ঠাকুর পরিবার ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল অনেকখানি। কুলধর্মে ব্রাহ্ম হলেও রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণ মানবধর্ম থেকে মুক্ত ঠাকুরবাড়ির আদর্শে লালিত হয়ে উঠেছিলেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবোধ লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা উপনিষদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক-ঔপনিষদিক জীবনবাণী কবির সাহিত্যসাধনায় প্রতিফলিত হলেও রবীন্দ্রমানস গঠনে বৌদ্ধধর্মাদর্শ, পুরাণের কল্যাণময় জীবনাদর্শও সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তা কাব্যরচনার সূচনালগ্ন থেকেই। রবীন্দ্রকাব্যের সূচনাপর্বে কবির উচ্ছ্বাস ও আবেগের প্রাবল্য বেশি দেখা যায়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে প্রকৃতিপ্রেম, সৌন্দর্যপিপাসা, মানবপ্রীতি কবিকে অধ্যাত্ম ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছে। কবি বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী এক বিরাট সত্তাকে অনুভব করেছেন, অনুভবের আনন্দে মেতে উঠেছেন। কবির চিত্তে নিসর্গচেতনায় ও নিখিল মানবের প্রতি প্রেমানুভূতিতে অসীমের প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে—

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
> ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
> আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।[১]

এই সময়পর্বে লেখা অনেক প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের কথা লিখেছেন। ঈশ্বর-প্রকৃতি-মানবের মধ্যেকার একটা ঐক্য কবিকে নিখিলের বিচিত্র রসাস্বাদনের জন্য ব্যাকুল করেছে। পৃথিবী মাতার সঙ্গে কখনও স্নেহ-বাৎসল্যের ভাব অনুভব করেছেন, কখনো কবির চেতনার প্রবাহ মর্ত্যমাটির গাছ হয়ে পল্লবিত-কুসুমিত হয়ে উঠেছে, কখনও

সূর্যোদয়ের আলোতে অহং-এর আবরণ দূরীভূত হয়ে কবির দৃষ্টিতে 'সর্বকালীন মানব'-এর স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এরপর 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', চৈতালি' কাব্যে কবিকল্পনার উদারতা ও বিশালতা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের মূলধর্ম কবিধর্ম। তাই বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্বমানবকে কেন্দ্র করেই কবির অধ্যাত্মবোধ গড়ে উঠেছে। এই কাব্যপর্বে অখণ্ড সৌন্দর্যসাধনা, গভীর বিশ্বাত্মবোধ কবির চিত্তে জাগ্রত হয়েছে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বব্যাপ্ত প্রেমানুভূতি, অনির্বচনীয় রহস্য কবি-হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে। উপনিষদে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ও তার অখণ্ড রূপের মধ্যে যে আনন্দের দিক আছে, সেইটিই রবীন্দ্রচেতনাকে আলোড়িত করেছে। বিশ্বসংসারে 'রসস্বরূপ', 'আনন্দস্বরূপ' পরমব্রহ্মের প্রকাশ কবিচিত্তে মুগ্ধতা ও বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছে। 'পুরস্কার' কবিতায় এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে—

> শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে/চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;/সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে/ভরে আসে আঁখিজল—/বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,/বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,/লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা/সুন্দর ধরাতল।[২]

'নৈবেদ্য'-'উৎসর্গ'-'খেয়া' কাব্যে কবির রোমান্টিক অনুভূতি ক্রমশ অরূপ-অসীমের প্রতি ধাবিত হয়েছে। কবির বিশ্বমানবতা, প্রকৃতিপ্রেম, সৌন্দর্যস্পৃহা ক্রমশ ঈশ্বর-ব্যাকুলতায় প্রবেশ করেছে। এখান থেকেই কবির সৌন্দর্যব্যাকুলতা নিঃশেষিত হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। কবির এই অধ্যাত্মভাবনা সংসার বিমুখ সন্ন্যাসের আদর্শ নয়, বৈরাগ্যের সাধনা নয় কিংবা জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ নয়; বরং ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়ে সাধনার পথ অন্বেষণ, অনুভূতির গাঢ়ত্বে সুন্দর কবিত্ব রচনা। "নৈবেদ্য" কাব্যের 'মুক্তি' কবিতায় কবির অধ্যাত্ম-সাধনার আদর্শ শিল্পরূপ আছে—"ইন্দ্রিয়ের দ্বার/রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।/যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে/তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"[৩] এই সময় পর্ব থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার আদর্শ কবির জীবন ও সাহিত্যের পূর্ণতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ বোলপুরে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কবির মধ্যে সেই আদর্শ কাজ করেছিল। ভারতবর্ষের জীবনসাধনায় ঈশ্বরের পূর্ণ উপলব্ধি কবিকে তাঁর অধ্যাত্মভাবনার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাচীন সাহিত্যাদর্শ ও ধর্মাদর্শের প্রতি অনুরাগ কবির ঈশ্বর-উপলব্ধির সহায়ক হয়েছিল। 'তপোবন' প্রবন্ধে কবি বলেছেন—"ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।"[৪]

'নৈবেদ্য'-'উৎসর্গ'-'খেয়া'-র যুগে কবির ঈশ্বরভাবনায় অরূপের অনুভূতি, অসীমের উপলব্ধি যুক্ত হয়েছে। অনন্তকে উপলব্ধির পাশাপাশি কবিচিত্ত বিশ্বমাঝে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। 'উৎসর্গ' কাব্যে সুদূরের প্রতি ব্যাকুলতা প্রকৃতপক্ষে কবির অরূপকে উপলব্ধির ব্যাকুলতা—

> ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার/পরশ পাবার প্রয়াসী।/আমি সুদূরের পিয়াসি।/ওগো, সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে/বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি/মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,/সে কথা যে যাই পাসরি।[৫]

কবি ধীরে ধীরে 'ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর'কে তাঁর অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন আর বৃহৎ উদার বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে আনন্দ অনুভব করেছেন। কবি ভক্তি-প্রেম-প্রীতির অধ্যাত্মমার্গে সেই জ্যোতির্ময় সত্তার আনন্দ স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন—

আজি নীরব অভিসারে/ কে চলেছে আকাশপারে,/ কে আজি এই অন্ধকারে/শয়ন পেতেছে।/আজ বাদল-হাওয়ায় জুঁই আপনার/গন্ধে মেতেছে।[৬]

এইখান থেকে কবি এক শান্ত গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। তিনি তাঁর প্রেম-ভক্তি-কর্ম-আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে পরমসুন্দরের দিকে, অনন্ত সত্যস্বরূপের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। শুধু সুখানুভূতি নয়, দুঃখের গভীরতাতেও তিনি অনন্তের আনন্দকে আস্বাদ করেছেন। উপনিষদের 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান বিভেতি কুতশ্চন' মন্ত্রটির উপলব্ধিতে কবি দুঃখ-শোক-মৃত্যুকে অতিক্রম করে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'খেয়া' কাব্যের 'আগমন' কবিতায় কবি সেই 'আঁধার ঘরের রাজা'-কে অন্তরে আহ্বান করেছেন—

ওরে, দুয়ার খুলে দে রে,/বাজা, শঙ্খ বাজা!/গভীর রাতে এসেছে আজ/আঁধার ঘরের রাজা।/বজ্র ডাকে শূন্যতলে,/বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,/ছিন্ন শয়ন টেনে এনে/আঙিনা তোর সাজা।/ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল/দুঃখরাতের রাজা।[৭]

'নৈবেদ্য'-'খেয়া' কাব্যে কবির অরূপ ব্যাকুলতা 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' কাব্যত্রয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। এই তিনখানি কাব্যকে একত্রে রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের 'অধ্যাত্মপর্ব' বলা হয়ে থাকে। এখানে কবি 'ভক্ত ও ঋষি প্রকৃতিসম্পন্ন'। এই পর্বে কবি অরূপ-অসীম-সর্বব্যাপী বিশ্বসত্তাকে প্রিয়তমরূপে, সখারূপে উপলব্ধি করেছেন। পরমসুন্দরকে অবলম্বন করে কবির প্রেম-বিরহ-বিষাদ-সমর্পণ এই কাব্যের ভগবদ্‌প্রেমকে অনির্বচনীয় মাধুর্য দিয়েছে। পরম রসময়, পরম প্রেমময়ের সঙ্গে কবির মধুর প্রাণের লীলা, তাঁর সঙ্গে মিলনের তীব্র আকুলতা, আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা কবির অধ্যাত্মসাধনায় পূর্ণ পরিণতি এনেছে। কখনও বর্ষার পটভূমিকায় কবির 'ভগবদ্-বিরহবেদনা' উৎসারিত হয়েছে—"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরাণসখা বন্ধু হে আমার।/আকাশ কাঁদে হতাশ সম/নাই যে ঘুম নয়নে মম,/দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,/চাই যে বারে বারে।/পরাণসখা বন্ধু হে আমার।"[৮] কখনও কবি তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গস্পর্শে আনন্দে বিভোর। হৃদয়বল্লভের আগমনে কবির জীবনের সব আঁধার দূরীভূত—"আলোয় আলোকময় ক'রে হে/এলে আলোর আলো।/আমার নয়ন হতে আঁধার/মিলালো মিলালো।"[৯] 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'-তে কবির অরূপ উপলব্ধি আরও গভীর। পরম প্রেমময়ের সঙ্গে ভক্তকবির মাধুর্যমণ্ডিত লীলা গানগুলিতে অনির্বচনীয় রূপ লাভ করেছে। অন্তরতমের প্রতি কবির অহৈতুকী প্রেম, দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে—"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে/ফুটবে গো ফুল ফুটবে।/আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে/গোলাপ হয়ে উঠবে।"[১০]

'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'-র যুগ কবির ভগবদ্-সাধনার যুগ। 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর' নাটক তিনটি এই সময়পর্বে রচিত। এই নাটকগুলিতেও কবির অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। 'রাজা' নাটকে ঈশ্বর অরূপ, অপার্থিব। ঐশ্বর্যবান, শক্তিমান, ভীষণ অথচ প্রেমময় সেই ঈশ্বরকে কেবল আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায়। রানি সুদর্শনা যখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নিয়ে রাজাকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি অরূপ রাজার রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। কিন্তু রানি যখন 'সকল অহংকার ও অভিমান ত্যাগ করে দীন বেশে পথের ধুলায়' নেমে এলেন, তখন তিনি রাজার মধ্যে অরূপসত্তার সন্ধান পেলেন। তখন তিনি বলেন—'তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।' অরূপ অসীম ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবে মানবের তীব্র কামনা শান্ত পূজামূর্তিতে রূপান্তরিত হয়, 'গীতিমাল্য'-তে কবির এই উপলব্ধি আরও ব্যাপক ও

গভীর—"এই লভিনু সঙ্গ তব,/সুন্দর, হে সুন্দর।/পুণ্য হল অঙ্গ মম,/ধন্য হল অন্তর,/সুন্দর, হে সুন্দর!"[১১] 'অচলায়তন' নাটকে মানবাত্মার মুক্তিসাধক রূপে জ্যোতির্ময়সত্তার কল্পনা করা হয়েছে। জ্ঞান ও কর্ম, ভক্তি ও প্রেমের মিলনেই পরমাত্মাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। 'ডাকঘর' নাটকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ 'রাজা' বন্ধনমুক্তির প্রতীক, জীবন-মৃত্যুর স্রষ্টা। মুক্তিপিপাসু মানব মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আনন্দ স্বরূপ ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়।

'বলাকা' পর্বে কবির পরিপূর্ণ ভগবদ্-উপলব্ধি নতুন পথে যাত্রা করেছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে পরম রসময়ের সঙ্গে কবির অতীন্দ্রিয় মধুর লীলা ছিল আত্মকেন্দ্রিক, অসীমের অভিসারী। এরপর কবি বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনের প্রেক্ষাপটে অরূপ-অসীমের লীলারূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি এরপর থেকে নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই পর্বে কবি সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন গতির মধ্যেই সত্যের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছেন। নিরন্তর প্রবহমান কালস্রোতে জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংস সবকিছুই ভেসে চলেছে। মানবজীবনের মধ্যেও সেই অসীম অজানার লীলা অবিরাম গতিতে চলেছে। যিনি সৃষ্টি চরাচর পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তিনি কবির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন। কবির অধ্যাত্মচেতনায় বিশ্বমানবের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ সার্থক। ঈশ্বর মানবকে দিয়েছে চৈতন্য আর মানব তাঁর চৈতন্য দিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য-মাধুর্যকে আস্বাদ করে ঈশ্বরকে করেছে আনন্দিত। এই আত্মোপলব্ধি কবির হৃদয়কে প্রশান্তি আর মাধুর্যে ভরে দিয়েছে—

> যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা/আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।/...আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,/শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।/...আমার মুখে চেয়ে/আমার পরশ পেয়ে/আপন পরশ পেলে।[১২]

অন্ত্যপর্বের কাব্যকবিতায় কবির অধ্যাত্মভাবনা ঔপনিষদিক ভাবনায় স্নাত। এই পর্বে জীবন-মৃত্যুর সংকীর্ণ সীমায় উপস্থিত কবি নিস্পৃহ-উদাসীন, উপলব্ধির গভীরতায় কবির হৃদয় পরিপূর্ণ। এতদিন কবি বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত যে অসীম আনন্দময় মহাসত্তাকে অনুভব করেছিলেন, এবার সেই সর্বব্যাপী সত্তাকে কবি বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতির মধ্যে স্থাপন করেছেন। কবির কাব্যে অতীন্দ্রিয় রহস্য আর নেই; বরং আত্মানুসন্ধান ও জীবন-রহস্য বিশ্লেষণে কবির অধ্যাত্মভাবনা সংহত শিল্পরূপ পেয়েছে। মানবমুখীনতা এই পর্বের বিশেষত্ব। কবির কাব্যের পূর্ববর্তী পর্বগুলিতেও মানবপ্রীতি, বিশ্বাত্মবোধ ছিল এবং সমগ্র কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি। কিন্তু অন্ত্যপর্বে কবির মানবপ্রীতি কল্পনা-মিশ্রিত আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং মানবের মধ্যে দেবত্বের মহিমা উপলব্ধির আনন্দ। সমালোচক বলেছেন—

> এখানে দেবতায় আত্ম-নিবেদিত মানুষ অপেক্ষা মানুষের মধ্যে বিকশিত দেবতার কথাই বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছে। এইজন্য দেখিতে পাই, 'বলাকা'র পর হইতে সৃষ্টিরহস্যের কথা এবং অধ্যাত্মরহস্যের কথা যত আসিয়াছে তাহা অধিকাংশ স্থলেই কবির নিজের ভিতরকার যে একটি বিস্ময়কর কবি-পুরুষ তাহার রহস্য ও মহিমাকে অবলম্বন করিয়াই আসিয়াছে।[১৩]

কবি তাঁর শেষজীবনের কাব্যধারায় মানবের অন্তরতমসত্তা মানবাত্মার স্বরূপকে নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই মানবসত্তা প্রথমজাত অমৃত, নবীন, নিত্যকালের। এই আত্মা অসীম ও অনন্ত। তাই মানবদেহে আবদ্ধ হলেও এই আত্মা বিশ্বাত্মার অংশ আমরা কখনো কখনো এই নিত্যকালের প্রাণকে অনুভব করি। মানবাত্মার স্বরূপকে কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন 'শেষসপ্তক' কাব্যের ২২ সংখ্যক কবিতায়—"মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,/নিত্যকালের আলো আমি,

/সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,/অকিঞ্চন আমি,/আমার কোনো কিছুই নেই/অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।"[১৪] অন্ত্যপর্বের কাব্য-কবিতায় কবির অধ্যাত্মচেতনায় সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতি ব্যাকুলতা নেই; আছে আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান। কবির আবেগ-বিহ্বল ঈশ্বর-অনুভূতি একটা শান্ত গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্যে সত্যের আনন্দ রূপ কবির হৃদয়ে স্পন্দন জাগিয়েছে। বিশ্বসত্তার আনন্দময় স্পর্শই কবির কামনা। কবি নিখিল বিশ্বের প্রাণলীলার সঙ্গে তাঁর নিবিড় একাত্মতা অনুভব করেছেন, আনন্দময় বিশ্বসত্তার স্পর্শলাভে তাঁর মানবজীবন ধন্য। সুদীর্ঘ জীবনকালে কবি মহাসত্তার যে প্রাণস্পন্দন অন্তরে অনুভব করেছেন, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের প্রতি যে একাত্মতা হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন কবি সেই সবের আনন্দানুভূতিকে সুরে ছন্দে প্রকাশ করেছেন—"লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,/ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।/যেথা যে অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে/জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারই তরে।"[১৫] রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ও অধ্যাত্মজীবন উপনিষদের ধারায় পরিণতি পেয়েছে। শেষজীবনের কাব্যকবিতায় কবির অধ্যাত্মসাধনায় উপনিষদের প্রভাব গভীর। এই পর্বে কবি বৈদিক ঋষির মতোই মানুষের মধ্যে অন্তরতম সত্যরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেছেন। আত্মার সকল আবরণকে দূরীভূত করার প্রার্থনা জানিয়েছেন। শান্ত স্থির মনে দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ থেকে চিরমুক্তি পেতে চেয়েছেন। সমালোচক বলেছেন—

> 'পরিশেষ' হইতে অসীমকে কবি মানবের হৃদয়বিহারী আত্মা রূপে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।...ভগবান আর লীলাময় নন, এখন তিনি আত্মা। কবির কাজও যেন আর লীলামাধুর্যের অনুভূতি নয়, এখন 'আত্মানং বিদ্ধি'র।...অতীন্দ্রিয় রস-রহস্যবেত্তা, কাব্য-রসিক অনেকটা অধ্যাত্ম-সাধকে রূপান্তরিত হইয়াছেন। বন্ধন-মাঝে আর মুক্তি না চাহিয়া, একেবারে বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিতেছেন।[১৬]

'আরোগ্য' কাব্যের ৩৩ সংখ্যক কবিতায় কবির ঔপনিষদিক অধ্যাত্মভাবনা বাণীরূপ পেয়েছে—"এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক/চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি/ভেদ করি কুহেলিকা/ সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।"[১৭] কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি এরপর থেকে আসন্ন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মৃত্যুর আলোকে কবি আত্মস্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। মৃত্যুদ্বারে উপনীত কবি কখনও পার্থিব জগতেই অপার্থিব আনন্দ অনুভব করেছেন, রূপের মধ্যেই অরূপের সন্ধান করেছেন, অনিত্য জীবনে নিত্যের স্পর্শ লাভ করেছেন—"এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে/অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে/অসীমের স্তব্ধতা।"[১৮] কখনও আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনিকে তিনি শান্ত স্থৈর্যে অনুভব করেছেন, মৃত্যুকে জীবনের পূর্ণতা বলে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই অমৃতলোকের দ্বার উন্মুক্ত হয় এই ঔপনিষদিক অধ্যাত্ম উপলব্ধি কবির অন্তরে প্রশান্তি এনেছে। কবির মানবাত্মার অমরত্বে অবিচলিত বিশ্বাস অনির্বচনীয় কাব্যরূপ লাভ করেছে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের কাব্যগুলিতে—

> ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন/মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,/রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা;/চিনিলাম তখনি দোঁহারে।/দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক/বরের চরম দান মরণের বধূ;/দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।[১৯]

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা কোনো ধর্ম সংস্কারের ফল নয়; তা কবির আত্মোপলব্ধি, সত্যদর্শন। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, তাই প্রকৃতি ও মানবকে অবলম্বন করেই কবির অধ্যাত্মভাবনা জাগরিত

হয়েছে। কবির অধ্যাত্মজীবন শুরু হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে, নিখিল মানবের প্রতি প্রেমানুভূতিতে। কাব্যকবিতায় কবির অধ্যাত্মভাবনার চরমোৎকর্ষ ঘটেছিল অতীন্দ্রিয়-অরূপ-অসীম শক্তির সঙ্গে মধুর লীলারহস্যে। আর কবির অধ্যাত্ম উপলব্ধির পরিণতি ঘটেছে বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতিতে, মানবাত্মার জয়গানে। কবির অধ্যাত্মভাবনায় উপনিষদের দর্শন থাকলেও স্বতন্ত্রতার দিকটি উপেক্ষণীয় নয়। কেননা কবির অধ্যাত্মচিন্তায় বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়ের গভীর আকুলতা যুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অধ্যাত্ম-অনুভূতি তাঁর কবিমানসকে ছাপিয়ে যায়নি। কবি প্রকৃতি-মানবকে সত্যের স্বরূপ জ্ঞানে ভালোবেসেছেন, অনাদি অনন্ত পুরুষের লীলারূপকে অন্তরে উপলব্ধি করে আনন্দ পেয়েছেন। এই বিশ্বজগৎকে পরমসত্তার প্রকাশ রূপে অনুভব করে কবির হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে। কবির সেই উপলব্ধির আনন্দ গান মন্ত্রের মতো গভীর ও প্রশান্তিদায়ক। তাই কবির অধ্যাত্মভাবনাকে কবি-অনুভূতিও বলা যেতে পারে।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ. ৫৫
২. তদেব : ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫
৩. তদেব : ৪র্থ খণ্ড, ১৩৯৪, পৃ. ২৮১
৪. তদেব : ৭ম খণ্ড, ১৩৯৫, পৃ. ৭০১
৫. তদেব : ৫ম খণ্ড, ১৩৯৪, পৃ. ৮৩
৬. তদেব : পৃ. ২০৩
৭. তদেব : পৃ. ১৪৯
৮. তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৯৫, পৃ. ২৪
৯. তদেব : পৃ. ৩৭
১০. তদেব : পৃ. ১৩৭
১১. তদেব : পৃ. ১৬৩
১২. তদেব : পৃ. ২৭৮
১৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস', সুপ্রিম পাবলিশার্স, ২০১৬, পৃ. ১৭৯
১৪. উৎস-১, ৯ম খণ্ড, ১৩৯৬, পৃ. ৭১
১৫. তদেব : ৮ম খণ্ড, ১৩৯৫, পৃ. ১৩৫
১৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৪২০, পৃ. ৬৬৩
১৭. উৎস-১, ১৩ম খণ্ড, ১৩৯৮, পৃ. ৫৫
১৮. উৎস-১, ৯ম খণ্ড, ১৩৯৬, পৃ. ৯০
১৯. উৎস-১, ১৩ম খণ্ড, ১৩৯৮, পৃ. ৩০

তথ্যের সন্ধানে

১. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস', সুপ্রিম পাবলিশার্স, ২০১৬
২. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশনা, ২০১৬
৩. অজিতকুমার চক্রবর্তী : 'রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যপরিক্রমা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
৫. নীহাররঞ্জন রায় : 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা', নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় আঙ্গিক ভাবনা

গুরুপদ অধিকারী

বাংলা আধুনিক কবিতা যার হাত ধরে বিকাশ ঘটেছিল তিনি জীবনানন্দ দাশ। 'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতা সেনের নতুন এক বর্ণনা উঠে এল। তিনি লিখলেন, "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নেশা।"[১] 'তার', 'কবেকার', 'অন্ধকার', 'বিদিশার' প্রভৃতি শব্দে অনুপ্রাস অলংকার বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে ধ্বনিসৌন্দর্যের কবি সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে এক দূরসঞ্চারী ইতিহাসের রহস্যময় প্রেক্ষাপট অতি সহজেই ফুটে উঠেছে। উপমার অভিনবত্ব আরোপ করলেন 'বনলতা সেন' কবিতায়, 'পাখির নীড়ের মতো চোখ', কিংবা, 'আট বছর আগের একদিন'[২] কবিতায় 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা', 'পাখিরা' কবিতায়[৩] 'রবারের বলের মতো ছোটো বুক', 'মিনারের মতো মেঘ' ইত্যাদি। কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি ফ্যান্টাসির জগৎ নির্মাণ করেছেন। বাস্তব থেকে অবাস্তবের, লৌকিক থেকে অতিলৌকিকের জগতে যাত্রা করেছেন। সুররিয়ালিজমের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কবিতার ইমেজ, চিত্রকল্প বা প্রতীকে এসেছে নতুন মাত্রা। 'হাঁস', 'ঘোড়া', 'পেঁচা', 'ইঁদুর' প্রভৃতি পশুপাখিকে বিশেষ বিশেষ চিত্রকল্প হিসাবে প্রয়োগ করেছেন। হেমন্তের রাতে পেঁচারা বেরিয়েছে ইঁদুর শিকারের খোঁজে। মৃত জ্যোৎস্নায় তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় লিখেছেন[৪], "ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ।" তখন প্রাণীর জৈব আসক্তি কবির পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অন্য এক রূপধারণ করে।

ভিন্ন এক বোধের জগতে নিমগ্ন থেকেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। কবিতায় শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত, অপ্রচলিত দেশজ শব্দ, গ্রাম্য শব্দ কিংবা ইংরাজি শব্দ তিনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এমনকি 'মহাপৃথিবী' কাব্যে 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় 'সঙ্ঘারাম'-এর মতো দুরূহ অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত কিছু শব্দ—

● **ইংরাজি শব্দ :** ব্লিজার্ড, স্কাইলাইট, পিস্টন ইত্যাদি।

● **দেশি শব্দ :** ছুঁড়ি, ডাঁশা, আঁশটে, চেকনাই, গাড়োল, ঠ্যাং, ডাঁশা, মরকুটে, বিয়োনো ইত্যাদি।

● **বিশেষণের ব্যবহার :** মেঠো চাঁদ, নরম নদী, অদ্ভুত আঁধার, টেরিকাটা মাথা ইত্যাদি।

বক্তব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখানোর প্রয়োজনে দেশি-বিদেশি, তৎসম-দেশি শব্দের Contrast তিনি অনায়াস দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন। তাঁর শব্দ কেবল শব্দের প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, শব্দের মধ্যে বিশেষ অনুভূতিকে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করেছেন। 'নরম নদী', 'দুধের মতো শাদা নারী', 'চিতার গন্ধ', 'আগুনে ঘিয়ের ঘ্রাণ' ইত্যাদি বর্ণ-গন্ধময় অনুভূতি তার উদাহরণ। একই শব্দের ক্রমিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তিনি অপরূপ ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন, 'আদিম দেবতারা' কবিতায়[৫]—

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত
—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—

শব্দের পাশাপাশি ক্রিয়াপদ ব্যবহারের দিক থেকেও তিনি একটি অনন্য রীতির প্রয়োগ করেছেন। সাধারণ রাঢ়ি উচ্চারণে ক্রিয়াপদেও 'ল' ধ্বনি 'ন'-কারে পরিবর্তিত হয়। এর ফলে দেখা যায়, করলাম > করনু; খেলাম > খেনু, পেলাম > পেনু ইত্যাদি হয়। এই ধরনের ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কোথাও জীবনানন্দ দাশের কোনো বাছবিচার ছিল না। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি মূলত মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। যেমন—'আমারে দু'দণ্ড শান্তি/দিয়েছিল নাটোরের/বনলতা সেন।' (৮+৮+৬)

এই রীতির পয়ার ছন্দের প্রতিই তাঁর বেশি আকর্ষণ ছিল। তবে 'জীবন', 'প্রেম', 'মৃত্যুর আগে', 'শকুন' প্রভৃতি কবিতায় মহাপয়ার ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। আবার 'হাওয়ার রাত', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'ঘাস' প্রভৃতি কবিতা গদ্যছন্দে রচিত হয়েছে। সারাজীবন কবিতা রচনায় মাত্র দুটি সনেট তিনি লিখেছেন। এগুলি হল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের 'শকুন' কবিতা এবং 'বনলতা সেন' কাব্যের 'পথহাঁটা' কবিতা। সাধারণ বাক্‌চালের সঙ্গে কবিতার নিরূপিত ছন্দকে কোথাও যেন তিনি মেলাবার চেষ্টা করে গেছেন। শব্দের ধ্বনিবিন্যাসে তিনি একটা ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকে উচ্ছ্বাসবহুল ইংরেজি কবিতা থেকে সরে এসে ১৯১২ সালে একদল আধুনিক কবিগোষ্ঠী ইংল্যান্ডে ইমেজিস্ট কবিগোষ্ঠী রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে টি.ই.হিউম, হিল্‌ডা ডুলিট্‌ল এজরাপাউন্ড, রিচার্ড অল্ডিংটন ছিলেন প্রধান। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ১৯১৩ সাল থেকে তারা কবিতার নূতন আঙ্গিকের কথা বলতে থাকেন। এবং তারা ছয়টি সূত্রকে সংকলিত করে প্রকাশ করেন 'ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো'। সেখানে বিষয়-নির্বাচনে কবিদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এর অনুসরণ করে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'দময়ন্তী' কবিতা-সংকলনের প্রথম সংস্করণে (১৯৪৩) গ্রন্থের শেষে কাব্যের আঙ্গিক নির্দেশ সম্পর্কিত একটি ছয় সূত্রের সংকলন মুদ্রিত করেছিলেন। পরে সেটি বর্জন করলেও সেখানে তিনি যা বলেছিলেন তা হল[৬]—

১. বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে সরে আসা যাবে না।

২. সাধু ক্রিয়াপদ 'হইবে', 'বলিবো', 'করিতেছে' প্রভৃতি ব্যবহার করব না।

৩. কাব্যিক ক্রিয়াপদ 'ফুটি', 'চলিছে', 'হতেছে' ইত্যাদিও বর্জনীয়।

৪. কাব্যিক শব্দকে সম্পূর্ণ বয়কট করে চলব। 'মম', 'তব', 'কভু', 'যেথা', 'মোদের', 'সাথে', 'মাঝে', 'আঁধার', 'সনে', 'যবে', 'মতন', 'পরান' এই ধরনের কথাগুলিকে কাছেই ঘেঁষতে দেব না।

৫. 'মতো' অর্থে প্রায়, 'দাও' অর্থে দেহ, 'দেখতে' অর্থ দেখিবারে, 'এলাম' অর্থে এনু, 'পারি না' অর্থে নারি এসবও নির্মমরূপে বর্জনীয়। প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলব। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প, হাওয়াকে পবন, পৃথিবীকে ভুবন বলব না। মুখের কথায় এদের যা বলি কবিতাতেও তা-ই বলব। অধিকরণে 'তে', (ঘরেতে, টেবিলেতে) পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক রীতি হলেও কিংবা সেইজন্যেই প্রাদেশিকতা বলে বর্জনীয়।

৬. অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক; সংস্কৃত শব্দ বেশি করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়ব কেন সূর্যকে রবি কিংবা আকাশকে গগন বলব না। কেননা, ওগুলো আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা, কিন্তু 'রতি-হ্রস্ব' কি 'স্বতঃ শ্লথ' বলতে দোষ নেই, কেননা ও ধরনের কথা আমাদের মৌখিক আলাপে কখনও ব্যবহৃত হয় না।

এই রচনার শেষে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "কাব্যিক ভাষা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। কিন্তু যদি কখনও আন্তরিক ভাবাভাবাবেগের প্রেরণায় দু-একটা কথা অনিবার্যভাবে এসেই পড়ে তাহলে সুদ্ধ সেইটে এড়াবার জন্য কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত সহজ রূপটিকে নষ্ট না করে, কিংবা সমস্ত কবিতাটি বর্জন না-করে বরং সেটাকে সহ্য করাই ভালো"। বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' কাব্যের নাম কবিতায় দেখি একই শব্দের ক্রমিক প্রয়োগ। আধুনিক কবিতার একটি বিশেষ রীতি একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার। এর মধ্যে দিয়ে পাঠকের মনে শব্দযোজনা এক ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করে[৭]—

আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকা রেখা, চাঁদ জলের নিচে,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।

শব্দগুলির ক্রমিক ব্যবহার এভাবেই এক সম্মোহনজাল বিস্তার করে রাখে। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতোই বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতেও কথ্যরীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটেছে। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে তিনি ব্যবধান দূরীকরণের সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন। কবিতায় বিভিন্ন ধরনের অলংকার প্রয়োগ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর লেখা কয়েকটি কাব্য থেকে তার উদাহরণ দেওয়া হল।

- **অনুপ্রাস :** ভাঙা গলার বাঙাল কথা রাঙালো প্রাণমন। ("দুপুরবেলা বিদায়", 'দময়ন্তী')
- **যমক :** সেখানে তারারা সারারাত ভরে আকাশ ভরে। ("সেরিনাড", 'কঙ্কাবতী')
- **সমাসোক্তি :** 'আসন্ন শীতের বেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে। ("কার্তিক", 'দময়ন্তী')
- **উপমা :** 'আঙ্গুলের নিচে সাপের খোলসের মত ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেতে আমার সব লেখা'। ("আশঙ্কা ও আশ্বাস", 'নতুন পাতা') বিভিন্ন ধরনের শব্দ, সেইসঙ্গে প্রবচনের প্রয়োগ করেছেন। যেমন—'খাড়া বড়ি থোড়', 'শিকে ছিঁড়বে বরাতে', 'ক-অক্ষর আশৈশব গোমাংস আমার' ইত্যাদি। ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বাক্যরীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিলন ঘটিয়েছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন—"তোমার নামের/শব্দ আমার/কানে আর প্রাণে/গানের মতো।" (ছন্দের মাত্রাবিভাগ : ৬+৬+৬+৫)

● **মধ্যমিলের প্রয়োগ :** কলকাতায় ক্রিসমাস, দিল্লীতে উল্লাস, আর শান্তিনিকেতনে
মেলা, খেলা, সারাবেলা বেলা যায় যায়![৮]

এবার আসি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গে। 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন[৯], "মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট। আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য।" সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মধুসূদন দত্তের মতো অবিরল সমাসবদ্ধ শব্দ, সুনির্বাচিত বিশেষণ, নামধাতু, উপসর্গ ও প্রত্যয়, তৎসম, অর্ধ- তৎসম, দেশি, বিদেশি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। দুরূহ শব্দপ্রয়োগ তাঁর রচনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। জনতার কাছাকাছি হাজির না হতে পারার কারণে তাঁর কাব্যে লোকায়ত শব্দ বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। তাছাড়া কথ্যরীতি ও কাব্যরীতি সমন্বিত যে বিশেষ কবিভাষা তাঁর সমসাময়িকেরা ব্যবহার করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরাগী ছিলেন না। এই কারণে তাঁর কাব্যে গদ্যছন্দের প্রয়োগ বিশেষ নেই। তিনি নিরূপিত ছন্দের কাঠামোর মধ্যেই কথ্য বাক্‌স্পন্দ নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

● **সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাচীন কাব্যিক শব্দ :** মম, মোর আঁখি, যবে, এবে, হেথা, পরশ, জিনি, কহে, বিথারি ইত্যাদি। কবিতার ছত্রে ছত্রে তৎসম শব্দ তিনি কীভাবে ব্যবহার করেছেন 'ক্রন্দসী' কাব্যের 'সৃষ্টিরহস্য' কবিতায় তার নিদর্শন দেখি[১০]—"কপোল কল্পনা ত্যাগ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন;/অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা;/বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা;/সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গান, পুনরালিঙ্গান"।

তৎসম শব্দের যেমন প্রচুর ব্যবহার করেছেন, নামধাতুর প্রয়োগ করেছেন, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। অব্যয়ের প্রয়োগে কবিতাকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আধুনিক কবিতার মধ্যে যে বহুস্তরীয় দিক দেখা যায়, আঙ্গিক সচেতনতা তার একটি প্রধান লক্ষণ। সুধীন্দ্রনাথ এদিক থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

● **অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ :** 'প্রার্থনা' কবিতায়, "প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাষে"।

● **বিবিধ অব্যয়ের ব্যবহার :** 'অথচ', 'অগত্যা', 'অতএব', 'যেহেতু', 'এবং' ইত্যাদি।

এই সময়ের অপর এক কবি বিষ্ণু দে এলিয়টের অন্যতম অনুসারী ছিলেন—"তাঁর কাব্যানুশীলনে এলিয়টীয় উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং এলিয়টীয় চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা স্বীকরণের মধ্যেও এলিয়টীয় প্রভাবেরই স্বীকৃতি।"[১১] প্রথমদিকে রচিত 'পূর্বলেখ' কাব্যের 'জন্মাষ্টমী' এমনই একটি কবিতা, যেখানে তিনি এলিয়টীয় আঙ্গিক তথা বিভিন্ন প্রকরণ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। যেখানে উঠে এসেছে কথ্যধর্মী বাক্‌ভঙ্গি, চরণের অসম দৈর্ঘ্য, অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন, শব্দ ব্যবহারে প্রচলিত সংস্কার বর্জন। এছাড়াও বিষ্ণু দের কবিতায় সংস্কৃতগন্ধী বিশেষণ, পৌরাণিক বিশেষণের অজস্র প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি বিশেষণের মধ্যে 'রুদন্ত বর্ষা', 'বীজকম্প্র সুনীল আঁধার', 'জাতিস্মর অন্ধকার', 'যুযুৎসু প্রাবল্য', 'নাচিকেত ধনু', 'কপিলা বসুধা', 'জটায়ু পাখা', 'অষ্টাবক্র মন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

● **বিষ্ণু দে-র কবিতায় বিদেশি শব্দ :** পিসারো, বতিচেল্লী, মান্তোভানি, ক্যাথিড্রাল, ট্র্যাফিক ইত্যাদির প্রচুর প্রয়োগ আছে।

● **বিদেশি শব্দের বিশেষণ :** 'করোগেট বিকুঞ্চিত', 'স্প্যানিশ গরম', 'স্টীল নীল' ইত্যাদি।

● **বিভিন্ন অব্যয়ের প্রয়োগ :** আহা, নাকি, তাই ইত্যাদি। যেমন, বাক্যগত উদাহরণ,

"আহা। এ যে লঙ্কাজয়ী নবজলধর"! ("গুমোট", 'পূর্ব জলধর')

কিংবা, "এর চেয়ে আহা দাঙ্গাই ভালো বেশ"। ("এঁরা ও ওঁরা", 'সন্দ্বীপের চর')

মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত রীতির ছন্দেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। যেমন, 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায়[১২]—

হালকা হাওয়ায়/বল্লম উঁচু/ধরো
সাত সমুদ্র/চোদ্দ নদীর/পার
হালকা হাওয়ায়/হৃদয় দু'হাতে/ভরো
হঠকারিতায়/ভেঙে দাও ভীরু/দ্বার।

বিষ্ণু দে 'ভিলানেল', 'সেসটিনা', 'সনেট' ইত্যাদি বিদেশি ছন্দে বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। 'নাম রেখেছি কোমলগান্ধার' কাব্যের 'ভিলানেল' কবিতায়[১৩]—"দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে/সে কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা/জোগায় কথা তাই সোনালি নদীকূলে।" 'ভিলানেল' কবিতার ছন্দ সংকেত ক-খ-ক, ক-খ-ক, ক-খ-ক-ক। গদ্যরীতির কবিতা লিখলেও বিষ্ণু দে-র কবিতায় এজরা পাউন্ডের মতো সংগীতধর্ম বা লিরিক্যাল সুরের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন—

তোমার আঙ্গিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বার খোলো বঁধু তাই দেখে।[১৪]

লিরিক্যাল সুর বা গীতিরসের মধ্যে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আরও উদাহরণ—

> গান আমার ছড়ায় মাঠে, ধানের ক্ষেতে, বর্ষাজলে/আউষের বীজবপনের উতোল হাতে ছন্দে চলে/জৈষ্ঠ্যের আশকারাতে আড়ংজমা জয় জয়কার/ভেসেছে আষাঢ় ধারায় রেলের বাঁধের ডুববে দু'পার।[১৫]

আধুনিক কবিদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত জটিলতা ফুটে উঠেছে অমিয় চক্রবর্তীর লেখায়। এই প্রসঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন[১৬]—

> মনকে আয়না, কাচ, সিনেমা, কখনও-বা পুকুরের চিত্রকল্পে দেখেছেন অমিয় চক্রবর্তী। অর্থাৎ রিল্‌কের কাব্যাদর্শ গ্রহণ ও প্রতিফলন তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।...এই দৃষ্টির দর্শনের ফলে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা ইমপ্রেশনিস্ট ধর্মলাভ করেছে। টুকরো-টুকরো ছবি, অসম্পূর্ণ বাক্য, অনুচ্চারিত যোগসূত্র, অস্পষ্ট আভাস 'অভিজ্ঞান বসন্ত' পর্যন্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইনি দেশি শব্দ, সংস্কৃত, সব ধরনের শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। যেমন—'পারাপার' কাব্যের "সামুদ্রিক" কবিতায় সংস্কৃত শব্দ যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—"কার্পেট বুনোনি দেখেচি বিবর্ণ মরুর ইরানে/রঙের ক্ষিদেয় রঙ তৈরি; কিছু স্মারণিক;/সঞ্চিত বর্ণানকান্।"

● **দুরূহ ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ :** ড্রাগস্টোর, ক্যাফেটারিয়া, নেভাডা ইত্যাদি। এমনকী কবিতার নাম দিয়েছেন "অ্যাক্সিডেন্ট"। 'অভিজ্ঞান বসন্ত' কাব্যের এই কবিতায় দেখি—"চাদরে ঢাকা দাও। চুপ। ঘুমিয়েছ।" ট্রিং

"কে" "টেলিফোন ডাক্‌চে?"—হাঁ হেলো নার্সিং—"।

● **ধ্বন্যাত্মক শব্দ :** অমিয় চক্রবর্তীর 'মাটির দেয়াল' কবিতায় "ঝাঁ ঝাঁ দুপুর; ঝিঁঝিঁ সন্ধে, ঘুঁটে পোড়ানো" ইত্যাদি। নতুন নতুন বহু শব্দ নির্মাণ করেছেন। যেমন, রোদ্দুরি, সবুজি, মরন্ত,

জীবনতা, আনন্তিক, মননায়িত, ধান-খুসি, মাছ-খুসি ইত্যাদি। তিনি কবিতার মধ্যে চিত্রধর্মের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তবে অধিকাংশ কবিতায় তিনি অন্ত্যমিলের প্রয়োগ করেছেন। কিংবা সাধারণ গ্রামীণ জীবনধারাকে তুলে ধরতে গিয়ে অন্ত্যমিলের মধ্যে কবিতায় অসামান্য চিত্রধর্মিতা ফুটিয়ে তুলেছেন—

> হালে বলদ জুতচে,/ঝাঁপ মাথায় চাষী বৃষ্টিতে চারা পুঁতচে;/পসলা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম তাপ,/ধান পাকানো তাপ;/টনটনে নেবুফুলে ঠাণ্ডা হাওয়া;/সোনালি কাঁটা কাঁঠাল ভরাট আম,/ঝিকঝিকে গ্রীষ্মে পাওয়া। ("বসুধা", 'অভিজ্ঞান বসন্ত')

এই প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন[১৭]—

> গদ্য-কবিতার ভাষায় কবিতার আমেজ নিয়ে আসার কিছুটা আগ্রহ অমিয় চক্রবর্তীর ছিল বলে মনে হয়। তিনি প্রধানত ক্রিয়াপদহীন ছোটো ছোটো বাক্যের সাহায্যে সে-কাজটি সম্পন্ন করেছেন।...সবরকম শব্দ ব্যবহারে তিনি আগ্রহী অনুপ্রাসে বিশেষত অন্ত্যানুপ্রাসে আগ্রহী নন। তাঁর গদ্যকবিতার উপলব্ধির প্রকাশভঙ্গি চিত্রময়। বাক্যগুলি ছবি ফোটায়। তাঁর গদ্যকবিতার নিজস্ব ধরন এটা।

অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন একজন অসাধারণ ছন্দশিল্পী। ভাঙা পয়ার, মুক্তক ছন্দ, মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ, স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত রীতির ছন্দ, গদ্যছন্দে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের উদাহরণ দেখানো হল—

- **মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ :** "মনের প্রহরী ভিজছে। ছাতি হাতে নিঝুম পহরে" (৮+১০)।
- **দলবৃত্ত রীতির ছন্দ :** যেখানে সে/ ডুবে আছে (৪+৪)
  সেখানে জল/নেই (৪+২)

আঙ্গিকের অভিনবত্বে, ছন্দের বৈচিত্র্যে, শব্দবিন্যাসের দক্ষতায় বাংলা আধুনিক কবিতাকে অমিয় চক্রবর্তী এক ভিন্নরূপ দান করলেন। কোথাও কোথাও বাক্যবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে শব্দের আলপনা সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাক্যনির্মাণ দেখা যায় কবি অমিয় চক্রবর্তীর লেখায়। কবিতায় এসেছে কথনরীতির গদ্যভঙ্গি।

তিরিশ-চল্লিশ দশকের মূল পাঁচ কবির কবিতার প্রকরণ বা আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করা গেল। কল্লোলের পর থেকেই দেখা গেছে, কবিরা সমস্ত গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে ওঠে কবিতাকে সাবালকত্ব দান করেছেন। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুরূহ শব্দ, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ, গ্রাম্য বা দেশি শব্দ অনায়াস দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন। লোকায়ত রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কবিতার মধ্যে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাক্যনির্মাণ করেছেন। নানা অলংকারের প্রয়োগ করেছেন। ইম্প্রেশনিস্ট, সুররিয়ালিস্ট প্রভৃতি কবির ভিন্ন ভিন্ন বোধ কবিতার মধ্যে দানা বেঁধেছে। ছন্দের ক্ষেত্রে সাধারণ নিরূপিত ছন্দ থেকে শুরু করে গদ্যছন্দ, সনেটের প্রয়োগ করেছেন। এসব ব্যাপারে পাশ্চাত্য কবিরা ছিল তাদের প্রেরণা। উপমা, রূপক অলংকার প্রয়োগে এসেছে অভিনবত্ব। কবিতার বক্তব্যকে কখনও সরাসরি, কখনো-বা তির্যকভাবে প্রকাশ করেছেন। যুগযন্ত্রণা, অস্থিরতা, হতাশা ইত্যাদি প্রকাশ করতে গিয়ে কবিরা আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকের কাছেই কবিতার অঙ্গাসজ্জা হয়ে উঠেছে কবির আত্মপ্রকাশ তথা আত্মগোপনের অবলম্বন। এভাবেই বাংলা আধুনিক কবিতার ভূগোল সম্প্রসারিত হয়েছে। মহাযুদ্ধোত্তর এক নতুন সংজ্ঞা নির্মিত হয়েছে। যার ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে এসেছেন ষাট ও সত্তরের দশকের কবিরা। যাদের অন্যতম উত্তরসূরী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

উৎসের সন্ধানে

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত : 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র', অবসর, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ১৫৩
২. তদেব : পৃ. ১৮৩
৩. তদেব : পৃ. ১১০
৪. জীবনানন্দ দাশ : 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', নিউ স্ক্রিপ্ট, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ২২
৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
৬. সুমিতা চক্রবর্তী : 'আধুনিক কবিতার চালচিত্র', সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১৬, পৃ. ১৮৩-১৮৪
৭. বুদ্ধদেব বসু : 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ১৯৬০, পৃ. ২৮
৮. তদেব : পৃ. ৭৩
৯. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : 'মুখবন্ধ', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০, পৃ. ১৭২
১০. তদেব, পৃঃ ৭৬।
১১. অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় : 'এলিয়ট বিষ্ণু দে ও আধুনিক বাংলা কবিতা', প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৬, কলেজ স্ট্রিট পাব্‌লিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১২৪
১২. বিষ্ণু দে : ''ঘোড়সওয়ার'', 'বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৫৫, পৃ. ১৮
১৩. তদেব : পৃ. ১১৫
১৪. তদেব : পৃ. ৪১
১৫. তদেব : পৃ. ৩০
১৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী : 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ২৮৫
১৭. তদেব : পৃ. ২৫৫

জীবনানন্দের কবিতায় আত্মসমীক্ষণ
অনন্বয় থেকে সমন্বয়ের অভিমুখে যাত্রা

সৌরভ মজুমদার

বিশ শতক আবির্ভূত হল এক নিরন্ধ্র তমসের দমবন্ধ আবর্ত নিয়ে। প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি সম্বন্ধে মানুষের যাবতীয় ধারণা ওলোটপালোট হয়ে গেল। চারপাশে তাকিয়ে কবি দেখতে পেলেন কেবল এক 'Waste Land'-এর ছবি। সব নষ্ট, সব ধ্বস্ত, জ্বলে-পুড়ে গেছে সব। প্রতীচ্য কাব্যপ্রকরণে যুগের কোরকে অবলীন অন্ধকারের পদপাত শোনা গেল, আর সে পদচারণার বিকট প্রতিধ্বনি ঘুম ভাঙিয়ে গেল বাঙালি কবিকুলেরও। ১৯১৪-'১৯-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভূতপূর্ব প্রাণক্ষয়, ১৯৩৯-'৪৫ছয় বছর ধরে বেজে চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্লান্ত দামামা, ১৯৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তর, কলকাতায় জাপানের বোমাবর্ষণ, ১৯৪৬-এর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ১৯৪৭-এর অসম্পূর্ণ, স্বার্থসিদ্ধ স্বাধীনতা—এক বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাবাতের মতোই বিশ শতকের প্রথমার্ধের এই ঘটনাপ্রবাহ বাঙালি কবিমানসে অন্তঃশায়ী চাঁদ-ফুল-পাখি-তারার ক্রমবর্ধমান স্তূপে অগ্নিসংযোগ ঘটাল যেন। অন্ধ তমসের আগ্রাসনে রোরুদ্যমান পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে সত্য-শিব-সুন্দরের বন্দনাগান গাইতে অনাগ্রহী কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সমসময়ে। পরপর সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়ে গেল, মানবচৈতন্যে শুভবোধের তুলনায় অশুভত্বের, প্রেমের তুলনায় জিঘাংসার আনুপাতিক হার বেশি। আর অন্যদিকে অভিব্যক্তিবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, মনোবিকলন তত্ত্বের সম্মিলিত প্রভাব মানুষকে প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বরসংক্রান্ত ধ্রুববোধ থেকে বিচ্যুত করল, আর সেইসঙ্গে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে করে তুলল আরও প্রখর। বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে লুকোনো মানবহৃদয়ের খলতা, ক্রুরতা, নীচতা, রিপুসর্বস্বতা প্রকট হয়ে উঠল কবির সচেতন মননের কাছে। জন্মসূত্রে লব্ধ ঐতিহ্য আর মূল্যবোধ নিয়ে এই অবক্ষয়িত পৃথিবীতে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না মানুষ। আর তাই কবির চেতনা হয়ে উঠল প্রশ্নাতুর—

দেবতায় বিশ্বাস নেই আর, কোনো অলৌকিক কৃষ্ণ-নিরঞ্জনের উপর বরাত নেই, মহাশূন্যকে ব্রহ্ম মনে করে সকল বিপদ ও অন্ধকারের খণ্ডন নেই সেই অলীক আলোর ভিতর; জীবন লোকায়ত হচ্ছে, জীবনের সমস্যা মানুষকেই ঠিক করতে হবে, কোনো অগম পাহাড়চূড়ার ও-পারের আকাশকে দিয়ে কিছু হবে না—সে-উপলব্ধির বিষণ্ণতা ক্রমে আত্মনির্ভরের উজ্জ্বলতায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে; বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে, মানুষের কী আশা কী প্রশ্ন কী কাজ, নিষ্ঠার ও প্রতিভার সঙ্গে তার আলোচনার ও মীমাংসার চেষ্টা চলেছে—পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে যে-চরিতার্থতা সম্ভব তাকে আয়ত্ত করবার জন্য; মানুষ নিজেই এসে তারপর উৎখাত ক'রে ফেলছে সব; তার আত্মঘাতী স্বভাবই কি ঠিক—হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব কি-না—প্রশ্ন জাগছে।[১] জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-এর কবিতায় তাঁরই গদ্যরচনার এই প্রশ্নময়সত্তার প্রকাশ ঘটে যেন। অন্তর্দৃষ্টি আর সময়সচেতনতার সম্মিলনে কবি নিজেকে এবং সমশ্রেণিভুক্ত মানুষের ভূমিকা, তার সাফল্য-ব্যর্থতা-অকর্মণ্যতা-অবিমৃষ্যকারিতা-পলায়নপরতা—এ সমস্তই তুলে আনতে চেষ্টা করলেন কবিতায়, প্রয়াসী হলেন আত্মসমীক্ষণে। তাঁর কবিতার এই প্রবণতাটির বিশ্লেষণই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্য আর মূল্যবোধে সম্পৃক্ত আলোকিত জীবন, আর অন্যদিকে সমসময়ের যাপনগত, মননগত অন্ধকারাচ্ছন্নতা—এই দু'য়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যান, যেতে বাধ্য হন জীবনানন্দ। চিন্তা-চেতনা, মেধা-মননের এই অসহনীয় ধূসরিমা জন্ম দেয় এক 'বোধ'-এর। এই বোধ "স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়" ('বোধ'/ ধূসর পাণ্ডুলিপি), কিন্তু তা অধিকার করে করে নেয় একে একে কবির বাস্তবিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে। আর তখন—"সব কাজ তুচ্ছ হয়, —পণ্ড মনে হয়,/সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়/শূন্য মনে হয়!" (ঐ)। এই যে সর্বাতিশায়ী শূন্যতার বোধ, তার মূলে রয়েছে প্রচলিত মূল্যবোধের বিনষ্টিজনিত এক তীব্র অনিশ্চয়তার বোধ, এক ধরনের অনিকেত মনোভাব (Rootlessness) "সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে!/কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে/সহজ লোকের মত;"(ঐ)। এই অতিমাত্রিক চলমানতার যুগে মানুষ আর দু'দণ্ড শান্তির অবকাশ পায় না। পারে না সুখে-দুঃখে, আলোয়-আঁধারে মিলিয়ে জীবনকে অনুভব করতে ।পারে না জীবনের সহজতাকে উপলব্ধি করতে—"কোনো নিশ্চয়তা/কে জানিতে পারে আর" (ঐ)। পায় না সে 'প্রাণের আহ্লাদ' (ঐ), বোঝে না 'শরীরের স্বাদ' (ঐ)—

> সকল লোকের মত বীজ বুনে আর/স্বাদ কই! ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,/শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,/শরীরে জলের গন্ধ মেখে,/উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে/চাষার মতন প্রাণ পেয়ে/কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে? (ঐ)

আলোর দিকে চেয়ে থাকার এই উৎসাহই আর নেই মানুষের মধ্যে—অনুভব করতে পারেন কবি। আর এই অনুভব, এই বোধ-ই তাঁকে চারপাশের মানুষগুলির থেকে পৃথক করে দেয়, যাকে 'তৃতীয় নেত্র' বলে উল্লেখ করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার—"সেই তৃতীয় চক্ষুর আলোয় সম্বন্ধবন্ধনগুলি খুলে যায়, পীড়িত হতে হয় বিচ্ছিন্নতাবোধে।"[২] সমাজসত্তা থেকে বিযুক্তির আর্তনাদ শোনা যায় কবির মুখে—"সকল লোকের মাঝে বসে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?"(ঐ) অথচ তিনি তো আলাদা হতে চাননি! যারা জন্মেছে সন্তানের মতো হয়ে, যারা সন্তানের জন্ম দিচ্ছে, অথবা যে সন্তানেরা পৃথিবীর বীজক্ষেতে নেমে আসছে আগামী প্রজন্মকে জন্ম দেবে বলে, তাদের মতো হয়েই তিনি থাকতে চেয়েছেন। থাকতে চেয়েছেন চাষার মতো হয়ে, মেছোদের মতো সহজ হয়ে, 'বাতাসের মতো অবাধে' (ঐ) বহমান এক জীবনে 'পুকুরের

পানা, শ্যালা-আঁশ্‌টে গায়ের ঘ্রাণ' (ঐ) গায়ে মেখে—"এইসব সাধ/জানিয়াছি একদিন অবাধ অগাধ" (ঐ); চারপাশের অন্য মানুষগুলির মতোই—"ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে/ অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে/ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;" (ঐ)। কিন্তু সেই ভালোবাসার মধ্যেও সহজতা পাননি—"ধুলো আর কাদা" (ঐ)-র মতোই তা মূল্যহীন হয়ে গেছে আজ। মানুষের মুখ দেখে, মানুষীর মুখ দেখে, শিশুদের মুখ দেখে থাকতে চাইছেন সহজ, স্বাভাবিক কিন্তু পারছেন না এই বোধের জন্য। এই বোধ-ই যেন এক অন্তর্ভেদী চোখের মত দেখিয়ে দিচ্ছে চারপাশের মানুষগুলির বিচ্যুতি, চোখের 'কালো শিরার অসুখ' (ঐ)-এর মতো অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি, পরস্পরের হৃদয়ের বার্তা শুনতে না পাওয়ার মতো 'বধিরতা' (ঐ), 'কুঁজ-গলগণ্ড' (ঐ)-এর মতো অস্বাভাবিক অতিরেকসর্বস্ব জীবনযাপন, 'নষ্ট শসা-পচা চালকুমড়ো' (ঐ)-র মতো অসার হৃদয়। 'পারেপারাপারে' (ঐ) পথ চলে উপেক্ষা করতে চাইছেন কবি এই 'বোধ'-কে-পারাপার করছেন সহজতা আর অসহজতার পারে, আলো আর অন্ধকারের তটে কিন্তু মড়ার খুলির মতো সেই 'বোধ' জীবন্ত মাথার মতো ঘুরতে থাকে তাঁর মনন, অভিজ্ঞতা, হৃদয়বত্তাকে আচ্ছন্ন করে। পারেন না আত্মছলনা করে মিশে যেতে সকলের মধ্যে। বলে ওঠেন, "তবু আমি এমন একাকী!" (ঐ)। আর তাই সকল দেবতাকে ছেড়ে 'নিজের প্রাণের কাছে' (ঐ) চলে আসেন কবি। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—জীবনানন্দের এই 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' যেন অস্তিবাদীদের বারবার বলা 'Authentic I', "নষ্ট শসা-পচা চালকুমড়োর ছাঁচে" গড়া হৃদয়ের হৃদয়হীনতা থেকে বাঁচতেই কবি আত্মস্মরণ প্রার্থনা করছেন, যে ব্যভিচারী প্রহরে মানবহৃদয় হয়ে যায় বিপণনযোগ্য, সেই কালবেলায় কবি বরং নৈরাশ্যের নৈমিষারণ্যে অজ্ঞাতবাসকেই সময়োচিত মনে করেছেন।[৩] এ যেন কিয়ের্কেগার্দের ধারণায় অস্তিত্বের স্বরূপচিত্র যেখানে অস্তিত্ব 'Inwardness' বা অন্তর্মুখিনতারই নামান্তর।

বহিঃপৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে তাই কবি "গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে" ('অন্ধকার'/বনলতা সেন) লালন করতে চেয়েছেন 'আত্মা'-কে, চেয়েছেন 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে'(ঐ) থাকতে। কিন্তু 'জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে'('অবসরের গান'/ধূসর পাণ্ডুলিপি) জীবন কাটে না মানুষের, মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই তাকে বারবার এসে দাঁড়াতে হয় জীবনের সচল রঙ্গামঞ্চে। 'ছিন্ন রুগ্ন ঘুমন্তের চোখে এক সুস্থ স্বপ্ন'('জীবন'/ধূসর পাণ্ডুলিপি) হয়ে জীবন দেখা দেয়, কিন্তু 'জেগে উঠে সেই ইচ্ছা লয়ে/ আড়ষ্ট তারার মতো চমকায়ে'(ঐ) যেতে হয় 'শীতে-মেঘে'(ঐ)। দেখতে হয়—"সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে/উৎসব শুরু করেছে।" ('অন্ধকার'/ঐ)

কবি দেখতে পান, "মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে-আকাশে/ শকুনেরা চরিতেছে;" ('শকুন'/ধূসর পাণ্ডুলিপি)'এশিয়ার মাঠে চরা' এইসব শকুন আসলে 'পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের'[৪] প্রতীক বলেই মনে করেছেন দীপ্তি ত্রিপাঠী। কবি দেখেছেন, কীভাবে সাধারণ, তথাকথিত তাৎপর্যহীন মানুষগুলি দেশ-দখলের জুয়াখেলায় মত্ত, আধিপত্যলোভী রাষ্ট্রনায়কদের হাতের একেকটি বোড়ে হয়ে উঠেছে, আর কাজ ফুরোলে হারিয়ে গেছে, মুছে গেছে—

সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে;
সমৃদ্ধ কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর।
('সৃষ্টির তীরে'/সাতটি তারার তিমির)

'দিনের আলোর দিকে'('জনান্তিকে'/সাতটি তারার তিমির) তাকিয়ে কবি দেখতে পান, "লোক/কেবলি আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়;/এছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।" 'অন্ধকার' কবিতায় শাসকের রক্তচক্ষুর মতো "রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে/ মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে" নির্দেশ দেয় যখন মানবসত্তাকে, তখন 'সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়-বেদনায়-আক্রোশে' ভরে ওঠে। আর তাই 'জাগিবার গাঢ় বেদনার'('আট বছর আগের একদিন'/মহাপৃথিবী) এই 'অবিরাম-অবিরাম ভার'(ঐ) সহ্য করতে না পেরেই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার মানুষটি 'চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে'(ঐ) 'একগাছা দড়ি হাতে একা-একা'(ঐ) দাঁড়ায় গিয়ে অশ্বত্থ গাছের সামনে। চাঁদ-ডোবা এ আঁধার 'অদ্ভুত', কিন্তু তা-ই 'প্রধান' সমকালীন পৃথিবীতে। পৃথিবীর চারদিকে সব মাঠ যখন নিড়োনো হয়ে গেছে, "ছেঁড়া-ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে/তরাসে ছেলের মতো"('মাঠের গল্প'/ধূসর পাণ্ডুলিপি), 'আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্বলে অনেক সময়'(ঐ) সেসময় মাঠের শিয়রে এসে দাঁড়ায় চাঁদ "পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,/একদিন হয়েছে যাতারপর হাতছাড়া হয়ে/ হারায়ে ফুরায়ে গেছে"(ঐ)তারই স্বাদ নিয়ে। এই চাঁদ যেন সবশেষের পরেও আরো কিছু বাকি থাকার ইঙ্গিত নিয়ে আসে। কিন্তু "তুমি জানোএ-পৃথিবী আজ জানে তা কি!"(ঐ) পৃথিবী জানে না আজ আর সেই বাণী। এ পৃথিবীর থুত্থুরে অন্ধ প্যাঁচাদের জড়তাগ্রস্ত মস্তিষ্কে আর জ্যোতিহীন দৃষ্টিতে চাঁদ কেবল এক অন্তরায় মাত্র স্বার্থসিদ্ধির পথের বাধা। তাই 'বুড়িচাঁদ'('আট বছর আগের একদিন'/ঐ)মানুষের বিবেক আর মূল্যবোধ 'বেনোজলে ভেসে'(ঐ) গেলে তাদের মহা উপকার দু-একটা ইঁদুরপ্রতিম মানুষের সর্বনাশ করে পেটটি ভরা যায়। অনুভূতিপ্রবণ প্রতিটি মানুষেরই সেসময় মনে হয়—

জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!
মরণ, সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে! ('জীবন'/ঐ)

'পৃথিবীর বাধা' ('স্বপ্নের হাতে'/ধূসর পাণ্ডুলিপি) আর 'দেহের ব্যাঘাতে'(ঐ) হৃদয়ে বেদনা জমে ওঠে কবির, তাই এক স্বপ্নের জগতে তলিয়ে যেতে চান তিনি। আর সেই—"স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায়—স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো।" ('স্বপ্নের ধ্বনিরা'/বনলতা সেন)। কারণ—"স্থবিরের চোখে যেন জমে ওঠে অন্য কোন্ বিকেলের আলো।/ সেই আলো চিরদিন হয়ে থাকে স্থির;" (ঐ)। এই স্থিরতাকেই, নিশ্চয়তাকেই পেতে চান কবি অন্ধকারে, মৃত্যুসম নিশ্চেতনায়। তাই জীবনানন্দের কবিতার এই পর্যায়ে আলো আর অন্ধকার নিজেদের 'অর্থশৃঙ্খলা' ('জীবন/ঐ) বদলে নেয়। বস্তুত দ্যোতক-দ্যোতিতের এই নবমূর্ছনা জীবনানন্দের স্বকপোলকল্পিত নয়—এখানে প্রতিফলিত হয়েছে যুগবৈশিষ্ট্যই—

> এই বিশ শতকে এখন/মানুষের কাছে আলো-আঁধারের আর-এক রকম মানে—/...যেখানে চিন্তার ধারা রীতিহীন—শব্দের প্রয়োগ অসংগত—/প্রাণের আবেগ ঢের শতকের আপ্রাণ চেষ্টায়/যেখানে, সহিষ্ণু স্থির মানুষের সাধনার ফলে/বিপ্লবিনী নদীর বাঁধের মতো হ'য়ে—তবু কোনো একদিন/কেন যেন জলের গর্জনে আলুলায়িত হয়েছে/সেখানে (ওদের মতে) আলো নেই;/অথবা নিজেকে নিজে প্রতিহত ক'রে ফেলে আলো/সেইখানে অন্ধকার। ('এইখানে সূর্যের'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

ওদিকে দেশ উজাড় হয়ে যায় মন্বন্তর আর মহামারীর কবলে। "সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ"('বিভিন্ন কোরাস'/মহাপৃথিবী)। ব্যঙ্গের মোড়কে আবৃত এক আশ্চর্য করুণায়

পরিপ্লুত হয়ে কবি শুনিয়ে যান 'সোনালী সিংহের গল্প'। 'আমাদের ক্ষেতে-ভুঁয়ে ফলে থাকা'('সোনালী সিংহের গল্প'/সাতটি তারার তিমির) ধান 'হতমান সোনা'(ঐ)-র মতো পড়ে থাকে, আমাদেরই সঙ্গে থাকে না তার 'আন্তরিক পরিচয়'(ঐ) কারণ তা 'অবিকল পরের জিনিস'(ঐ) যে ফলায়, সেই কৃষকের নয়, 'মিড্‌লম্যান'দের(ঐ) আপন সেই শস্য। স্বতঃসিদ্ধের মতোই নিশ্চয়তায় কবি জানিয়ে যান—"মাঠের ফসলগুলো বার বার ঘরে/ তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে/পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে"('নাবিকী'/সাতটি তারার তিমির)। 'এইসব ফসলের দেশে'('সোনালী সিংহের গল্প'/ঐ) নিরন্তর হিরণ্ময়তায় প্রভাস্বর সূর্যও তাই নাটকীয়ভাবে বিস্ময় উৎপাদন করে চলে। আর শস্য-উৎপাদনকারী কৃষকদের জীবন-মৃত্যু যাদের পায়ের ভৃত্য, সেই 'মিড্‌লম্যান' ফড়েরা—

> চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার/আমাদের জরাজীর্ণ ডাক্তারের মুখ,/আমাদের উকিলের অনুপ্রাণনাকে,/আমাদের গড়পড়তার সব পড়তি কৌতুক/তাহারা বেহাত করে ফেলে সব। (ঐ)

আর এদের এইসব প্রচেষ্টারই অনুকম্পায়ী ফলশ্রুতি হয়ে আসে পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ মারা গেলেন এই দুর্ভিক্ষে। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অর্থসম্পদ ও মানবসম্পদ দুই দিক থেকেই ভারতকে আঘাত করেছিল—"The away ('drain of wealth') was expanded to 1.2 million and thousands of Indians were sent off to die in a totally alien cause."[৫] ১৯২৯-এর বিশ্বজনীন মহামন্দা ডেকে আনল মূল্যবৃদ্ধি আর বেকারত্ব। আর এই নড়বড়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চরমতম আঘাত হানল পঞ্চাশের মন্বন্তর। 'গ্রামপতনের শব্দ' ('পৃথিবীলোক'/শ্রেষ্ঠ কবিতা) শোনা যেতে থাকে, নগরের ফুটপাথে জমে ওঠে হাঘরে হাভাতে চাষা-জেলে আর দিনমজুরদের ভিড়, আর ক্রমে এইসব দৃশ্যের জন্ম হয়—

> নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে;/একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে/তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে। (বিভিন্ন কোরাস'/সাতটি তারার তিমির)

এই 'দ্বিতীয় মরণ' হল মানবিকতার মরণ, মানবের মরণ। সৃষ্টির প্রথম ভোরে প্রজ্ঞাময় সূর্যালোক 'পরস্পরের সাথে দু'দণ্ড জলের মতো মিশে' ('তিমির হননের গান'/সাতটি তারার তিমির), সহমর্মিতায়, আত্মত্যাগে, ভেদহীন মিলনের মধ্যে দিয়ে যে বাঁচা শিখিয়েছিল, আজ তা বিস্মৃত হয়েছে মানুষ"সেইসব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু/তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।" (ঐ) তারা-চোঁয়ানো আলো আজ আর প্রতিফলিত হয় না মানুষের চোখেসে চোখ হেমন্ত আকাশের মতোই ম্লান, বিবর্ণযারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাদেরও, আর যাদের জন্য তারা ক্ষুধার্ত, তাদেরও। আজ যখন ওইসব ভদ্রসাধারণের তিমিরাচ্ছন্ন মনোগহনে "সূর্যালোক নেই—তবু—/ সূর্যালোক মনোরম মনে হলে" (ঐ) হাসে তারা। ক্ষুধিত, বিপন্ন মানুষের আর্তির জবাবে তাই ফুটপাথ নিরুত্তর রয়ে যায়, আর "মধ্যবিত্তমদির জগতে/আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।" (ঐ)। মনশ্চক্ষে কবি যেন দেখতে পান—"মানবের মরণের পর তার মমির গহ্বর/এক মাইল রৌদ্রে পড়ে আছে।" ('ক্ষেতে-প্রান্তরে'/সাতটি তারার তিমির)

এক আশ্চর্য দ্বৈপযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে আজ মানুষ—'মহানগরীর মৃগনাভি' ('তিমির হননের গান'/ঐ) ভালোবেসে এক অদ্ভুত আত্মছলনাময় ঘোরের মধ্যে বাস করে চলেছে সে। কাজ করেছে ভয়াবহভাবে, অর্থভোগ করেছে, 'ভোট দিয়ে মিশে'('বিভিন্ন কোরাস'/সাতটি তারার তিমির) গেছে 'জনমতামতে' (ঐ), গ্রন্থের প্রামাণ্যতায় বিশ্বাস হারায়নি একচুলও, চারিদিকের

ক্লেদ, পাঁক আর 'পাপকথার' (ঐ) আবিল বাতাসও তাকে 'জীবনের যৌন একাগ্রতা' (ঐ) থেকে চ্যুত করতে পারেনি। 'একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে বসে'('আবহমান'/শ্রেষ্ঠ কবিতা), চোখের সামনে ছড়িয়ে থাকা 'মরুর মতো মহাদেশ' (ঐ)-কে 'সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে করে নিয়ে' (ঐ)"আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,/ চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।" (ঐ) অথচ দ্বারকার প্রাচীন স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙে পড়ে যায়—

> আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল/ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে;/কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই বলে,/যথাস্থান থেকে খসে তবুও সকলই যথাস্থানে/র'য়ে যায়। (ঐ)

অস্বাভাবিক এক বিপ্রতীপতা বিস্তার করতে থাকে তার কালো ডানা। ঘটতে থাকে 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম' ('বিভিন্ন কোরাস'/মহাপৃথিবী), মনে হয়, "গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁসে/ জীবনের বাস্তবতা" (ঐ) "প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে/সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।" ('সৃষ্টির তীরে'/ঐ)। 'অদ্ভুত আঁধার এক' ঘিরে ধরে মানুষকে চারিদিক থেকে, আর সেই আঁধারে—"যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;" ('অদ্ভুত আঁধার এক/শ্রেষ্ঠ কবিতা)। কবির মনে প্রশ্ন ওঠে, "এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময়!" ('সৃষ্টির তীরে'/ঐ) বিস্ময়াবিষ্ট, বিপন্ন এক স্বগতোক্তি উচ্চারিত হয়—

> এ কেমন পরিবেশে রয়ে গেছি সবে/বাকপতি জন্ম নিয়েছিল যেই কালে,/অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিল স্বাভাবিক পথ দিয়ে,/কী ক'রে তাহলে তারা এ-রকম ফিচেল পাতালে/হৃদয়ের জন-পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে। (ঐ)

এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাননা কবি, মনে হয় তাই—"ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন।" ('প্রয়াণপটভূমি'/বেলা অবেলা কালবেলা) 'খনিজ, অমূল্য মাটি খুঁড়ে' ('পরিচায়ক'/মহাপৃথিবী), 'রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু' (ঐ) খুঁজে পায় না যে মানুষযে 'নীল, আদিম সাপুড়ে' (ঐ) মানুষতার দিকে চেয়ে কবির উপলব্ধি হয়—"হয়তো-বা ক্রান্ত ইতিহাস/ শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।" (ঐ) চারিদিকে জিঘাংসা আর মৃত্যুর তমসাচ্ছন্নতার মধ্যেও, কবিসত্তার গহীনে কোথাও একটুকরো আশার আলো জেগে থাকে। কবি যে জানেন, নতুন ভোরের আগে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারই গাঢ়তম—

> আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি/একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে;/আরেকটি পৃথিবীর দাবি/স্থির করে নিতে হলে লাগে/সকালের আকাশের মতন বয়স;/সে সকাল কখনও আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে। ('বিভিন্ন কোরাস'/মহাপৃথিবী)

আজ যখন 'মানুষের হাড় খুলি গণনার সংখ্যাধীন নয়' ('১৯৪৬-৪৭'/শ্রেষ্ঠ কবিতা), যখন মানুষের হাত তার 'নিহত ভাই বোন বন্ধু পরিজন' ('সুচেতনা'/বনলতা সেন)-এর রক্তে ভরে গেছে—"পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার/ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু/হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর/কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে/বধ করে ঘুমাতেছি।" ('১৯৪৬-৪৭'/ঐ) তখন সেই মরণ-সাগরের বন্ধুর উপল-ব্যথিত ক্রন্দনের শব্দ ছাপিয়ে কোথাও যেন শোনা যায় 'ডানার শব্দ' ('সূর্যতামসী'/সাতটি তারার তিমির), 'সূর্যালোকিত সব সিন্ধু পাখিদের শব্দ' (ঐ) এক 'মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্বলে' (ঐ) যেন 'শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে' (ঐ) জেগে উঠতে চায় জীবন—

> সময়ের সমুদ্রের পারে/কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে/সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন/দুইটি ছড়ানো ডানা বুক নিয়ে কেউ/কোথাও উচ্ছল প্রাণশিখা/জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে—ভাবে।/ভেবে নিক—যৌবনের জীবন্ত প্রতীক : তার জয়! ('সময়ের কাছে'/সাতটি তারার তিমির)

যুগলডানাবিস্তারী সমুদ্রপাখিই কবির কাছে যৌবনের অমেয় প্রতীক হয়ে উঠেছে—হয়ে উঠেছে নতুন ভোরের বার্তাবহ। মনীষীদের 'শুদ্ধ চিন্তা' ('এইখানে সূর্যের'/শ্রেষ্ঠ কবিতা) কিংবা জ্ঞানীদের 'অটুট বাঁধের মতো মন' (ঐ)-এ তিনি সেই 'শুভ্র মানবিকতার ভোরের' ('সময়ের কাছে'/ঐ) ইশারা খুঁজে পাননি। প্রৌঢ়দের 'ডোডোমির অতল ক্রেংকার' ('বিভিন্ন কোরাস'/মহাপৃথিবী)-এ ভরসা নেই কবির, কারণ—"সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে/ তা তো নেই; স্থবিরতা আছে—জরা আছে।"('ইতিহাসযান'/বেলা অবেলা কালবেলা)। কবি এই যুগাবলীন অন্ধকার উত্তীর্ণ হতে ভরসা রেখেছেন বিপুলবিস্তীর্ণ জনতার উপরে—অভিহিত করেছেন তাদের 'উনিশশো অনন্ত' ('হেমন্ত রাতে'/বেলা অবেলা কালবেলা) নামে। তিনি জানেন, জনতার প্রতিটি মানুষ একাকী, নিজ নিজ দ্বৈপসত্তার মধ্যে বন্দী জনতাকে অবিকল অমঙ্গল সমুদ্রের মতো মনে করে—"যে যার নিজের কাছে নিবারিত দ্বীপের মতন/হয়ে পড়ে অভিমানে/ক্ষমাহীন কঠিন আবেগে।" ('উত্তরসামরিকী'/ বেলা অবেলা কালবেলা)

হতে পারে এই জনসমুদ্র কখনও 'সৎবিজ্ঞাতা'র('বিভিন্ন কোরাস'/সাতটি তারার তিমির) মতো স্থির হয়নি, 'তনুবাত নীলিমার' (ঐ) নিচে দাঁড়িয়ে চিনতে পারেনি 'নিজের জলের ফেনশির/নীড়' (ঐ) বুঝতে পারেনি ঐক্যমত্যের শৌর্য। কিন্তু সেজন্যে তার উপর বিশ্বাস হারালে চলে না। আত্মজ্ঞানের অভাব এই 'উচ্ছল সিন্ধু' (ঐ)-কে 'মিছে' করে দেয় না। জীবনানন্দের চেতনায় ইতিহাস 'শাশ্বত রাত্রি' ('সুচেতনা'/বনলতা সেন) আর 'অনন্ত সূর্যোদয়' (ঐ)-এর সমাহার—

> অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,/আর তার প্রতিবিম্ব যদি হয় মানবহৃদয়,/তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে/জ্বলে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে;" ('মাঘসংক্রান্তির রাতে'/বেলা অবেলা কালবেলা)

হয়তো এই বিশ্বাস তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই পাওয়া। কেননা, "যে-ধর্মের হাওয়াতে দাদা বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, উপনিষদের সে-ধর্মের নির্দেশ হচ্ছে, অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার সাধনা। মানুষের জীবনে পতন আছে, অন্ধকার আছে, কিন্তু তা চিরন্তন নয়, উদ্যম ও সাধনা যোগে পতনকে পশ্চাতে ফেলে ধ্রুব সত্যে, আলোকে পৌঁছতে হবে।"[৬] তাই পারিপার্শ্বিক অন্ধকার থেকে সূর্যালোকিত ভোরের দিকে অগ্রসর হতে পারেন কবি—

> ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল/উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড় চেতনার লোকে;/অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে/বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস/এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়;/এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়। ('উত্তরপ্রবেশ'/সাতটি তারার তিমির)

কালপ্রাজ্ঞ কবি জানেন, কালের চক্রাবর্তে ঘূর্ণ্যমান 'অমাময়ী নিশি'('মাঘসংক্রান্তির রাতে'/বেলা অবেলা কালবেলা) আর জ্যোতির্ময় প্রভাত বারবার ফিরে ফিরে আসে—ভোরের আগের অন্ধকারে 'ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাত' ('সময়ের কাছে'/ঐ) হয়ে আসে যেন 'মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ'

(ঐ) "আঘাত ছাড়া কোথাও অগ্রসর সূর্যালোক নেই।" (ঐ) কবি জানেন, "কল্যাণ কল্যাণ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।" ('অনেক নদীর জল'/ঐ)। তবুও জনতা যখন ভোরের আলো দেখতে না পেয়ে 'চোখে দেখে চারিদিকে অগণন মৃতদের চক্ষের ফসফোরেসেন্স্' ('অনুসূর্যের গান'/সাতটি তারার তিমির)তখন কবিই তাদের আলোর দিশা দেখান—"আলো নেই? নরনারী কলরোল আলোর আবহ/প্রকৃতির? মানুষেরো; অনাদির ইতিহাসসহ।" ('পৃথিবীর রৌদ্রে'/বেলা অবেলা কালবেলা) বিচ্ছিন্নতার, নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে 'অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে' ('আট বছর আগের একদিন'/ঐ) 'আরেকটি প্রভাতের ইশারায়' (ঐ) জনমানবকে উদ্‌বোধিত করার মধ্যে দিয়েই জীবনানন্দের কাব্যপ্রমার পূর্ণবৃত্তটি গঠিত হয়ে উঠেছে—"আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ/যে দোর কঠিন; নেই মনে হয়; সে দ্বার খুলে দিয়ে/যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে।" ('যতিহীন'/বেলা অবেলা কালবেলা)

জ্ঞানের অতিরেকে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বেদনায় স্বেচ্ছাবৃত অনন্বয়ের পরিমণ্ডল ছেড়ে, মাতৃজঠরের মতো স্বপ্নিল, স্থবির, উৎকণ্ঠাহীন ঘুমের আশ্রয়ে লালিত হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে জীবনানন্দ ক্রমে উত্থিত হয়েছেন বহিঃপৃথিবীর রক্তাক্ত জলহাওয়ায়। কবিতার দর্পণে উপস্থাপিত করেছেন সময়ের ছবি, নিজের উদ্বেগের চিত্ররূপ, শিশ্নোদরপরায়ণ সামাজিকবৃন্দের স্বরূপ। কিন্তু নৈরাশ্যের অবক্ষয়িত ভয়াবহ স্থাপত্য তাঁর সুচেতনার স্রোতধারাকে মলিন করতে পারেনি। যেখানে আলো নেই, সেই অন্ধকার রক্তপঙ্কে তিনি ইতিহাসচেতনা থেকে আহরিত নবারুণের স্বপ্ন দেখিয়েছেন—আত্মসমীক্ষণের দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিকৃতির উপরিতলিক নির্রর্থকতায় আবদ্ধ না থেকে অন্তর্গত ঔজ্জ্বল্যে আস্থা রেখেছেন তিনি। এখানেই তাঁর বোধের সাফল্য, তাঁর সমীক্ষণাত্মক চেতনার প্রকৃত উত্তরণ।

উৎসের সন্ধানে

১. ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত : 'সমগ্র প্রবন্ধ', "জীবনানন্দ দাশ : উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য", কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৮

২. অশ্রুকুমার সিকদার : 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়', "জীবনানন্দের চার অধ্যায়", ১ম সংস্করণ, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, মাঘ ১৪১৯, পৃ. ১২৭

৩. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : 'আধুনিক বাংলা কবিতায় বিষণ্ণতাবোধ', ১ম রূপসী বাংলা সংস্করণ, কলকাতা, রূপসী বাংলা, ২০১০, পৃ. ১০২

৪. দীপ্তি ত্রিপাঠী : 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়', ১ম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ ১৫৩

৫. Sumit Sarkar : 'Modern India : 188-1947', 1st pub, Madras, Macmillan Ltd. 1983. p. 147

৬. সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত :'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি', অশোকানন্দ দাশ "বাল্যস্মৃতি", ১ম প্রকাশ, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, ১৯৬০, পৃ. ৭০

তথ্যের সন্ধানে

১. জীবনানন্দ দাশ : 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র', আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬

প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত যাবতীয় কবিতার উদ্ধৃতি উপরোক্ত গ্রন্থটি থেকে গৃহীত।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে পাশ্চাত্য পুরাণের আখ্যান

দিবাকর বর্মন

বাংলা সাহিত্যে তারুণ্যের তেজ ও উল্লাস জেগে ওঠে নিঃশব্দের শিখা জ্বলার মতো, তিনিই আধুনিক কবিতার ধারা পথে সবথেকে বেশি চর্চিত কবি জীবনানন্দ দাশ। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক স্রোতের বিপরীতে কলম চালিয়েছেন যে কজন কবি তাদের মধ্যে জীবনানন্দ অন্যতম। সাহিত্য তথা সমাজে প্রচলিত প্রবাদ, স্রোতের বিপরীতে বেশিক্ষণ চলা যায় না কিন্তু জীবনানন্দ এমন এক আলোক শিখার নাম যিনি বাংলা সাহিত্যের এই মিথ তথা প্রবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন এবং সমকালের গণ্ডী পেরিয়ে হয়ে উঠেছেন অনন্তকালের যাত্রী। ১৯১৫ সালে ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগে পাস ও ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেন। ১৯২১ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে বিএ পাস ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এমএ পাস করেন। ১৯২২ সালে সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান। এখান থেকেই কবিতা লেখার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু অনিশ্চয়তা বোধ আর ঘন ঘন চাকরির বদলে ঢাকা সহ থেকে কলকাতা শহরে তাঁর অবাধ বিচরণ ঘটতে শুরু করে। আনুষঙ্গিক্রমে উঠে আসে তার জীবন সংগ্রাম ও পথ চলার একটি ধারা পথ যেখানে বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য চর্চা ও অধ্যাপনা তাকে বিশ্ব সাহিত্যের কম বেশি সকল বিষয়েই পাণ্ডিত্য প্রদান করেছিল। একদিকে যেমন বাংলার পল্লি প্রকৃতি তার জীবনে নিঃসর্গ চেতনা থেকে চৈতন্যে উচ্চারণ হয়েছে অসংখ্য লোকপুরাণ, আদি পুরাণ তার পাশাপাশি ইতিহাস চেতনা ও মঙ্গালকাব্যের পৌরাণিক আখ্যান তার কাব্যকে উৎকৃষ্টতা প্রদান করেছে। অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> বিষ্ণু দে'র মতো জীবনানন্দের পুরাণপ্রেম কাব্যনামে যদিও বহু প্রচারিত নয়, কিন্তু গভীর অভিনিবেশেই ধরা পড়ে, বিষ্ণু দে'র মতো না হলেও জীবনানন্দ দাশের

কবিতায় পুরাণপ্রসঙ্গের ব্যবহার খুব কম নয়।...জীবনানন্দের পুরাণপ্রসঙ্গগুলি নদীর ঢেউয়ের মতো এমনই গায়ে গায়ে এসে পড়ে। একটা পূর্ণাঙ্গ। প্রতিমা নির্মাণের আগেই তা সরে যায় এবং পরক্ষণেই আর একটি প্রতিমা এসে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের তালিকা বা পুরাণপ্রসঙ্গের উল্লম্ফন প্রয়োগ।[১] এই পুরাণ তথা মিথ চেতনা জীবনানন্দের কাব্যের একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আর তারই একটি শাখা হিসেবে উঠে এসেছে পাশ্চাত্যের পৌরাণিক আখ্যান এবং তার সঙ্গে ঐতিহাসিক আখ্যানও। জীবনানন্দের কাব্যে মিথের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে তেমনভাবেই বিদেশি মিথকে তাঁর কাব্যের মধ্যে সারা ফেলতে দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা কবিতায় যাঁরা রবীন্দ্রশাসিত প্রথাসিদ্ধ কবিতা পরম্পরার ভাব ও রূপ থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এখানে আমরা আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে কেবল পাশ্চাত্য পুরাণ-প্রয়োগের আখ্যান প্রবণতাকেই আলোচনা করবার চেষ্টা করব। জীবনানন্দ ভারতীয় পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহার এর পাশাপাশি বিদেশি-পুরাণ প্রসঙ্গকে জীবনানন্দ কোথাও কোথাও বিশেষ করে 'বনলতা সেন' পর্ব পর্যন্ত কবিতায় নিয়ে এসেছেন অসংখ্য আখ্যান। কোথাও খণ্ড আকারে, আবার কোথাও আভাসের মাধ্যমে। প্রথম কবিতা সংকলন 'ঝরা পালক' (১৯২৭)-এর 'অস্তচাঁদে' কবিতায় কবি দেশীয় রীতিতে কবিতাটির অবতারণা করছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পুরাণের অনুষঙ্গকে তিনি তুলে এনেছেন। যেখানে কবি বলছেন—

> দুশ্চর দেউলে কোনকোনযক্ষ-প্রাসাদের তটে,/দূর উর-ব্যাবিলোন-মিশরের মরুভূ-সংকটে,/কোথা পিরামিডতলে,- ঈসিসের বেদিকার মূলে,/কেউটের মতো নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে।[২] —'অস্তচাঁদে', "ঝরা পালক"

শেষ প্রহরের রাতে অস্তমিত চাঁদকে কবি নিচের প্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অস্তমিত চাঁদের ঢলে যাওয়া ছবি কিংবা পলাতাকা প্রিয়া মেঘের ঘোমটা তুলে বাইরে বেরিয়ে আসা চাঁদের জ্যোৎস্নাকে দেখে কবি কল্পনা করেছেন। কবি নিজের মর্মলোকে উপলব্ধি করেছেন জন্মে জন্মে ফিরে ফিরে এসেছে এই অস্তমিত চাঁদ আর এই প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে প্রাচীন প্রাচীন মিশরীয় দেবী ঈসিসের প্রসঙ্গ। মাতৃত্ব এবং উর্বরতার দেবী ঈসিস প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় দেবী হিসেবে পূজিত হতেন। কার্যত ইনি মিশরীয়দের মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সময়ের সাথে সাথে, সর্বোচ্চ দেবতা রূপে 'মাদার অফ দ্য গডস'-এর পদে উন্নীত হন। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবী মানুষের যত্ন নেওয়ার দিকেও নজর রাখতেন। ঈসিস মিশরীয় প্রথম পাঁচ দেবতাদের (ওসিরিস, আইসিস, সেট, নেফথিস এবং হোরাস দ্য এল্ডার) একজন। ওসাইরিসের বোন তথাপি স্ত্রী। হোরাস দ্য ইয়ঙ্গারের মা এবং প্রতীকীভাবে প্রত্যেক মিশরীয় রাজার মা হিসেবে তাকে উল্লেখ করা হত। এই দেবীর মিশরীয় নাম, এসেট (Eset), যার অর্থ- 'সিংহাসনের দেবী'। কারণ, রাজাদের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক। অবিশ্বাস্য ক্ষমতার কারণে ইনি 'ওয়েরেট-কেকাউ' বা 'দ্য গ্রেট ম্যাজিক' নামেও পরিচিত ছিলেন। জীবনে মানুষের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি তার-সঙ্গেই মৃত্যুর পরে নিরাপদে স্বর্গে যেতেও তাদের সাহায্য করার জন্য উপস্থিত হতেন। ৩৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মিশর বিজয়ের পর, তার উপাসনারীতি গ্রীসে পৌঁছায়। তারপরে রোমে ভ্রমণ করে। রোমান সাম্রাজ্যের সময়, ব্রিটেন থেকে ইউরোপ হয়ে আনাতোলিয়া পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্যের প্রতিটি কোণে এই দেবীর উপাসনা করা হত। 'কাল্ট অফ আইসিস' ছিল খ্রিস্টধর্ম নামক নতুন ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ।

খ্রিস্টীয় ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে, নানান আইকনোগ্রাফি সূত্রে প্রমাণ মেলে ঈসিস কাল্টের নীতি ও বিশ্বাস গুলিকে নতুন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ভার্জিন মেরি তার পুত্র যীশুকে নিজের কোলে ধরে রেখেছেন এমন চিত্র সরাসরি ঈসিস থেকে এসেছে। যেখানে দেখা যায় উনি তার পুত্র হোরাসকে একইভাবে জড়িয়ে ধরে আছেন। যীশুর মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার গল্পও ওসাইরিসের বিখ্যাত গ্লপের রূপভেদ বলাই যায়।[৩] এখানেই এই কবিতার পাশ্চাত্য আখ্যানের অনুষঙ্গটি আমাদেরকে অনুসন্ধিৎস্য করে তোলে। যা পরবর্তী পর্যায়ে এমনভাবেই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জাগাতেই হোক আর কাব্যের গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখতে তিনি এই পুরাণ ভাবনাকে কার্যকরী করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি কবিতার পথ পরিবর্তন করছেন অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি, যেখানে কবি বলছেন—

> স্পেইনের 'সিয়েরা'য় ছিনু আমি দস্যু-অশ্বারোহী —/নির্মম-কৃতান্ত-কাল,-তবু কী যে কাতর-বিরহী!/কোনরাজনন্দিনীর ঠোঁটে আমি এঁকেছিনু বর্বর চুম্বন!/অন্দরে পশিয়াছিনু অবেলার ঝড়ের মতন!"[৪] —'অস্তচাঁদে', "ঝরা পালক"

এই কবিতাতে অপর একটি আখ্যান উঠে এসেছে, যেখানে কবি বলছেন সিয়েরা লিওনের কথা। যেখানে কবি ছিলেন দস্যু অস্বারোহী কিন্তু কোন এক রাজনন্দিনীর ঠোঁটের ছোঁয়ায় তিনি এঁকেছিলেন বর্বর চুম্বন যার ফল স্বরূপ কবির হৃদয়ে কাঁপিয়ে এক ঝড় উঠেছিল। কিন্তু এখানে ক্ষুদ্র আখ্যান এর আভাস থাকলেও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ ছাড়া এই সিয়েরা লিওনের মাতৃভাষাও বাংলা। অতএব কবি এখানেও কোনো এক সময় হয়তো-বা মাতৃভাষার টান অনুভব করেছেন। এই "ঝরা পালক" কাব্যের 'পিরামিড' কবিতায় আমরা কবির পাশ্চাত্য-পুরাণ এর প্রয়োগ দেখতে পাই। পিরামিড কবিতায় কবি বলেছেন—"বেজে ওঠে অনাহত, মেম্ননের স্বর/নবোদিত অরুণের সনে।"[৫] —'পিরামিড', "ঝরা পালক"। মেম্ননন ইথিওপিয়ার রাজা মেম্ননন খুল্লতাত ট্রয়রাজ প্রায়ামের সাহায্যের জন্য ট্রয়ের যুদ্ধে যান ও অ্যাকিলিসের হাতে নিহত হন। তার মা cos-কে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। থীবস দ্বীপে অ্যাসেনোফিসের যে মূর্তি আছে তাকে গ্রিকরা মেম্ননন মনে করে। কথিত আছে, উদিত সূর্যের প্রথম রশ্মিপাতে এই মূর্তি সুরঝংকার তোলে। মনে করা হয়, মা তার সন্তান cos-কে (ভোর বেলা) চুম্বন করছে এবং মেম্ননন সেই চুম্বনকে সংগীতধ্বনিতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। প্রভাত সূর্যের আলোয় মেম্ননন-এর স্বর ধ্বনিত হয়। এই মেথুন ছিলেন প্রাচীন ইথিওপিয়া (হোমারের যুগ)-এর রাজা টিথোনাস ও ইঅস-এর পুত্র। ইঅস (Eos) হলেন ঊষাদেবী। একদা ট্রয়-এর যুদ্ধে অ্যাকিলিস-এর হাতে মৃত্যু হয় মেম্ননের। তার মাতা ইঅস-এর জন্য কাতর প্রার্থনা করেন ও দেবরাজ জিউস থিবিসের এক মন্দিরের বেদিতে চিরকালের জন্য তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই এই প্রভাত সূর্য অর্থাৎ ঊষাকালের আলো মন্দির বেদিতে পড়লেই মেম্মন জীবন্ত সুর ধ্বনিত হয়ে উঠত। মাতৃত্বের স্নেহ স্পর্শ পেয়ে যেন তাঁরই ডাকে সাড়া দেন মেম্ননন। এই 'পিরামিড' কবিতায় জীবন-মৃত্যুর অনিঃশেষ কালপ্রবাহের মধ্যে আছে প্রাণের অমরত্বের আশ্বাস। যে আশ্বাস কবি দিয়েছেন মেম্মনের মিথের আখ্যানের সাহায্যে পিরামিড সেখানে মহাকালের কল্পমূর্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। একদিকে জীবন-প্রেমিক, অন্যদিকে ক্ষণকালীন সভ্যতাগুলির যাওয়া-আসায় অটল নির্মোহ ফুটে উঠেছে। তারই বিপরীতে রয়েছে মানব-স্বভাবের ক্ষুদ্র বাসনাময় পার্থিবতার উপস্থাপনা এই কবিতায়। বারবার জীবন ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে, মিলেছে মৃত্যু ও অমরতার বাণী। এই বিশিষ্ট পুরাণ ও আখ্যানের চিত্রকল্পে মৃত্যুর মাঝে এক

অমরত্ববোধের সংস্থাপন। জীবনানন্দের কাব্যে পাশ্চাত্যের মিথ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কৃষ্ণগোপাল রায় জানিয়েছেন—

> জীবনানন্দও ভারতীয় এবং বাংলার বিভিন্ন পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, লোককথা থেকে। পুরাণ থেকে প্রতীক গ্রহণ ইংরেজি সাহিত্যে নতুন নয় কিন্তু গ্রীসীয় মিথোলজিই সেখানে প্রধান উৎস, ...জীবনানন্দের কাব্যেও ব্যাবিলন, গ্রীস, এথেন্স-এর পাশাপাশি বিদিশা, শ্রাবস্তী, বুদ্ধ, কনফুসিয়স, লেনিন, তৈমুর, হিটলার রয়েছে; কিন্তু কবির অমল স্ফূর্তি নির্বাধ হয়েছে বাংলার লোককথা-লোকশ্রুতি-কিংবদন্তির রাজ্যে এসে।[৬]

জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কবিতা-সংকলনটি ছাড়াও গবেষকদের প্রচেষ্টায় আরও কিছু সনেট জাতীয় অপ্রকাশিত কবিতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। চল্লিশটি কবিতা পাণ্ডুলিপিসহ 'বিভাব' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যায় ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেছেন ভূমেন্দ্র গুহ উক্ত সংখ্যাটি। সহযোগিতা করেছেন অরবিন্দ গুহ এবং অমিতানন্দ দাশ। (কবিতাগুলি ছিল অপ্রকাশিত কিন্তু এগুলির রচনাকাল ১৯৩৪-৩৫ এর পরে নয়। কারণ 'রূপসী-বাংলা'র পাণ্ডুলিপিতে এই সালটির উল্লেখ ছিল।) এই সংকলনের বেশ কিছু কবিতায় কবি গ্রিক পুরাণের টাইটান এর আখ্যান ব্যবহার করেছেন।

এখানে টাইটান হলেন দেবরাজ ক্রোনাসের ঔরসজাত ধরিত্রী মায়ের সন্তান। দেব এবং মানুষের মধ্যে অবস্থানকারী এই টাইটানরা ছিল বিপুল দৈহিক বল ও প্রাণশক্তির অধিকারী। এই সনেটগুলিতে জীবনানন্দ জীবনের প্রবল প্রাণশক্তিকে অনুভব করতে চেয়েছেন যাকে তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন 'মহা বিশ্বলোকের ঈশারা': সৌরলোকের বিশাল বিস্তারে প্রাণ শক্তির বিপুল উচ্ছ্বলতা সেখানে তিনি একই সঙ্গে এই টাইটান এবং সমুদ্রকে প্রতীকরূপে রূপাবয়ব দিয়েছেন তাঁর কবিতার। সমুদ্রকেও যেন তিনি টাইটান-এর চিত্রকল্পের সঙ্গে একীভূত করে দিয়েছেন। আমরা কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি—

> টাইটানের মত তারা; টাইটান মায়ের মত হে তুমি সাগর
> প্রথম সে পৃথিবীর প্রথম সে আকাশের নক্ষত্রের মাঝখানে এসে
> সেইদিন দাঁড়ায়েছ; টাইটান মায়ের মত টাইটান সন্তান ভালোবেসে।[৭]
>
> —"রূপসী-বাংলা" '৩৫ নং কবিতা'

এছাড়াও গ্রিক পৌরাণিক আখ্যান টাইটান আবারও দেখা দিয়েছে 'রূপসী বাংলা'র ৩৭ নম্বর কবিতায়। সেখানেও দেখা যাচ্ছে টাইটানকে বলতে শোনা যায় সমুদ্র তুমি মায়ের মত জেগে আছো। উত্তর আকাশে তুমি বয়ে নিয়ে চলে যাও দক্ষিণের বায়ু আর সিন্ধুর জলের গন্ধে মিশেছে আকাশের নক্ষত্রের ঘ্রাণ। এমনটি কি কখনো কল্পনা করা যায় যে আকাশের নক্ষত্রের ঘ্রাণ আছে। এখানে জীবনানন্দের অনন্যতা। যেখানে কল্পনার সাগরে পাড়ি দিয়ে তিনি সিংহ নদীর জলের গন্ধের সঙ্গে মহাকাশের নক্ষত্রের ঘ্রাণকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন এই কবিতায়। কিন্তু আমাদের আখ্যানের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এই কবিতাতে গ্রিক পুরাণের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। কবি জানিয়েছেন—

> টাইটান মায়ের মতো জেগে তুমি হে সমুদ্র—প্রথম টাইটান/উত্তর আকাশে তুমি ব'হে নিয়ে চ'লে যাও দক্ষিণের বায়ুর আহ্লাদ,/পূর্বের বাতাসে তুমি মিলায়ে দিতেছ গিয়ে পশ্চিমের বাতাসের স্বাদ!/সিন্ধুর জলের গন্ধে মিশায়ে নিতেছ তুমি আকাশের নক্ষত্রের ঘ্রাণ!
>
> —"রূপসী-বাংলা" '৩৭নং কবিতা'

এ ধরনের প্রতীক বাংলা কবিতা খুবই নতুন ধরনের। বাংলা কবিতায় মধ্য প্রাচ্যের পরিমণ্ডল মাঝে মাঝে নিপুণ ভাষা-চিত্রে জমাট করে এঁকেছেন কোনও কোনও কবি। আমাদের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে মনে পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই-নূরজাহান', মোহিতলাল মজুমদারের নূরজাহান ও জাহাঙ্গীরকে নিয়ে রচিত কবিতাগুলি। জীবনানন্দের প্রথম পর্বের কবিতাতেও কিছুটা এই বাতাবরণ গড়ে উঠেছে 'ঝরা পালক'-এর কবিতাগুলিতে। যেখানে মরু প্রান্তর, সরাইখানা, মরীচিকা ইত্যাদির চিত্র; তার পাশাপাশি ঈদ, রোজা, ন্যাসপাতি ইত্যাদি শব্দের ও অনুষঙ্গের প্রয়োগ; বেদুইন, সিন্দবাদ প্রমুখ মধ্যপ্রাচ্যের ব্যক্তিচরিত্র, সেই সঙ্গে মিশর, ব্যাবিলন ও স্পেন-এর অতীত ইতিহাস মূর্ত হয়েছে। এই অনুভবের নিবিড়তর ভাষারূপ আছে 'বনলতা সেন'-এর অন্তর্গত 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায়। কিন্তু পরিবেশ নির্মাণের দিক থেকে সুনিপুণ ও ঘনত্বে সুন্দর হলেও এই কবিতাগুলিতে পুরাণ-প্রসঙ্গের তেমন কোনও রূপচিত্রণ দেখতে পাই না। পুরাণ প্রসঙ্গে জীবনানন্দের আগ্রহ তুলনামূলক অনেক কবির চেয়েই কম ছিল। কিন্তু পুরাণগুলো এমনভাবে তিনি নির্মাণ করেছেন যেখানে আখ্যান আছে কিন্তু সেগুলি সাংকেতিকময় আভাসে আমাদেরকে বুঝে নিতে হয় আবার কখনো কখনো তিনি শুধুমাত্র পুরণের চরিত্রের নাম ব্যবহার করে সমগ্র আখ্যানের ছোঁয়া দিয়ে গেছেন। এর পাশাপাশি তিনি কিছু কিছু আখ্যানের অনুষঙ্গ উল্লেখ করেছেন যেমন জীবনানন্দের 'মিশর' কবিতার কথায় বলা যাক। "ঝরা পালক" কাব্যগ্রন্থের 'মিশর' কবিতায় পাশ্চাত্য গ্রিসের মিথকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কবি বলেছেন—

> মমী'র দেহ বালুর তিমির জাদুর ঘরে লীন—/'স্ফীঙ্ক'—দানবীর অরাল ঠোঁটের আলাপ আজি চুপ!/ঝাঁ ঝাঁ মরুর 'লু' য়ের 'ফুঁ'য়ে হছে বিলীন-ক্ষীণ/মিশর দেশের কাফনপাহাড়-পিরামিডের স্তূপ![৯]—'মিশর', 'ঝরা পালক'

এই কবিতায় প্রাচীন মিশরের মিথ উঠে এসেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, স্ফীঙ্ক-কিংবদন্তির ডানাওয়ালা প্রাণী, যার মাথা নারীর মতো আর দেহটা সিংহের মতো। এই মূর্তি মিশরের থেকে উদ্ভূত। সূর্য যখন সিংহ রাশিস্থ হয় তখন নীলনদের জোগে ওঠার প্রতীক। সম্ভবত স্ফিংকসের পরিকল্পনা মেসোপটেমিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। রাজাকে দৈবী মূর্তিতে দেখানো তার উদ্দেশ্য ছিল। আনুমানিক ২৯০০ খ্রি. পূ. নির্মিত গিজার বিশাল স্ফিংকস মূর্তিটির দেহ সিংহের আর মাথা একজন 'ফ্যারাও'-এর। কথিত আছে, স্ফিংকস এক জল দানব। সে থিবসের লোকদের এক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করত, উত্তর দিতে না পারলে হত্যা করত। অওদিপাস সেই ধাঁধার সঠিক জবাব দেন ও স্ফিংকসের মৃত্যু হয়।[১০] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সফোক্লিসের নাটক 'অদিপোস' এই স্ফীংস এর উল্লেখ আছে। থিবস নগরীতে প্রবেশের দাড়ে এই স্ফীংস মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। মিথ তথা কিংবদন্তিকে পাশ্চাত্যের আঙিনা হতে জীবনানন্দ তুলে এনেছেন এবং আমাদের সাহিত্যের আঙিনায়। জ্যাসন ও ওডিসিয়ুস এর 'পটভূমির', "বেলা অবেলা কালবেলা" কাব্যের এই ঐতিহাসিক তথা পৌরাণিক আখ্যানটি মূল সূত্রটি আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত তাঁর 'মিথপুরাণের ভাঙ্গাগড়া' গ্রন্থে।[১১]

> আজো তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছ, নারি,/হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারি/নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।/চারিদিকে অলীক সাগরজ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়।[১২]—'পটভূমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা')

কবি জীবনানন্দ দাশ এই কবিতায় বনলতা সেনের একটি প্রতিচ্ছবি আঁকতে গিয়েও সেখান

থেকে সরে এসেছেন কেননা এখানেও এসেছে সেই অন্ধকার চুলের ছবি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন রণক্লান্ত নাবিক প্রসঙ্গ কিন্তু এই প্রসঙ্গকে ছাপিয়েও পাশ্চাত্যের এই জ্যাসন ও ওডিসিয়ুস এর নাম প্রসঙ্গ। যার ভিতরে রয়েছে একটি আখ্যান। সেটি হলো, ওডিসিউস ট্রয়ের যুদ্ধে যেসব গ্রিক রাজা নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে ইথাকার রাজা Odysseus সবচেয়ে খামখেয়ালি ছিলেন। অবরুদ্ধ ট্রয়ের পতন ঘটানোর জন্য তিনি কাঠের ঘোড়ার পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন। ট্রয় ধ্বংসের পর তাঁর স্বদেশে ফেরার বিবরণ নিয়ে হোমারের ওডেসি কাব্য রচিত হয়। জাহাজে করে ২০ বছর নানা দেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে অবশেষে তিনি দেশে ফেরেন। এদিকে রাজ্যের লোভে বহু রাজা ওডিসিউসের স্ত্রী রানি পেনেলোপির পাণিপ্রার্থনা করেন, সুকৌশলে পেনেলোপি তাঁদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ওডিসিউস তাঁদের হত্যা করেন ও কিছুদিন রাজ্য ভোগের পর পুত্র টেলমেকাসকে রাজত্ব দিয়ে সমুদ্রাভিযানে বেরিয়ে পড়েন। এই আখ্যানটিতে কখনো বা প্রেয়সী কখনো বা রমণীর বিষাদ ভরা মুখে সবকিছুকে বর্জন করার একটি অভিপ্রায় কবি তুলে ধরেছেন। এখানে হয়তো সম্পূর্ণ আখ্যানটি আমরা পাচ্ছি না কিন্তু আখ্যানের একটা আভাস আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছে যার থেকে আমরা বুঝতে পারছি এই নাম বা চরিত্রের একটি প্রেক্ষাপট আছে বা তাদের একটি আখ্যান আছে সেই আখ্যানটিকে আমাদেরকে আর নতুন করে পড়তে হয় না বা সে কাব্যগ্রন্থটিকে পুনরায় পাঠ না করেই আমরা শুধুমাত্র এই একটি নাম বা চরিত্রের প্রাসঙ্গিকক্রমে অতীত পূরণের কাহিনিটি আমাদের সামনে ভেসে আসছে। এখানেই এই আখ্যানের প্রাসঙ্গিকতা। পরিশেষে অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের কুমারী বৃত্তি ঘটিয়ে আমরা বলতে পারি যে, জীবনানন্দের কাব্যে পুরাণ প্রসঙ্গগুলি একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা নির্মাণের মতোই ঐতিহাসিকতা ও পুরাণ বৃত্তের সার্থক প্রয়োগ।

উৎসের সন্ধানে

১. পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত : 'জীবনানন্দ : বিভিন্ন কোরাস', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৫১
২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ', ভারবি, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৫
৩. https://www.worldhistory.org/trans/bn-885/
৪. উৎস-২, পৃ. ২৫৬
৫. তদেব : পৃ. ২৮১
৬. কৃষ্ণগোপাল রায় : 'জীবনানন্দের কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৯ পৃ. ১৩৮
৭. উপরোক্ত, তদেব, পৃ. ১২৪
৮. তদেব : পৃ. ১২৬
৯. তদেব : পৃ. ২৭৯
১০. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'আধুনিক বাংলা কবিতায় পুরাপ্রতিমা ও লোকপ্রতিমা', প্রতিভাস, বইমেলা ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৩৮
১১. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত : 'মিথ-পুরাণের ভাঙ্গাগড়া', পুস্তক বিপণি, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১২১
১২. উৎস-২, পৃ. ৮৩

ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী কবি জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা

কাজী সাকেরুল হক

সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সংগত কারণে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক অত্যন্ত গর্বিত সংস্কৃতির ভেতর। বাংলা কাব্যজগতে এক নতুন ধারার স্রষ্টা তিনি। এই নতুনত্ব কাব্য জগতে ঝড় তুলেছে, নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছে। তাঁর কবিত্বের প্রকাশ কাব্য জগতের পুরো অবয়ব পালটে দিয়েছে। তাঁর কবিতায় দেশজ বাকরীতির অভিঘাত সৃষ্টি করে অদ্ভুত এক বাতাবরণ আর সেই সঙ্গে এসে মিশে যায় তার সংবেদনশীল মনের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপলব্ধির আশ্চর্য উচ্চারণ, জীবনকে দেখবার অনুভূতিশীল জীবনদৃষ্টি, যার ফলেই তাঁর কবিতাগুলো এতো অপরূপ যার আস্বাদে বাঙালি পাঠকের মন প্রাণ আজও আবিষ্ট হয়ে থাকে। তাঁর জীবদ্দশায় রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দুই দলেরই প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু দুই মহলই শেষ পর্যন্ত এই কবিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আজ আধুনিক বাঙালি পাঠক মাত্রই জানেন, জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতার একটি আবশ্যিক নাম। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক মহাকালও আজ তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রধান কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আসলে যে-কোনো চিন্তাশীল স্রষ্টাই সমকালে যেমন একক তেমনি দুর্বোধ্য। চিন্তার জগতে তাঁরা নাবিক কলম্বাস, তাই তাঁদের চিন্তাসূত্রকে উপলব্ধি করতে বেশ কয়েকটি দশক কেটে যেতে পারে। এই দশকগুলি নিরন্তর সাধনায় তাঁরা নতুন নতুন করে আবিস্কৃত হতে থাকেন। জীবনানন্দের কবিতার বক্তব্য, বিষয়, বাকরীতি, উপমার প্রয়োগ, চিত্রকল্প বা ইমেজ, স্তবক গঠন, পংক্তিসজ্জা থেকে যতিচিহ্নের ব্যবহার, মণ্ডনকলার অভিনব বৈশিষ্ট্য—এতই অভিনব এবং এতই রবীন্দ্রোত্তরীয়, যাকে সাথে সাথে বুঝে ফেলা কারো পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। এই জন্যেই কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু এবং কিছু পরের আর এক আধুনিক

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছাড়া জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে অনেকেই এমন কিছু বলেছেন, যাঁদের বক্তব্যের অনেকটাই অসহিষ্ণু অথবা অগভীর উপলব্ধিজনিত অক্ষম রোষ তথা ব্যর্থ কোলাহল। প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দ দাশই রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব রবীন্দ্র-বিরোধিতায় নয়, রবীন্দ্র-মনীষার আলোকে তাঁর সর্বাঙ্গসার্থক উত্তরসূরী রূপে, নবযুগের ভাষ্যকার এবং বিশ্লেষক রূপে, ঐতিহ্যপ্রসূত চেতনার যুগানুধ্যায়ী এবং প্রগতিশীল উদ্গাতা রূপে, মানবতার নব বাণীকার হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ উদার অসাম্প্রদায়িক কবি রূপে নিজেকে প্রতিনিয়ত নিবিড় সাধনায় সৃজন করে। কবিতা রচনার কাজে নিজেকে এমনভাবে তিনি আত্মনিয়োজিত রেখেছিলেন যে, জীবন ও কবিতা এই দু-ইকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের কথায় সে কথারই অনুরণন শোনা যায়—

> মাত্রাচেতনায় পৌঁছানো চাই জীবনে ও কবিতায়। যতদূর দৃষ্টি যায় জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের এপিঠ ও ওপিঠের অন্তিম বর্ণে নিজেকে—মানবকে ফলিয়ে তুলে- তবুও একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়- যা কঠিনতম আনন্দ একজনের কাছে, সফলতম বেদনা অন্যের নিকটে।[১]

মানবকে ফলিয়ে তোলাই জীবনানন্দের কবিতার প্রধানতম সমীকরণ। এই কাজে মানুষকে, মানুষের ব্যক্তিগত সফলতা-অসফলতা সমগ্র মানবের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রূপ দিতে চেয়েছেন, ফলে আলো-অন্ধকার, দিন ও রাত্রি, ভালো-মন্দ, শুভাশুভ, পুরাণ-ইতিহাস, নীলিমা ও পাতাল, রণরক্ত-সফলতা এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নিজের ভাবনা ও ভাষাকে বিন্যস্ত করেছেন কবি।'[২]

জীবনানন্দ দাশের জন্ম ও জীবনকাল ছিল সারা বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়। তাঁর জীবদ্দশায় দুই-দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। রাশিয়ায় মার্কস নির্দেশিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব-রাজনৈতিক ভূগোলের ব্যাপক পরিবর্তন, যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক ঘটনাসমূহের আবিষ্কার। তদুপরি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাবহুল মহারণের দিনসমূহ। বিশেষ করে বিশ শতকের শুরু থেকেই প্রায় সারা বিশ্বে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার চরম বিকাশ ঘটেছিল। ইউরোপে নাৎসি, ফ্যাসি ও বলশেভিক আন্দোলন, এশিয়ায় চীনের বিপ্লব ও জাপানের জাতীয়তাবাদী চেতনা; লাতিন আমেরিকা থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত জাতীয় চেতনার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠছিল। আর এসব জাতীয়তা উপ্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিক চেতনা বিকাশের ফলে। তখন ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী বাংলা ভাষার একজন প্রতাপ ও প্রভাবশালী কবি কী করে কেবল ইতিহাসের মহাকালের চেতনালোক নিয়ে কাব্যরচনায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেন—আমরা তাঁর আলোচনায় অগ্রসর হয়ে কোথায় যেন একটু ভুল করে ফেলেছি। তা না হলে জীবনানন্দ দাশকে কেন শুধু আমরা 'রূপসী বাংলা'র কবি বলি, কেন তাঁকে 'প্রকৃতির কবি' বলি, কেন 'বনলতার কবি' বলি, কেনই বা শুধু 'চিত্ররূপময়' কবিতার কবি বলি? এরকম আরও অনেক ভালো-মন্দ অভিধায় তাঁকে চিহ্নিত করি। কিন্তু প্রশ্ন হল, জীবনানন্দ কি নিজে সেই পরিচয়ে তুষ্ট থাকতে পেরেছিলেন? আমরা এর উত্তরে বলব না। তার কারণ, কবি সমাজ-বাসিন্দা এবং সজীব প্রাণসত্তা ও প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ চিত্ত হিসাবে দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি—সব কিছুকে তাঁর কাব্যের বিষয়ীভূত এবং অন্তর্গত করে নিতে পারেন, তবে শর্ত হল, সব কিছুকেই আসতে হবে? সৌন্দর্যের রূপে, কল্পনাকে তৃপ্তি দিয়ে। জীবনানন্দ দাশ এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু বাংলার রূপ-প্রকৃতি, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালিই নয়, নগর জীবন ও সমসাময়িক সমাজ, সময় প্রভৃতি উঠে এসেছে তাঁর কবিতায় সমান গুরুত্বে। চল্লিশের দশকের নগরজীবনের রক্তাক্ত পটভূমিকা, সাম্প্রদায়িক

ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, দেশভাগ ও মারী-মন্বন্তর তাঁকে যে কতটা নিদারুণ মর্মাহত করেছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বহু কবিতায় ও অন্যান্য লেখায়। সেই সঙ্গে ধরা পড়ে শূন্যগর্ভ সময়ের প্রতি কবির ঘৃণার তীব্রতা ও স্বাতন্ত্র্য। একই সঙ্গে তাঁর গভীর দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় গ্লানি, ব্যর্থতা, প্রতারণা—সমস্তই গভীর দাগ ফেলেছিল। একেবারে অবোধ শিশুর মতো হৃদয় থাকা সত্ত্বেও তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে মানবতার কঠিন অধঃপতনকে। তবুও নিজে মানুষের শক্তি ও সাধনার ওপর অবিচল থাকতে চেয়েছেন। তাই তো তিনি উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী কবি—এই কথাই আমরা তাঁর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ স্লোগান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চাই। এক অবক্ষয়ী যুগের বিপন্নতা ও বিচ্ছিন্নতাকে অঙ্গীকার করেই বাংলা কবিতায় প্রতিষ্ঠা ঘটে জীবনানন্দের। সূচনালগ্নে যে-কবি ছিলেন বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত, হতাশাদীর্ণ, আশারিক্ত, ভালোবাসা-শূন্য এবং মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন—সে কবিই পরিণতিতে হয়ে উঠলেন জীবনের জয়গানে মুখর, মানুষকে দেখতে পেলেন ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে। তাঁকে আশা-আনন্দ-সাহস ও ভরসা দিলেন বাংলার নারীগণ—হয়ে উঠলেন তিনি অনিমেষ আলোর কবি। তিরিশি শূন্যতার বিপ্রতীপে এবার জীবনানন্দ বাংলার অবারিত প্রকৃতি, সময়জ্ঞান ও ইতিহাসচেতনা এবং সুরঞ্জনা-শঙ্খমালাদের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন এবং পাঠকদের পৌঁছে দিলেন আলো-পৃথিবীর শাশ্বত কক্ষপথে 'নিরাশা করোজ্জ্বল কবি' পরিণতিতে হয়ে উঠলেন—"তিমির বিনাশী কবি।" কিন্তু এটা হলো কীভাবে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা দাঁড়াতে পারে এভাবে-নিঃসঙ্গতাবোধ যেমন মানবজীবনের নিত্য সহচর, তেমনি নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আকুতিও তার মাঝে সদা-ক্রিয়াশীল। নিঃসঙ্গতাগ্রাসিত মানুষ কখনও কখনও জাগ্রত হয় মানবিক সম্ভাবনা ও সামাজিক দায়িত্বচেতনায়। দার্শনিক-মনস্তত্ত্ববিদরা মানুষের নিঃসঙ্গতামুক্তির বহুবিধ পথের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের নিঃসঙ্গতার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির পথ-সন্ধানের প্রচেষ্টা। মানুষ যখন জাগ্রত হবে সদর্থক চেনতায়, সংঘশক্তিতে যখন ঋদ্ধ করবে নিজেকে, জেগে উঠবে যখন পারিবারিক-সামামিজক-সাংস্কৃতিক দায়িত্বচেতনায়, দাঁড়াবে যখন বৃহৎ দেশ আর বৃহত্তর বিশ্বের মাঝে তখনই ব্যক্তিমানুষ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে সামূহিক নৈঃসঙ্গ্যসংক্রাম। বিশ্বাত্মচেতনাই মানুষকে জন্ম দিতে পারে নতুন মানুষ হিসেবে। বিশ্বাত্মবোধ সৃষ্টি করতে পারে বিশ্বমানবচেতনা—তখন সে এক জীবনেই—'হাজার বছর ধরে' পথ হাঁটতে পারে, বিচ্ছিন্নতার সর্বগ্রাসী সংক্রাম থেকে এই মানবচেতনাই রক্ষা করতে পারে মানবজাতিকে। একক মানুষ যখন অন্বিত হবে মহাবিশ্বের ছোট-বড় সবকিছুর সঙ্গে, অন্বিত হবে আর সব মানুষের সঙ্গে—তখনই শূন্য তার পূর্ণ হবে, ঘুচে যাবে একাকিত্বের মনোজাগতিক বিচ্ছিন্নতা—এবার সে আর করবে না এই প্রশ্ন—'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!' কিংবা লিখবে না এমন চরণ—'তবু কেন এমন একাকী/তবু আমি এমন একাকী!' ('বোধ'/"ধূসর পাণ্ডুলিপি"), বরং একলা-আমির বন্ধন ছিঁড়ে সে গিয়ে দাঁড়াবে বহু-আমির প্রাঙ্গণে, হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দায়িত্ববান মানুষ। জীবনানন্দ দাশ প্রধানত তিনটি উৎসবে অঙ্গীকার করে মনোজাগতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে উপনীত হয়েছেন সদর্থক জীবনচেতনায় আলোকিত মহাপৃথিবীতে। আমরা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব, যে কবির প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থের নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'ঝরা পালক', পরিণত সে-কবির উত্তরকালীন কাব্য নাম 'মহাপৃথিবী', 'বনলতা সেন' কিংবা 'তিমির হননের গান', 'আলোপৃথিবী'। বাংলার অবারিত প্রকৃতি, সদর্থক ইতিহাসজ্ঞান এবং শাশ্বত প্রেমভাবনা জীবনানন্দকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে, করেছে কালিক হতাশা-অর্ণব পাড়ি

দিয়ে আলোকিত মানবতার ভুবনে উত্তীর্ণ হতে। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, আপদমস্তক নিজস্বতা চিহ্নিত কবিটির নাম জীবনানন্দ দাশ। কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুও একথা স্বীকার করে বলেছেন—

> আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছর যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হতেই পারে না।[৩]

জীবনানন্দের চিন্তাধারায় ছাপ ফেলেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অধিকাংশ ঘটনাবলি। ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব এবং শ্রমিক শ্রেণির বিজয় ও রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন সারা বিশ্বে যে তরঙ্গ এনে দেয় তা গভীরভাবে উপলব্ধি হলো পরাধীন ভারতবর্ষে। মুক্তিকামী মানুষদের একাংশ মেনেছিল সমাজতন্ত্রের পথ। অনেকেই জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ভারতের পরাধীনতা ঘোচাতে মগ্ন হলেন অহিংসতার পথ ধরে। আবার অনেকে বেছে নিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। তাই সব ভিন্নমুখী চিন্তাধারাতে উদ্বুদ্ধ হলেন অনেক কবি, লেখক। জীবনানন্দ জাতীয় জীবন ও সামাজিক সমস্যাবলি থেকে মানসিকভাবে দূরে না থাকলেও তার কবিতাতে এইসব চিন্তাধারার প্রভাব ফেলতে দেননি—এটা বিশেষ করে সত্য তার কবিতাতে, ত্রিশ দশকের শেষ পর্যন্ত। কবিতা যেন বিশেষ কোন রাজনৈতিক বক্তব্যের রুশগানে পর্যবসিত না হয়, এটা ছিল তার আশঙ্কা। তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' ও মহাপৃথিবীতে রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রণোদিত কবিতা বিরল। তবে ব্রাহ্ম মতবাদে বিশ্বাসী এই কবিকে সাম্প্রদায়িকতার কলুষতা স্পর্শ করতে পারেনি।

এদেশে হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করে আসছে। কিন্তু তাদের পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা কখনোই আসেনি। জীবনানন্দের জীবদ্দশায় দু'বার বড়ো ধরনের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল ১৯২৬ সালে এবং ১৯৪৬ সালে। জীবনানন্দ দু'বারই কবি হিসেবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এপ্রিল মাসেই দু'বার প্রচণ্ড দাঙ্গা হয়েছিল। আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিষয়ক উত্তেজনা চলে আসছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) প্রতিষ্ঠিত 'স্বরাজ' দলটি বিশ্বাসী ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও সম্প্রীতিতে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতায়। কিন্তু কৃষ্ণনগর কনফারেন্স সফল হয়নি এবং ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশবন্ধুর মৃত্যুতে অনেককিছুর অবসান হয়েছিল। জীবনানন্দ দাশ দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কবিতা লিখেছিলেন (বঙ্গাবাণী', শ্রাবণ ১৩৩২)। কবি কাজী নজরুল ইসলামও 'চিত্তনামা' নামে একটি সম্পূর্ণ কবিতাগ্রন্থই প্রকাশ করেছিলেন। 'ইন্দ্র-পতন' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

> হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,/যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব।/নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু/হিন্দু-মুসলমানের পরানে তুমিই বাঁধিলে সেতু।[৪]

পরের বছর ১৯২৬ সালে, যখন কলকাতায় প্রচণ্ড হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগল, তা ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা, পাবনা প্রভৃতি জেলায়ও। জের ছিল বেশ কিছুদিন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ তিনজন কবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ-এই দাঙ্গায় বিচলিত হয়েছিলেন এবং কবিতা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ধর্ম-মোহ' নামে কবিতা এবং 'ধর্ম ও জড়তা'

নামে প্রবন্ধ। নজরুল লিখেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'যা শত্রু পরে পরে' প্রভৃতি কবিতা এবং 'মন্দির-মসজিদ', 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধ। জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'হিন্দু-মুসলমান' নামে কবিতা। স্মরণীয় 'বঙ্গাবাণী' পত্রিকার যে সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) নজরুলের কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, ঐ সংখ্যাতেই 'জীবনানন্দ দাশগুপ্ত' স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতা। উপমহাদেশকে তিনি এই কবিতায় দেখতে চেয়েছেন হিন্দু-মুসলমান 'মহামৈত্রীর বরদতীর্থভূমি' হিসেবে। তিনি অবলোকন করেছেন, কেমন করে পূজার ঘণ্টা ধ্বনি আর নামাজের সুর এক আকাশে মেশে। মুয়াজ্জিনের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনি কেমনে উপমহাদেশের গগনে গগনে বাজে। 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থের 'হিন্দু মুসলমান' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

> মহামৈত্রীর বরদ তীর্থে পুণ্য ভারত পুরে/পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নামাজের সুরে-সুরে!/আহ্নিক হেথা শুরু হ'য়ে যায় আজান-বেলার মাঝে,/মুয়াজ্জেনের উদাস ধ্বনিটি গগনে-গগনে বাজে;/জপে ঈদগাতে তসবি ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,/সন্ধ্যা-ঊষার বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে;/সন্ন্যাসী আর পীর।/মিলে গেছে হেথা,মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির![৫]

দ্বিতীয় স্তবকেও মিলনের সুর ঝংকৃত হয়েছে বিশেষভাবে—"কে বলে হিন্দু বসিয়া রয়েছে একাকী ভারত জাঁকি/-মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন—রাখি;/আরব মিশর তাতার তুর্কী হারানের চেয়ে মোরা/ওগো ভারতের মোসলেম দল, তোমাদের বুক-জোড়া!/ইন্দ্র প্রস্থ ভেঙেছি আমরা, আর্যাবর্ত ভাঙি/গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি!/নবীন প্রাণের সাড়া/আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্ত বেণীর ধারা।"[৬] এখানে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অগ্র-সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কবি জীবনানন্দ। আপন আপন ধর্মপালনের কোনো বাধা নেই, কেউ তার নিজস্ব ধর্মপালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। ধর্মনিরপেক্ষতার এত বড়ো তীর্থক্ষেত্র পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ভারতবর্ষেই হিন্দুরা মুসলমানের হাতে মিলনরাখী বেঁধে দিয়েছে। তাই আজ আরব মিশর ইরানের চেয়ে ভারতবর্ষই তাদের বুক জুড়ে রয়েছে। এখানে আমরা একে অপরের সঙ্গে সংস্কৃতি বিনিময় করেছি (যেটা পূর্বেই বলা হয়েছে)। তাই কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন— "মোসলেম বিনা ভারত বিফল-বিফল হিন্দু বিনা।" ঐতিহ্যময় মুসলমানের কীর্তিকলাপ আজ ভারতের বুকে ভারতবাসীর সম্পদ হয়ে বিরাজমান। একদা যে মুসলমান সসৈন্যে শত্রুর মত ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল—রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতায় উল্লেখিত ভারতভূমির বর্ণনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কবি জীবনানন্দ লিখেছেন—

> এসেছিল যারা ঊষর ধূসর মরুগিরিপথ বেয়ে,/একদা যাদের শিবিরে-সৈন্যে ভারত গেছিলো ছেয়ে,/আজিকে তাহারা পড়শি মোদের, মোদের বহিন ভাই;/আমাদের বুকে বক্ষ তাদের, আমাদের কোলে ঠাঁই।/'কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে, ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,/মোসলেমবিনা ভারত বিফল, বিফল হিন্দু বিনা;/মহামৈত্রীর গান/বাজিছে আকাশে নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান![৭]

আসলে কবির বক্তব্য হল, মহামনীষীদের মিলনমন্ত্র আমাদের আজও জপ করতে হবে, আমাদের বুঝতে হবে—ভারতবর্ষের উন্নতির দুটি পা, এর কোনো একটি বিকল বা পঙ্গু হলে ভারতবর্ষ গতিহীন হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষের অগ্রগতি চিরকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে পড়বে। সমকালীন যুদ্ধের বাস্তবানুগ বৈশিষ্ট্যময় চিত্রায়নে তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত আণবিক বোমা, অ্যারোস্পেন, ব্রেনকামান, ডিনামাইট, সৈনিক ইত্যাদি শব্দ অতি আয়াসে কবিতার চরণে যুক্ত হয়ে ইঙ্গিতের দিব্যতা দিয়েছে। তৎকালীন সমাজে এইসব যন্ত্রদানবের উপস্থিতিতে যে নিশ্চিত ও

নিরুপদ্রব জীবনধারণ সম্ভব ছিল না, মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যে ভয়ে বিভীষিকায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় কবির এ সকল কবিতায়। প্রয়োগ দক্ষতায় এবং অনুভূতির ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতা যুদ্ধের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও ধিক্কার জাগিয়ে তোলে মানুষের অন্তরে, জীবনের অন্ধকার সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলে। এই প্রসঙ্গে নিচে কিছু কবিতার কয়েকটি করে লাইন উদ্ধৃত করে দেখানো হল—

১. একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে বসে।/পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে/নষ্ট হয়ে খসে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে।[৮]

২. কামানের ক্ষেতে চূর্ণ হয়ে/আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হয়ে আছে দিকে দিকে।/পাহাড়ের নিচে তাহাদের কারও কারও মণিবন্ধে ঘড়ি/সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে ধীরে ঘুরাতেছে।[৯]

৩. তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে/রয়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন অনন্ত কনভয়—/মানবিকদের ক্লান্ত সাঁকো;/এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে/আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।[১০]

যুদ্ধের উপকরণের উল্লেখ এরকম বহু কবিতায় পাওয়া যায়। বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে যে ধ্বংস, মানবিকতার অবমূল্যায়ন, অস্থির চিত্ততা মানুষের অন্তঃকরণকে গ্রাস করেছিল তারই সার্থক রূপায়ণ দেখি বেশ কয়েকটি কবিতায়। যুদ্ধের পরিণতিতে মানুষের জীবনের শুভবোধ এবং প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা হিংসায় ধূলোয় মিশে গিয়েছে, আশাহীনতায়, লক্ষহীনতায় মানুষ পর্যুদস্ত। মানুষের বেঁচে থাকার আগ্রহ মানুষেরই নীতিহীনতায় সমূলে উৎপাটিত। তাছাড়া ওই সময়ের যন্ত্রণাদগ্ধ বিপর্যয়ের ছবি, হতশ্রী বীভৎস জীবনের ছবি, অর্থনৈতিক শোষণের শোচনীয় দুঃসহ অবস্থার ছবি ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে জীবনানন্দের কবিতায়। অনুভূতিপ্রবণ সচেতন কবি নিজের দায়িত্ব পালনের আকুতিতে যুগচিত্রকে রূপায়িত করলেন। তাঁর এইসব কবিতা গভীরভাবে আমাদের অন্তঃকরণ আলোড়িত করে। দাঙ্গাবিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত কলকাতার বাস্তব চিত্র কবি তুলে ধরেছেন গভীর মর্মস্পর্শিতায় সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা—

> মনে ক'রে নিয়ে ঢের পাপ করে, পাপকথা উচ্চারণ করে,/তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা/হারাইনি; তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।/নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে;/একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে/তবুও আতঙ্কে হিম-হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।[১১]

অথবা—

> আমরা মানুষ ঢের ক্রুরতর অন্ধকূপ থেকে/অধিক আয়ত চোখে তবু ওই অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি;/শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয়ে অনুভব করে গেছি/প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই/চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।/ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি,/ব্রেন কামানের শব্দ হয়,/লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী/অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়/উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চলে যায়,/ওরা যদি কালো বাজারের মোহে মাতে,/নারী মূল্যে অন্ন বিক্রি করে,/মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা।[১২]

বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতিতে অনুভূতিপ্রবণ সত্যসন্ধানী কবি কখনো নিজেকে অসহায় মনে করেছেন, সার্বিক দুর্বিপাকে আক্রান্ত হয়ে সীমাহীন হতাশায় ভুগেছেন। মনে করেছেন এর থেকে কখনও বুঝি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে সবই কবির তাৎক্ষণিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। কবির এই প্রকার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কোনো কোনো কবিতায়—

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ—/পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো/ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,/দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত/ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;/পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।[১৩]

যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে যে হতাশা জর্জর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে তিনি জীবন থেকেই সরে যেতে চেয়েছেন কখনো কখনো। মানুষের জীবনের ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে কবি বলেন—

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো, পড়ি নাকো দুর্দশার গান, যে-কবির প্রাণউৎসাহে উঠেছে শুধু ভরে,-সেই কবি-সেও যাবে সরে; যে-কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদযে বুঝেছে—প্রলাপের ঘোরে।
যে বকেছে—সে-ও যাবে সরে।[১৪]

তবে ঐ সকল কথা কবির অন্তরের কথা নয়। তিনি সমকালীন নষ্ট জীবন ও সভ্যতার চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে তার বীভৎস রূপকে চিনিয়ে দিয়ে আমাদের সচেতন করে তুলেছিলেন। জীবনানন্দ মনে করেন—'জীবনের স্বর্গ' ও আনন্দের স্বরূপকে চিনিয়ে দেওয়া কবির অন্যতম দায়িত্ব। তিনি মনে করেন, বীভৎসতার স্বরূপকে না চিনলে তার থেকে উত্তরণও সম্ভব নয়।। বিরাজমান সামাজিক বৈষম্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি 'যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই/হাসপাতালের বেড় হয়তো তাদের তরে নয়।' তিনি আরও লিখেছেন—'আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটবড় সফলতা সব/মুষ্টিমেয় মানুষের যার যার নিজের জিনিস,/কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতারিত হবার তা নয়।'

দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার ঠিক আগে আগেই ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের এক ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। জীবনানন্দ দাশ এই সময় বরিশাল বি.এম. কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। তিনি কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। দেশবিভাগের বিশাল বিলোড়নও স্বাভাবিকভাবে চোখে পড়ে তাঁর। ততোদিনে তিনি অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছেন। এদিকে ১৯২৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় যাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন এবং কবিতা লিখেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের সেই শ্রেষ্ঠ দু'জন কবির একজন রবীন্দ্রনাথ, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৪১ সালে, আর একজন নজরুল নিস্তব্ধতা বরণ করেছেন ১৯৪৩-এর দিকে। সঙ্গতভাবেই ১৯৪৬-এর দাঙ্গার প্রতিবাদ এল পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের কণ্ঠে, '১৯৪৬-৪৭' নামে এক অসাধারণ দীর্ঘ কবিতায়। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পূর্বাশা' পত্রিকার কার্তিক, ১৩৫৫ সংখ্যায়, পরে জীবনানন্দ দাশের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-য় (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কবিতা যখন লিখেছেন জীবনানন্দ, তখন ততোদিনে তিনি বেরিয়ে এসেছেন মোহিতলাল-নজরুলের বৃত্ত থেকে, ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তের স্থান দখল করেছে মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারও আগের মতো নেই আর। 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতায় ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের অবদানের উল্লেখ ছিল, এখন তার জায়গা নিয়েছে সমকাল। তিনি ছিলেন দেশ-বিভাজনের বেদনাহত মুহূর্তের মূর্ত প্রতীক। একদিকে যেমন পূর্ব-বাংলার মাটি ও মানুষ থেকে সংযোগহীনতা তাঁকে বেদনাহত করেছে, অপরদিকে দেশবিভাগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তার কোনো রোমান্টিক অজ্ঞতাও ছিল না। জীবনানন্দ অবশ্যই পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবনের যে ছবি তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন তা পৃথিবীর যে-কোনো ভাষায় প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী—'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়,/হয়ত মানুষ নয়

শঙ্খচিল শালিকের বেশে।' তেমনই তিনি ব্যথিত হয়েছেন বারবার এই বিভাজনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আর্থ-সামাজিক ফল-পরিণতির কথা ভেবে। 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যগ্রন্থের '১৯৪৬-৪৭' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখলেন—

> বাংলার লক্ষ্য গ্রাম নিরাশার আলোকহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।/সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার।/খোঁপা বেঁধে নিতে আসে---কিন্তু কার হাতে/আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে---কিন্তু কার তরে/হাত নেই- কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন/আলপনার, পটের ছবির মত সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী/হতে পেরেছিলো প্রায়; নিভে গেছে সব।[১৫]

দীপ নিভে যাওয়া রাত্রির অন্ধকার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতই সমগ্র অবিভাজিত বাংলাকে আবৃত করেছিল বলেই আমাদের মনে হয়। দাঙ্গা ও দেশবিভাজনকে কবি এক বৃহত্তর মানবিক ব্যর্থতার অংশ হিসেবেই মনে করেছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর এই তুলনারহিত পংক্তি গুলিতে---"সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়---দ্বেষ।/সৃষ্টির মনের কথা; আমাদের আন্তরিকতাতে।/আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা/খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল/ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে/দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল/হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়;/মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর/ভরে গেছে।"[১৬]

কবি দেখলেন, এক শ্রেণির অতিলোভী মূঢ় মানুষের কলুষস্পর্শে নিসর্গলোক ও মানবজীবন কলঙ্কিত। '১৯৪৬-৪৭' কবিতার প্রথম পর্বে উর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগিতার যুগে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সমস্ত পার্থিব সম্পদ, ভোগ, সুখ বন্দি। দ্বিতীয় পর্বে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষর মহামারি এবং তৃতীয় পর্বে সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ের চিত্র। কবি এই তিন পর্বের মধ্যে একটা কালগত সমন্বয় ও প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কলকাতায় ঘটে যাওয়া রক্তঝরা দাঙ্গায় বলি হয়েছে অগণিত সাধারণ মানুষ। তিনি উপলব্ধি করলেন, যাঁরা এই দাঙ্গার প্ররোচক, তারা দিব্যি রাজ-রাজত্বের সিংহাসনে উপবিষ্ট। কিন্তু বিপ্রতীপে যারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, তারা অগণিত নিরন্ন মানুষকী হিন্দু, কি মুসলমান, 'জীবনের ইতর শ্রেণীর/মানুষ তো এরা সব; ছেড়া জুতো পায়ে/বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনা কাটা করে।' এতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলিম-এই দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি সহ অবস্থান করেছে। কখনো মনে করেনি একজনকে উৎখাত করলে বা নিধন করলে অন্যজনের চরমলাভ বা পরমপ্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু অন্ধ মুনাফালোভী অত্যাচারিতের দল মানুষের পশুশক্তিকে উসকে দিয়ে মুনাফা লুটতে চাইল আর বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ সেই প্ররোচনায় পা দিল। তারা বিবেক আর শুভবোধ সব বিসর্জন দিয়ে জঙ্গালের রাজত্ব তৈরি করলো। কবি কল্পনায় চোখে দেখতে পান হিন্দু ও মুসলিম দুই অগ্রজ ও কনিষ্ঠ সহোদর রক্তের নদীর মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করে জানিয়ে যায়, মৃত্যুতেও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব নয়। তবুও কবি যেন দেখতে পাচ্ছেন, 'তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে/মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী/সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে/তবুও কোথাও কোনো আলো নেই বলে ঘুমাতেছে।' লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে' শব্দবন্ধগুলির সমালোচনা গভীর আত্মবিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই 'অপরিসর বুক' শব্দটির মাধ্যমে কবি যে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা কবির পরবর্তী পংক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করা সহজতর হবে বলেই মনে হয়—

> যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে/বলে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,/হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—আর তুমি' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে/চোখ তুলে শুধাবে সে রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে/বলে যাবে, গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;

/মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির-'/কোথাকার কে বা জানে;/ সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে/এইসব প্রাণকণা জেগেছিল-বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে/সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল কোনো উজ্জ্বল চোখের/মনীষী লোকের কাছে এইসব অণুর মতন/উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।[১৭]

জীবনানন্দকে যাঁরা জীবনবিযুক্ত বলে মনে করেন তাঁদের ওই বক্তব্যের নিরিখে বলা যায় যে, একদিকে তিনি যেমন এই কবিতার মাধ্যমে তথাকথিত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রকৃত চেহারাকে প্রকাশ করেছেন, অপরদিকে তিনি বিশ্বব্যাপী হিংসার উৎস আবিষ্কার করেছেন এই পৃথিবী সৃষ্টির আদিম অবস্থানে। তাঁর চিন্তা, চেতনা ও উপলব্ধির দায়ভার সত্য কথায় বলতে গেলে গ্রহণ করতে আজও আমরা সফল হয়েছি বলে মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল মানিকতলা, মির্জাপুর স্ট্রিট, চিৎপুর, এন্টালি, রাজাবাজার, ধর্মতলা প্রভৃতি স্থানে। হিন্দু-মুসলমানের ঐহিত্যগত সম্প্রীতির সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে দেখা দিল পারস্পরিক হিংসা ও অবিশ্বাস। জীবনানন্দের কবিতায় সে সময়ের কবিমনের ক্লিষ্ট বেদনার কথা বিধৃত আছে—

সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে/রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে/সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে/কথা বলে; কাকে বলে ইয়াসিন মকবুল শশী/সহসা নিকটে এসে কোনো কিছু বলবার আগে/আধ-খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের/কথা বলে গিয়েছিল; তবু-/অনন্ত তো খণ্ড নয়; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা/অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে/কেউ নেই, কিছু নেইসূর্য নিভে গেছে।

আমরা সবাই জানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা, এক ভাই আর এক ভাইয়ের বুকে কোনো এক অসত্য আক্রোশে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়। একজন আর একজনকে সন্দেহের চোখে দেখে—'সকলেই আড়চোখে সকলকে দ্যাখে।' মানুষের মধ্যে আদিমতম প্রবৃত্তি-হিংসা, দ্বেষ আছে বলেই মানুষ চরম শান্তির স্বর্গদ্বারে পৌঁছাতে অক্ষম। পৃথিবীকে রক্ত-নদীতে স্নান করিয়ে সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরের শান্তি লাভ করে। আজ মানুষের অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লাভ ক্ষতির হিসাব করার সময়ইয়াসিন, মকবুল, শশী এরা কেন তাদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল কী চেয়েছিল তারা—এই আত্মঘাতী দাঙ্গায় কার কী লাভ হয়েছিল ১৯৪৬-৪৭ সালের মর্মান্তিক দাঙ্গা তাই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কবিকে আঘাত করেছিল গভীরভাবে—

মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর/ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার/ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু/হৃদয়ে কঠিন হয়ে বন্ধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর/কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে/বধ করে ঘুমাতেছি।[১৮]

আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা সর্বমহলের ঐকান্তিক প্রয়াসের বিষয়। অল্প কিছু সংখ্যক মনীষীর এ মহান প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বর্তমানে উপমহাদেশ তিনটে দেশে বিভক্ত হয়ে গেলেও এর প্রতি দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে যা জীবনানন্দ বহু আগে উপলব্ধি করেছিলেন। বৈশ্বিক আবহে সমাজ ও সময়ের পথধারায় মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সাম্প্রদায়িক ভাবনা স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের এক নিঘূঢ় বিষয় পরিধি। পল-অনুপলের পথ বেয়ে সমাজ থেকে জীবনে কিংবা জীবন থেকে সমাজে যার অবাধ গতিবিধি। বর্তমান সময় মুহূর্তেই আবর্তিত, 'উলটা সমঝলি রামে'র জমানা। লহমায় দ্বন্দ্ব ভেতরে বাইরে। রণলিপ্সা কথায় কিংবা ব্যথায়। ক্ষয়িষ্ণু সময়-সমাজ-সত্তার হাত ধরে ধর্মের-বর্মে আঁটা মানব-মন অন্যকে চপেটাঘাতে ব্যস্ত। জ্যাঠামশাইয়ের কথায়, 'যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর

চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যাবসা...' (চতুরঙ্গ) এই যেন মানুষের স্বভাব থেকে সদ্ভাবে ঠাঁই নিয়েছে। ধর্ম-গোঁড়ামির সুদৃঢ় বন্ধনের নাগপাশ থেকে ছিন্ন হবার আহ্বান নেই আজ। কিংবা নেই 'স্ত্রীরপত্রে'র মৃণালের মতো গলি থেকে বেরিয়ে পড়ে মানুষকে জানান দেওয়া প্রত্যেককেই হাতছানি দেয়, সমুদ্র মহাসমুদ্র। নামান্তরে 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দে'র অভিপ্সা। লুপ্তপ্রায় সন্ধানী-জীবন-পথিকেরা, যারা আছে তারাও মাতামাতি করে ধর্মের রাজনীতিতে, রাজনীতির ধর্মে। উৎসের খবরে তারাও বেখবর। কথাশেষে একথায় ঘোষিত হোক, বাঁচার মানে বেঁচে থাক অসাম্প্রদায়িক মননে, মানবিক মূল্যবোধের চেতনে।

উৎসের সন্ধানে

১. জীবনানন্দ দাশ : 'কবিতার কথা' গ্রন্থ, 'মাত্রাচেতনা' প্রবন্ধ, প্রকাশক নন্দিনী গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, কোলকাতা, দশম সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৩, পৃ. ৩০।
২. সুস্নাত জানা : 'জীবনানন্দ : আলো-বলয়ের দিকে', ডাভ পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, ২য় সংস্করণ-২০১১, পৃ. ১৬
৩. বুদ্ধদেব বসু : 'কালের পুতুল', 'জীবনানন্দ দাশ-বনলতা সেন' প্রবন্ধ, নিউ এজ পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, ৩য় সংস্করণ মে, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬
৪. নজরুল ইসলাম : 'সঞ্চিতা', ডি. এম. লাইব্রেরি, কোলকাতা, একষষ্টিতম সংস্করণ জুন, ২০০৫, পৃ. ৫৭
৫. শাহরিয়ার, আবু হাসান : 'হিন্দু-মুসলমান'/'ধূসর পাণ্ডুলিপি', জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা সমগ্র, সাহিত্য বিকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃ. ১০০
৬. তদেব
৭. তদেব : পৃ. ১০২
৮. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'আবহমান' কবিতা, ভারবি প্রকাশনী, কোলকাতা, একাদশ মুদ্রণ জুন, ২০০৫, পৃ. ৫৪
৯. প্রাগুক্ত, 'রিস্টওয়াচ'/'সাতটি তারার তিমির', পৃ. ২৩৯
১০. প্রাগুক্ত, 'রাত্রির কোরাস'/'সাতটি তারার তিমির', পৃ. ২৬৬
১১. প্রাগুক্ত, 'বিভিন্ন কোরাস'/'সাতটি তারার তিমির', পৃ. ১০১
১২. প্রাগুক্ত, 'মৃত্যু-স্বপ্ন-সংকল্প'/'বেলা অবেলা কালবেলা', পৃ. ৩৮০
১৩. প্রাগুক্ত, 'সুচেতনা'/'বনলতা সেন', পৃ. ৫২-৫৩
১৪. প্রাগুক্ত, 'কয়েকটি লাইন'/'ধূসর পাণ্ডুলিপি', পৃ. ১২৮
১৫. প্রাগুক্ত, '১৯৪৬-৪৭'/'বেলা অবেলা কালবেলা', পৃ. ১১৮
১৬. তদেব : পৃ. ১১৯
১৭. তদেব : পৃ. ১২০
১৮. তদেব : পৃ. ১১৯

তথ্যের সন্ধানে

১. 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি প্রকাশনী, কোলকাতা, একাদশ মুদ্রণ জুন, ২০০৫
২. শামিম রেজা : 'ঋতুসংহারে জীবনানন্দ', অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, জুন, ২০১৪
৩. শীতল চৌধুরি : 'আধুনিক বাংলা কবিতা', প্রজ্ঞাবিকাশ, কোলকাতা, ২য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ- আগস্ট, ২০১৭
৪. মঞ্জুভাষ মিত্র : 'আধুনিক বাংলা কবিতা', পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০২

‘শিকার’ : নাগরিক লোভ-লালসা-লোলুপতা এবং একটি মৃত্যুর কাহিনি

মৈত্রেয়ী বিশ্বাস

বিশ শতকের তিনের দশকে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিন্ন করে যে কবিরা একটি স্বতন্ত্র পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন, তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কবি ও প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু। আর এই কবিদের মধ্যে যিনি আপন বৈশিষ্ট্যে নিজের জগৎ খুঁজে নিয়েছিলেন, তিনি ‘কবি পুরোহিত’ জীবনানন্দ দাশ। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রোত্তর কবিরা প্রকৃতির প্রতি নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন বলেই, তাঁরা যে আছে মাটির কাছাকাছি, সেই মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ মানুষের কথা শোনাতে উন্মুখ হয়ে পড়েন। বলাবাহুল্য ‘নির্জনতম’ কবি জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির রূপ চিত্র অঙ্কনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দের ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ পাঠ করার পর এই কবিকে চিহ্নিত করেছিলেন ‘চিত্ররূপময়’কবি হিসেবে।

নাগরিক মানুষের লোভ-লালসা-রিরংসা-জিঘাংসা-জৈবতা দেখে কবি অবাক হয়েছেন। নগর সভ্যতা কীভাবে তাদের চাতুর্যে গ্রামসভ্যতা ও পল্লি প্রকৃতিঘনিষ্ঠ যাপিত জীবনে অভ্যস্ত প্রাণীদের প্রাণহন্তারকের ভূমিকায় আসীন হয়, তারই চালচিত্র আঁকা হয়েছে ‘শিকার’ কবিতায়। কবিতাটির মধ্যে সংবেদনশীল জীবনের চেতন-অবচেতন-অচেতনের যে রক্তাক্ত প্রবাহ সঞ্চালিত হয়েছে, তার কোনো তুলনা মেলে না। বিশিষ্ট কবি ও অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কী চমৎকার লিখেছেন—

মহত্তর বেদনার যে উদ্ভাস শিকার-য়ে রয়েছে, তার তাৎপর্য সত্তা সংকটের আর এক চৌমাথায় পৌঁছে দেবে অনুভূতিশীল পাঠককে, আর পাঠক বুঝবেন যন্ত্রণার এক নতুন ধরন, নিজের মতন করে—এমনটাই কি ছিল কবির অভিপ্রায়?[১]

সত্য কখনও-বা সহজ-সুন্দর, আবার কখনও-বা ভয়ংকর নির্মম। তাই মগ্ন চৈতন্যবাদী কবি জীবনানন্দ দাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী মানব সমাজের মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধের ক্ষয়িত দেহ দেখে হতাশ হয়েছেন। হতবাক হয়েছেন সভ্যতার

অন্তরালে হিসেবী মানুষের নিষ্ঠুর বাস্তব রূপ দেখে। সেই বাস্তবতার উন্মুক্ত দেহ ধরা পড়েছে নগরবিলাসী মানুষদের লালসার বিকারে। 'শিকার' কবিতায় কিছু সাংকেতিকতার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়েছে এক নির্মম সত্য। এই কবিতায় কবির প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই। তিনি এক নেপথ্যচারী। কিন্তু সমগ্র কবিতা তিনি যেভাবে সাজিয়েছেন, তাতে মনে হয় নেপথ্যচারী কবি পাঠকের সংবেদনশীল মনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বার বার এই প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, ঠিক কোন্ দোষে নিরপরাধ একটি হরিণ শেষাবধি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছে?

কবিতায় এসেছে দুটি ভোরের কথা। কোনো ভণিতা না করে কবি শুধু একটা মাত্র বিশেষ্য পদকে সটান সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে লঙ শর্টে ক্যামেরার লেন্স ধরার মতো পাঠককে দেখিয়ে দিয়েছেন বিমুগ্ধ নিঃসর্গের এক বর্ণিল ছায়াছবি। ফলে দুটি ভোরের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা।

কবিতার শুরুতেই আছে প্রাণবন্ত, শীতার্ত ভোরের এক লাবণ্যময় ছবি। সেই ছবিতে এসে হাজির হয়েছে নানা বিচিত্র তুলির রং। সেখানে আকাশের রং কেমন, তার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি উপমা অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। ভোরের চালচিত্র অঙ্কনে কবি কতখানি সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ তো রয়েছে 'রূপসী বাংলা' কাব্যের একাধিক কবিতায়। আর 'শিকার' কবিতায় ভোরের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

ভোর
আকাশের রং ঘাস ফড়িং-এর দেহের মতো কোমল নীল
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।

কবি যেন কলমের পরিবর্তে তুলির টান দিয়েছেন ক্যানভাসে। ফলে রামধনু রঙে সাজিয়ে তুলেছেন প্রথম ভোরের চিত্রকে। সেই চিত্র এতটাই মুগ্ধ হয়ে উঠেছে, আমরা অনায়াসে প্রকৃতির এক নীরব, নিস্তব্ধ অপরূপ রূপের সামনে নতজানু হয়ে গভীর এক সত্তার মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই কবিতার যে সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সৌন্দর্য বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রকৃতির মতো ভয়াল-ভয়ংকর কোনো সৌন্দর্য নয়। এখানে কোনো ত্রাস নেই। বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক নেই। বরং উলটো দিকে রয়েছে এক পবিত্র সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে ভোগের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই প্রথম ভোরের চিত্রে এসেছে নান্দনিক এক অনুভূতি।

রাত শেষ হয়েছে। এসেছে নির্জনতা। ভোরের আকাশ তখন ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ের মুখের হাসির মতো কোমল ও প্রাণবন্ত। সেই ভোরের শীতার্ত আকাশে একটি মাত্র তারার উপস্থিতি। সেই তারাটির সঙ্গে কবি তুলনা করতে গিয়ে যে কথাগুলি বলেছেন, সে বড়ো চমৎকার। রাত্রি শেষে সলজ্জ বধূর মতো যখন ভোর এগিয়ে আসে, তখন আলো-আঁধারে আবৃত অপূর্ব একটি ছবি তৈরি হয়। রাতের সব তারা নিভে গেলে পর একটি লাজুক তারা তখনও মুখ লুকিয়ে কোনো এক অজানিত, অজ্ঞাত খবর দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে। এই তারাটির সঙ্গে কবি পাড়াগাঁয়ের বাসর ঘরের সবচেয়ে গোধূলি মদির মেয়ের তুলনা করেছেন।

যে দৃশ্যের চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি মিশরের কথা শোনান, সেই মিশরের কথা পুনরায় পেয়েছি এই কবিতায়। নীল মদের চিত্রকল্পে ভালোবাসা না ভ্রান্তি কিংবা বলা যায়, নীল রং শেষপর্যন্ত মৃত্যুর প্রতিকী বার্তা এনে হাজির করেছে আমাদের সামনে। এইসব ভাবতে ভাবতে কবির মনে পড়ে যায়, বর্তমান থেকে অতীতের বহু দূরের এক রাতের কথা—

হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

অন্ধকারের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া ভোরের আকাশের রং যখন পালটে যায়, ঠিক তখনই কবির অনুভূতিতে ধরা পড়ে বহু পুরোনো দিনের স্বপ্নীল জগতের কথা। অর্থাৎ কবি তখন অতীতে তাঁর পূর্ব জন্মের প্রেয়সীর কাছে বসে কত অধরা মাধুরী মেশানো গল্প শুনতে থাকেন। এমন গল্প শুনেছিলেন ''কল্পনা'' কাব্যের 'স্বপ্ন' কবিতায় জীবনানন্দের উত্তরসূরী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগুন ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে রং ধারণ করে। ঠিক কেমন সেই রং? একথা বোঝাতে গিয়ে কবি রোগা শালিকের বিবর্ণ ইচ্ছার কথা বলেন। রোগা শালিক নিঃসন্দেহে প্রতীকি ব্যঞ্জনায় অক্ষমতাকে কিংবা হতাশাকে চিহ্নিত করে। যা হৃদয়ের সব আশা ধুয়ে মুছে গেছে বেনো জলে, তার অবস্থা ঠিক কেমন বোঝাতে গিয়ে কবি রোগা শালিকের চিত্রকল্পকে বেছে নিয়েছেন।

শিশির ভেজা আলোয় যে মানুষগুলি নিত্য কর্মে ও ঘর্মে একাত্ম হবে ভেবেছিল, তারা এক জায়গায় বসে শরীরের উত্তাপ নিতে ব্যস্ত ছিল। তাদের মধ্যে ব্যস্ততা ছিল না। কোনো চঞ্চলতা ছিল না। কোনো প্রাণের তাপ-উত্তাপ ছিল না। যে আলো তারা শরীর উষ্ণ করার জন্যে শুকনো অশ্বত্থ পাতার সহযোগে জ্বালিয়ে ছিল, সেই আলো ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে পড়লে সংগত কারণেই কবি তাঁর পাঠককে নিয়ে যান দ্বিতীয় ভোরের কাছে।

একই প্রকৃতি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে রূপ বদলায়, রং বদলায়, স্বরূপ বদলায় সেকথা শুনিয়েছেন কবি। কবিতার মধ্যলগ্নে দেখা যায়, হঠাৎই গভীর অরণ্যে সবুজ সমুদ্রে এল প্রবল জোয়ার। কবি তাঁর তুলির টানে কবিতার ক্যানভাসে সবুজ রঙের সঙ্গে টক টকে লাল রং মিশিয়ে এক মর্মান্তিক সকালের ছবি আঁকলেন। একটি সুন্দর বাদামী হরিণ সারা রাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে ছুটেছে মেহগিনির অন্ধকার ছিন্ন করে সুন্দরী বনে এবং সেখান থেকে উল্কার গতিতে আবার ধাবিত হয়েছে অর্জুনের বনে। বেঁচে থাকার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যখন তার দৌড়ে বেড়ানো, ঠিক তখন ভোরের সূর্য তাকে এই বার্তা দিয়েছে, চিতা বাঘিনী আর ভয়ংকর কোনো রূপ নিয়ে তাকে খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, দ্বিতীয় এই ভোর আলো ছড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতির বুকে। সেই সময় বাদামী হরিণটি সানন্দে খেতে থাকে বাতাবি লেবুর পাতার মতো সবুজ, সুগন্ধি ঘাস। তারপর জীবনের পরম উল্লাসে নেমে পড়ে নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে। এর কারণ সে চেয়েছিল—সাহসে, সাধে আর সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দিতে।

সাহস, সাধ, সৌন্দর্য—এই তিনটি অনুপ্রাস সংযোজিত শব্দ আভিধানিক অর্থ ভেঙে গভীরতর এক ব্যঞ্জনায় উন্নীত হয়েছে। চিতা বাঘিনী তাকে বাঁচার অধিকার দিলেও মানুষ তাকে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়নি। তাই দেখা যায়, রাতের ঘুম হীন ক্লান্ত শরীরটায় প্রাণময়তার আবেশ জাগাতে গিয়ে যখন সে নেমে পড়ে তীক্ষ্ণ-শীতল স্রোতে; ঠিক তখনই অদ্ভুত এক শব্দ।

মানব সভ্যতার সব থেকে সুসভ্য জাতি বলে যারা অহংকারে প্রমত্ত হয়ে ওঠে, তাদের লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা আর জিঘাংসার কারণেই আরণ্যক প্রাণী হারিয়ে ফেলে সাহস, সাধ আর সৌন্দর্য। এইসব অবিবেকী মানসিকতা ও হৃদয়হীনতার কথায় শিল্পরূপ পেয়েছে 'শিকার' কবিতায়।

উৎসের সন্ধানে

১. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : 'শিকার, অথবা নিস্পন্দ নিরাপরাধ ঘুম', ''আমার জীবনানন্দ'', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৪৫

যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
বিষ্ণু দে-র কবিতা
সুরজিৎ প্রামাণিক

বিষ্ণু দে-র কবিতা বাংলা কবিতার বিস্তৃত পটভূমিতে এক সুবিস্তৃত অধ্যায়। যে কাব্যবোধ ও ভাবনার দিগন্তে তিনি কবিতার ক্যানভাস রাঙিয়ে দিয়ে গেছেন, নিশ্চিতভাবেই তা পাঠকের অভিভবে বিশেষ ভাবনা দাবি করে। আসলেই বিষ্ণু দে তাঁর নিগূঢ় কাব্যবোধের সুক্ষ তুলিতে, প্রতিনিয়ত নিজেকে ভেঙেছেন, আর গড়ে তুলেছেন কবিত্বের নিজস্ব প্রগাঢ়তায়; বিচিত্র উপমার খোঁজে; শব্দের গভীরতর ব্যঞ্জনায়; সংকেতের প্রাবল্যে কিংবা চিত্রকল্পের বহুমুখী অন্বেষণে। খেয়ার যাত্রী হতে হতে কিভাবে বৈতরণী পেরিয়ে যাওয়া যায়, কান্ডারিবিহীন এ পৃথিবীর যাপনচিত্রে মানব-হৃদয় কীভাবে নিরন্তর বাতাসের হাহাকার ছাপিয়ে ওঠে, সে কথা বিষ্ণু দে এঁকে দিয়ে গেছেন বাংলা কবিতার বৈচিত্র্যময় মানসক্ষেত্রে। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের "ক্রেসিডা" কবিতায় তিনি লৌকিক জীবনের সেই ধারাভাষ্যই যেন রচনা করে গেলেন। কান্ডারিবিহীন খেয়ায় বসে কান্ডারি খুঁজতে খুঁজতে কবির দৃষ্টি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর হৃদয়ের বীণায় হাহাকারের বেদনা অহরহ হতে থাকে প্রতিধ্বনিত—

হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার।
কান্ডারীহীন বালুকাবেলায় চোখ পুড়ে মরে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার।[১] ('ক্রেসিডা')

বিষ্ণু দে জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৯ সালে কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেছেন কলকাতার সেন্ট পলস কলেজে। যেহেতু তাঁর ছাত্র জীবন কেটেছে ইংরেজি সাহিত্যের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে, তাই সংগত কারণেই আমরা বলতে পারি, বিষ্ণু দে তাঁর গভীর অনুশীলন ও দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতায়, ব্যক্তিগত অনুভবকে জারিত করতে পেরেছেন ইংরেজি সাহিত্যের নিত্য-চর্চার অবকাশে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে।

এরপর কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকায় রয়েছে—'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৪), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩), 'আলেখ্য' (১৯৫৮), 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৬০), 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' (১৯৬৩), 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৮), 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৯৭০), 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' (১৯৭৪), 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' (১৯৭৫), 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৭), 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' (১৯৮০) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ এককথায় বাংলা কবিতার আজন্ম সম্পদ।

পাশ্চাত্যের টি.এস. এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' গ্রন্থের মতোই আধুনিক যান্ত্রিক সমাজ-জীবন যে ব্যর্থ, সে কথাই বিষ্ণু দে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলেন তাঁর 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায়। আসলে যে অনুশীলন বা চর্চায় একজন শিল্পীর নিত্য অবগাহন, তাঁর শিল্পে সেই অনুশীলিত ভাববীজ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যা বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে, সমকালীন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু বা জীবনানন্দ প্রমুখের কবিতাতেও প্রতিফলিত হতে দেখেছি আমরা। তবে কাব্যভাবনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এবং সার্বিকভাবে কাব্যের অবয়ব নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ঘূর্ণাবর্তে দিশাহারা না হয়ে, বরং বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে অসামান্য এক ভিন্ন দৃষ্টির রেখা প্রতিস্থাপন করতে পেরেছেন। আর তা পেরেছেন বলেই, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভার বিচ্ছুরণের কালেও, তাঁরা এক একটি বটবৃক্ষের মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তারে সমর্থ হয়ে উঠেছেন। কাজেই বাংলা কবিতার এই মহীরুহপ্রতিম বৈভব মণ্ডপে বিষ্ণু দে-কে যে কখনোই কোনোভাবে ব্রাত্য ভাবা সম্ভব নয়, সে কথা বহুকাল আগে থেকেই বাংলা কবিতার পাঠকমহলে স্বীকৃত। আদতে একজন স্রষ্টার স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা কিংবা অভিনবত্ব বা বলিষ্ঠতা এখানেই। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, এ কথা বললেও বোধ হয় বাতুলতা হবে না কোনও অংশে।

"চোরাবালি" কাব্যগ্রন্থের 'ক্রেসিডা'-তে যেমন ইহজাগতিক জীবনের বৈতরণীর কথা বলেছেন বিষ্ণু দে। পাশাপাশি আবার এই একই কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় কবি বিদগ্ধ মানুষজনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণও করেছেন। আবার, 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার শুরু থেকেই যে প্রবল একটা ঘোর পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তা আদতে কবি নিজেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তীব্র একটি ঘোরের আমেজ তৈরি করে ফেলেছিলেন, ঘোরের মধ্যে থেকে। বিষ্ণু দে-র প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই বিষয়বস্তুর গভীরতায় তীব্র একটি ঘোর আমরা পরিলক্ষণ করি। যদিও তা অস্বাভাবিক নয়। কারণ গভীর অর্থে কবিতা তার পাঠকের চেতনাকে নিগূঢ় এক আচ্ছন্নতায় নিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যে আচ্ছন্নতায়, যে ঘোর লাগা চেতনার ব্যাপ্তিতে ভর করেই কবিতা পাঠক পৌঁছে যান জীবনের, তথা সমাজ ও সভ্যতার নিবিড়তম অনুভূতির শীর্ষদেশে। আসলে কবিতা তো জীবনের কথা বলে, কবিতা যাপনের কথা বলে। কাজেই কবির ব্যাক্তিগত জীপন-যাপনের নির্যাসে যে বোধ উত্থিত হয় অহর্নিশি, সেই বোধের প্রান্তদেশ ছুঁয়েই কবি, তাঁর ভাবনায় মানুষের সুখ-দুঃখ, লড়াই-প্রতিবাদ, হাসি-কান্না এবং সর্বোপরি জীবন-মৃত্যুর নিবিড়তম রূপকল্পটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

বিষ্ণু দে-ও একইভাবে তাঁর আমৃত্যু কাব্য-সাধনায় মানব-জীবনের চলমান বৃত্তটিকে ধারণ করতে পেরেছিলেন খুব সহজেই। সেই বৃত্তেই দেশভাগ থেকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির যন্ত্রণা-দগ্ধ অসুখের কথাও অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রকাশিত হল তাঁর কবিতায়। সপ্তম কাব্যগ্রন্থ "অন্বিষ্ট"-তে

এসে কবি 'জল দাও' শীর্ষক কবিতায় তুলে ধরলেন মানুষের মজ্জাগত অসুখ থেকে আসা অসাম্প্রদায়িক অস্থিরতার জটিল-কুটিল প্রতিচ্ছবিটি। দেশভাগের বীভৎস আর্তনাদ ধ্বনিত হতে থাকল তাঁর 'জল দাও' কবিতার পরতে পরতে। জাতিতে-জাতিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, কদর্য হানাহানির যে জঘন্য চিত্র ফুটে উঠল মানব-সভ্যতায় ও বিশ্ব-প্রকৃতিতে, তা হাড় হিম করা দৃশ্যের মতো পাঠকের মজ্জায় কাঁপন লাগিয়ে গেল। এখানেই তো একজন কবিতা সাধকের কাব্য-সাধনার সফলতা, যিনি পাঠককে কখনও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারেন, আবার কখনও হিম-শীতলতায় কাঁপাতেও পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশেষত স্বাধীনতা ও বিভাজনের ক্রুদ্ধ সময় পর্বে লেখা তাঁর কবিতাগুলিতে মানব-জীবনের আর্তনাদ ও ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠল বিস্তৃত আকারে। বিষাদগ্রস্ত প্রকৃতির বারান্দায় সোনার উজ্জ্বলতা মলিন হতে থাকল ক্রমশ। অবিশ্বাস্যভাবে পাখিদের কলরব থেমে গেল প্রকৃতির ব্যালকনিতে। মানুষের অসহনীয় হৃদয়ে সহিষ্ণুতার বার্তা থরথর করে কেঁপে উঠল তখন—

> যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ/অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে/গোলমোরের সোনাও পাণ্ডুর/শাকিলের ঐক্যতান থেমে যায় জামরুল-বাগানে/কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর/তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন/বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো/প্রচন্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে/আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল।[২]—('জল দাও')

ছেচল্লিশের দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ সমাজের দগ্ধ পরিণতি কবির কাছে দুঃস্বপ্নের মতো জেগে উঠতে থাকে। কবি সেই ভয়ংকর স্মৃতির উদ্ভাস থেকে কখনোই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন না। ফলে আমরা বলতে পারি, অসহায় মানুষের কান্নার ইতিবৃত্তটি কোনো শিল্পী-মন যেমন তাঁর সত্তা থেকে সরাতে পারে না, ঠিক তেমনি বিষ্ণু দে-ও তাঁর ব্যক্তিগত মননে, চেতনায় কিংবা যাপনে সেই হাড় কাঁপানো ইতিহাস জাপটে ধরে থাকেন। কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি দেখান, একদল মানুষ বাঁচার জন্য যখন লড়াই করছে নিরন্তর, ঠিক তখনই আর একদল মানুষ যারা দাঙ্গাবাজ তারা সেই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সামিল হওয়া মানুষগুলোর জীবন থেকে প্রাণ কেড়ে নিতে চাইছে নির্দ্বিধায়। বন্ধ করে দিতে চাইছে তাদের জীবনের শেষ শ্বাসবায়ুটুকু। কবির চোখে সবটাই ধরা পড়ে, কিন্তু তিনিও তো রাষ্ট্রের নিয়মমাফিক পরিকাঠামোয় অসহায়।

'জল দাও' শীর্ষক কবিতায় বিষ্ণু দে যেন এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ের জর্জরিত ছবিই ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন, অন্তরঙ্গ ব্যঞ্জনায়। কারণ যে জল জীবনের আর এক নাম, সেই জলেই ঘটে যাওয়া এক মর্মস্পর্শী ঘটনা কবি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন ভয়ংকর যন্ত্রণা বুকে চেপে ধরে। অত্যন্ত নিকটে দাঁড়িয়ে দেখেছেন জলভরতি ডোবায় ঝাঁপ দেওয়া মুসলিম ছেলেটির বাঁচার আর্তনাদ। পাশাপাশি এও দেখেছেন সেই যুবকের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য, তীরে দাঁড়িয়ে থাকা দাঙ্গাবাজের দল তাকে লক্ষ্য করে কীভাবে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ছে একের পর এক। এর থেকে মর্মান্তিক দৃশ্য আর কী হতে পারে! ফলে বিষ্ণু দে-র চোখের পাতায় জমে থাকা জল আদতেই মানুষের জীবনের প্রতীক, সেই জলেই একজন তরতাজা যুবকের প্রাণ নিস্পন্দ হয়ে যাওয়ার হিমশীতল স্মৃতিটিও কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। এভাবেই 'বাস্তবের এই বেদনাদায়ক সভ্যতা-সংস্কৃতি মনুষ্যত্বের পক্ষে কলঙ্কজনক ঘটনাই একদিন জন্ম দিল 'জল দাও' কবিতাটির।

তবে বাইরের জগতের ঘটনাটা ছাপিয়ে 'জল দাও' পৌঁছে গেল অন্যভুবনে, বহুতর ব্যঞ্জনায়। এক হিসেবে কবিতাটি হয়ে দাঁড়ায় ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রের অভিনব বিন্যাস। যা মন্ত্রে ঘনীভূত সেইটি যেন প্রকট হয়েছে বিস্তৃত ব্যাখ্যায়। যে জল ঊশতীরিব মাতরঃ, তা মাতৃস্তন্যের মতোই মঙ্গলবিধাতৃ। অন্যদিকে তা গভীর প্রেমেও আশ্লিষ্ট রাখে, ঘর্মাক্ত ব্যক্তি যেমন গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ জলে স্নান শেষে মলয়ানিলে প্রীত হয় তেমনি তো রয়েছে জলেরও ভালোবাসা। জল প্রেম, জল নারী, জল জননী, জল আতৃণ ব্রহ্ম ও জীবন।"[৩] বিশ্বচরাচর ধারণ করে থাকা জলের উপর এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলস্বরুপ যে যুবকের প্রাণ গেল, কবি তা লক্ষ করে আদতে ব্যক্তিগত আত্মার তথা সভ্যতার প্রাণবায়ু সংকট উপলব্ধি করলেন—হয়তো-বা নিরুপায়/হয়তো-বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস/বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার/অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের/আমের মুকুলে ফল/রাশি-রাশি বেল মল্লিকায়/বাগান বিহ্বল আজ কালেরই বাগান/তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের/পাতা ঝরা পাতা-ঝরানোর ক্ষোভের রাগের/তবু সেই বাঁচার মরার মরীয়া যন্ত্রণা চলে/আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে"[৪]—("জল দাও")

ফাল্গুনের উল্লেখ দিয়ে যে কবিতা শুরু হল, সেই কবিতা তো বসন্তের চির সুন্দর প্রকৃতির শোভা বর্ণনা করবে এটাই স্বাভাবিক ভাবে পাঠকের মনে হওয়ার ছিল। কিন্তু আদতে তা না হয়ে বরং মানুষের অস্তিত্ব-সংকটের কথাই কবিতার মূল বিষয় হয়ে উঠে এল। কবি ক্লান্ত হয়ে গেলেন দাঙ্গার খবরে। বিধ্বস্ত চোখে দেখলেন সভ্যতার মরিয়া হাঁপানি, মানুষের ব্যর্থতা ও চূড়ান্ত অসহায়তার দিনগুলি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না"-র মতো বিষ্ণু দে-ও যে বলতে পেরেছেন—"মুহূর্তের অবশ অসাড় স্তব্ধতার অতল সাগরে ডুবে যাই আর ভেসে উঠি।" তবু চেতনার ভিতরে সরীসৃপ হাজার সংশয় নিয়ে বাসা বাঁধলেও, নিস্তব্ধ বাতাসে, মাটিতে, পাথরে, অন্ধকার রাত্রির বুকে পৃথিবী আলো করে সকাল নামে প্রতিদিন। গাছে গাছে ঝরে যাওয়া মুকুল ভোরের লাবণ্যে পল্লবিত হয়। আর এই সকাল যদি মুক্তির সকাল হয়, এই পল্লব যদি আনন্দের পল্লব হয়, তাহলে জামরুল বাগানে ফিরে আসে শাকিলের ঐক্যতান পুনরায়।

যদিও এই ভাবনাগুলি জেগে থাকে কেবলই গভীর আশাবাদের নিরিখে। যে 'আশাবাদ' একটা কবি মনে, একটা শিল্পী মনেই জন্মায়। বিষ্ণু দে-ও তাঁর আশাবাদী কাব্য-জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে সমাজকে মুক্তির আলোয় আলোকিত করতে চান। অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অসহায় আকুল বিস্ময়ে, জীবনকে কণ্টকিত অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে চান প্রশান্তির ভাস্বর সত্তায়। তাই নিজের শিকড়ে জল দেওয়ার প্রার্থনা সভ্যতার কাছে রেখে, অন্তর্গত অর্থে আসলে তিনি মানব সভ্যতার চৈতন্য বৃক্ষটিকেই সবুজ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত-কুসুমিত করতে চেয়েছেন—"তারপরে আলো জ্বালি/বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ে/জল দাও আমার শিকড়ে।।"[৫]—('জল দাও') একইভাবে কবি "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত" কাব্যগ্রন্থের 'প্রাকৃত কবিতা'-তেও সেই আশার কথাই যেন ব্যক্ত করতে চাইলেন মনে-প্রাণে। অসামান্য চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল কাব্যিক ব্যঞ্জনা। প্রতিকী প্রকাশ হয়ে উঠল ভাবনার রসদ। যে প্রতীক বা চিত্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ বোধ হয় বাংলা কবিতায় অভিনব কথন-শৈলীতে জন্ম দিয়েছিলেন জীবনানন্দ। আসলে—

> জীবনানন্দ চেয়েছেন অবগাঢ় হতে। বিষ্ণু দে হতে চেয়েছেন অবহিত। প্রতীকী কবি, প্রসঙ্গত আমরা ইয়েটস-এর কথা বলতে পারি, তিনি চিত্রকল্প-গুলিকে ব্যবহার করেন উর্ধপ্রয়াণের সোপান হিসাবে। আধুনিক কবি চিত্রকল্পকে ব্যবহার করেন তাঁর প্রাত্যহিকের প্রতি মুহূর্তের দৃঢ় ও সজাগ সচেতনতার প্রতিচিত্ররূপে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিষ্ণু দে অনন্যসাধারণ সচেতনতার অধিকারী বলেই তিনি এই যুগের প্রধান আধুনিক কবি। কালের সাম্প্রতিক ছন্দে ধৃত দেশ এবং বিশ্বে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ঘাত-প্রতিঘাতে, সহযোগে এবং দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবিক চিদাকাশকে। সেখানে প্রতিটি অদ্যতনী অতীত এবং আগামীর উষা-রজনীতে নিত্রস্নায়ী। ঐতিহ্য-প্রাণিত এই কবির চিন্তা শুধু বৌদ্ধিক স্তরেই আবদ্ধ নয়। চিন্তা তাঁর কাছে অভিজ্ঞতা।[৬]

তাই 'জল দাও' ও 'প্রাকৃত কবিতা'-র প্রেক্ষিত আলাদা কিংবা বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও, বিশেষ কতগুলো পঙ্‌ক্তিতে যে উভয় কবিতাতেই কবি তাঁর পারিপার্শ্বিকতার আলোড়ন থেকে সিঞ্চন করা অভিজ্ঞতায়, নিগূঢ় আশাবাদ ধ্বনিত করেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুদীর্ঘ অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই যে জয়ের সূর্য ওঠে, সেকথা প্রকাশ করতে দ্বিধা রাখেননি বিষ্ণু দে। কাজেই দীর্ঘকাল যাবৎ লড়াইয়ের মানসিকতা রাখে যে মানুষ, সে তো জয়লাভ করবেই একদিন। দীর্ঘ পথের মিছিলে যে গান ধ্বনিত হয়, সেই গানের সঞ্চয়ে সহিষ্ণুতা তো ফিরে আসবেই। কবি বলছেন—"আসবে অনেকদিনের হারের মধ্যে লড়াই জিতে/অনেক মিছিলে সঞ্চিত সংগীতে,/আসবে আমার সহিষ্ণু সংবিতে।"[৭] —("প্রাকৃত কবিতা")

পাঠক জানেন "জল দাও" ও 'প্রাকৃত কবিতা' হল দুটি ভিন্ন ভাবনার কবিতা, দুটি ভিন্ন স্বাদের কবিতা। 'জল দাও' কবিতায় সভ্যতার এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাওয়ার রূপ ফুটে উঠলেও 'প্রাকৃত কবিতা'-য় রূপায়িত হয় নারী, পুরুষ, বাৎসল্য-প্রীতি ইত্যাদির কথা। তবে দুটি কবিতাতেই আমরা প্রকৃতির নিবিড় যোগসূত্র দেখতে পাই। প্রকৃতির যোগসূত্র বলতে উভয় কবিতার প্রকাশভঙ্গিতে প্রকৃতি যে প্রবলভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে, সেই জায়গাটিকে ধরা যেতে পারে। আর এই সন্নিবেশের মাঝেই প্রকৃতির কোলে প্রেম হয়ে উঠেছে মানব জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখার মূল চালিকাশক্তি। প্রসঙ্গত 'জল দাও' কবিতাটি পাঠের পর বাঙালি কবিতা পাঠকের মনে কবি তরুণ সান্যালের 'জল শুধু জল' কবিতাটির কথাও ভেসে আসতে পারে। এ বিষয়ে কবি গণেশ বসু বলছেন—

> উত্তরসূরি কবির রচনায় পাই প্রকৃতি, মানবসমাজ মানবসত্তাকে যে আবহমানকাল ঈশ্বরসাধনা ও শিল্পসাধনায় ধারণ করে আছে সেই রূপটি যেন বিশেষভাবে তুলনীয় এই কবিতাটির সঙ্গে। বিষ্ণু দে যেখানে জলকে ভেবেছেন প্রেমের প্রতীক, সেখানে তরুণ সান্যালে ব্যক্তি-সমাজ-প্রেম-রূপকল্পনা-সম্পদ সবকিছুই মানুষকে ধারণ করে বর্ণিত হয়েছে। যেমন—"প্রলয় পয়োধি যখন ভাসাচ্ছিল বেদ তুমি জলপোশাকে ছিলে/তুমি অগ্নি জল সইতে সীতা সইতে সরযূ পরে ছিলে।"[৮]—('জল শুধু জল' : তরুণ সান্যাল)

এভাবেই বাংলা কবিতার আকাশে রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ের ইতিকথায় জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেরা যেমন উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন, একইভাবে বিষ্ণু দে-ও স্ব-মহিমায় ভাস্বর। তাঁর কাব্যবোধের স্বকীয়তা, শব্দ চয়নের অভিনব প্রবণতা, ভাবনার অনন্ত ব্যাপ্তি ও সার্বিকভাবে সৃষ্টির নিগূঢ় বৈভব দেখে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বিষ্ণু দে বাংলা কবিতায় অনন্য কবি-প্রতিভা এবং অতি অবশ্যই তা ব্যতিক্রমী।

উৎসের সন্ধানে

১. বিষ্ণু দে : 'বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৫
২. তদেব : পৃ. ১২৯
৩. গণেশ বসু : 'জল দাও আমার শিকড়ে'; বেলাভূমি পত্রিকা, ফলতা, বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ৩৮
৪. উৎস-১, পৃ. ১২২
৫. উৎস-১, পৃ. ১২০
৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা কবিতার কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৮০
৭. উৎস-১, পৃ. ১৭০
৮. উৎস-৩, পৃ. ৪১

শামসুর রাহমানের কবিতা
প্রবহমান জীবনের মন্তাজ

সুস্মিতা সাহা

যখন-তখন
মনের আপন ঘাঁটি ভীষণ প্রকম্পিত।
এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি।
(এখন আমি, 'এক ধরনের অহংকার', প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫)[১]

উর্দু আগ্রাসনের অবসান ঘটাতে এবং বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে বর্তমান বাংলাদেশের রয়েছে নজিরবিহীন এক রক্তাক্ত সংগ্রাম, এ কথা আমরা সকলেই তুলনারহিতভাবেই অবগত। আর এই বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজে মাতৃভূমিকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার নামে বাঙালি জাতির জীবনে যে প্রবঞ্চনা ও অপমান নেমে আসে তাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পাশাপাশি রয়েছে কলম ধরার মাধ্যমে নানা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা। আর সেই সূত্র ধরে যথাক্রমে ১৯৫০ এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায় একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কবিতার সংকলন 'নতুন কবিতা' এবং হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় "একুশে ফেব্রুয়ারী" কাব্যসংকলন। এই 'নতুন কবিতা'র সংকলনেই প্রথম কবি শামসুর রাহমানের আত্মপ্রকাশ। যে আত্মপ্রকাশে জড়িয়ে বাংলাদেশের কবিতার অন্তর্জগৎ নির্মাণের ইতিহাস স্বীকৃত দায়বদ্ধতা। আর সেই দায়িত্ব পালনে ঘুরে ফিরেই এসেছে যেমন তৎকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনযাপন ঠিক তেমনি এসেছে ব্যক্তি শামসুর রাহমানও। যেখানে স্বীকার-স্বীকৃতি উভয়েরই সমধর্ম বজায় থেকেছে।

পেশাগত দিক থেকে এই কবি ছিলেন একজন সাংবাদিক তাঁর জন্ম পুরাতন ঢাকার মাহুতটুলিতে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩ অক্টোবর এবং মৃত্যু ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ১৭ আগস্ট। মূলত বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় 'রুপালি স্নান' কবিতাটির মধ্য দিয়ে সুধীপাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ লাভ করেন তিনি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৬৬ টি। এর মধ্যে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল—"প্রথম গান দ্বিতীয়

মৃত্যুর আগে" যা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পায়, এরপর পর্যায়ক্রমে 'রৌদ্র করোটিতে' (১৯৬৩) 'বিধ্বস্ত নীলিমা' (১৯৬৭) 'নিরালোকে দিব্যরথ' (১৯৬৮) 'নিজ বাসভূমে' (১৯৭০) 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭২) 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' (১৯৭৭) 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' (১৯৭৩) 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা' (১৯৭৪) 'আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি' (১৯৭৪) 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে' (১৯৭৮) 'এক ধরনের অহংকার' (১৯৭৫) 'আমি অনাহারী' (১৯৭৬), 'শূন্যতায় তুমি শোকসভা' (১৯৭৭) 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' (১৯৮৮) 'হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছু কাল' (১৯৯৭) প্রভৃতি অজস্র কাব্যগ্রন্থ কবির এক গৌরবময় সৃষ্টিপূর্ণ অধ্যায়।

আমাদের আলোচনা শিরোনামে রয়েছে 'মন্তাজ' শব্দটি, যা আমরা এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপেই যুক্ত করেছি বলা যেতে পারে। কবি শামসুর রাহমান তাঁর একটি উপন্যাসের নামকরণ করেছিলেন 'নিয়ত মন্তাজ' (১৯৮৫) সর্বপ্রথম এই শব্দবন্ধনীর এর প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ বোধ করি, মন্তাজ অর্থাৎ এটি একটি মূল ফরাসি ভাষা থেকে আগত যার অর্থ সম্পাদনা পদ্ধতি মূলত প্রখ্যাত রুশ চলচ্চিত্র পরিচালক আইজেনস্টাইন এই মন্তাজের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমন কিছু দৃশ্য নির্মাণ যা থেকে পরবর্তী ধারণা গঠন ঘটনাকে সমাবেশিত বা একত্র করা পক্ষান্তরে দেখলে এই তো মানব জীবন নিরন্তর সম্পাদন যোগ-বিয়োজন শামসুর রাহমান এর ক্ষেত্রে যা অনেকখানি প্রযোজ্য, রয়েছে উত্থান-পতন, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, আশা-নিরাশা, গ্রহণ-বর্জন। সম্ভাব্য কবি পেশাগত দিক থেকে সাংবাদিক হবার দরুন মন্তাজ শব্দটি হয়তো এতোখানি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষক ভূমিকা পায় তা বলাই বাহুল্য। কবি তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন—

> জীবন তৃষ্ণা আজও মেটেনি, টুটাফুটা শরীর এবং ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছি ভবিষ্যতের দিকে। এক অর্থে সকল মানুষই একা। অনেকে একাকীত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম, কারো কারো মর্মমূলে তীরের মত বিঁধে থাকে নিঃসঙ্গাবোধ। আমি নিঃসঙ্গা হওয়া সত্ত্বেও অনেকের সঙ্গে জড়িয়ে আমার জীবন।[৩]

কবির এ সকল কথা বা অভিমতের সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্যময় 'আত্মজীবনীর খসড়া' নামক কবিতাখানি যার কিছু অংশ প্রসঙ্গাক্রমে তুলে ধরা যেতে পারে—

> গলায় রক্ত তুলেও তোমার মুক্তি নেই।/হঠাৎ আলোয় শিরায় যাদের আবির্ভাব,/ আসবেই ওরা ঝড়ের পরের পাখির ঢেউ।/...তারা যাকে বলে সফলতা তার চিহ্ন তুমি/সারা পথ হেঁটে এখনো কিছুই পাওনি খুঁজে/সহজ তো নয় স্বর্গ সিড়ির আশায় বাঁচা।/...আজো আছে চিরকস্তুরীটুকু লুকানো মনে/সেই সৌরভে উন্মন তুমি, তখন জানি/দেয়ালে তোমার কাঠ-কয়লার আঁচড় পড়ে।[৪]
> (আত্মজীবনীর খসড়া : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০)

এই সকল পঙ্‌ক্তি সেই জীবনতৃষ্ণ কবিরই সন্ধান দেয় আমাদের। কস্তুরীর মতো সৌরভমময় জীবন পিপাসা শামসুর রাহমানের জীবনআলেখ্য হয়ে থাকে। কবির বড় হয়ে ওঠা যে তথাকথিত সাহিত্য চর্চিত পরিবেশে এমনটা কিন্তু নয় কিন্তু নদীর মতোই রয়েছে প্রত্যেক মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট স্রোতধারা। সেই স্রোতধারায় কেবল জল নয় থাকে নুড়ি-কাঁকর-বালি-পলি ইত্যাদি। তাই কবির অনায়াস স্বীকৃতি—

> জীবনকে সহজ নিয়মে নেয়া যেতো প্রথামতো,/কিন্তু তবু জ্যামিতির নেপথ্যে মায়াবী গুঞ্জরণে/মজেছি স্বতই দুঃখে অর্থ থেকে অর্থহীনতায়।/কুৎসার ধারিনী ধার ,বরং নিজেরই আচরণে/বিপন্ন হয়েও শুধু সারাক্ষণ অস্তিত্বের ধার।[৫] (অপাঙতেয় : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০)

জীবনের প্রবহমানতায় দুঃখ, আনন্দ, কুৎসা, অর্থহীনতা, বিপন্ন অস্তিত্বের সংশয় সকল কিছুই একটি মানব জীবনের সারমেয় সত্য সেই সত্যের অনুধাবনই যেন কবিতাটি। যে-কোনো মানুষের জীবন পর্যায়ে শৈশববেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন একজন শিশুর নরম হৃদয়ে যা কিছু দাগ কাটে, তা থেকে যায় হয়তো সারা জীবন ধরেই স্মৃতির মণিকোঠায়। কবি শামসুর রাহমানের ক্ষেত্রেও সেই স্মৃতি হয়তো সত্তর বছরেও উজ্জ্বল ছিল। তাঁর স্মৃতির পাতায় সেই চিররঞ্জিত দিনগুলি তুলে ধরেছেন এমনভাবে যা তাঁর কবিতাকেও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে—

> সন্ধ্যেবেলা একজন বাতিঅলা এসে বাতি জ্বালিয়ে যেত গলির মোড়ে...ছোটখাটো এক লোক মুখে গোঁফ, পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া মাথায় কাপড়ের টুপি, কাত করে পরা, টুপির কিনারা তেল চিটচিটে, কাঁধে মই। লোকটাকে মনে হতো কোন ঐন্দ্রজালিকের মতো, অন্ধকারে আলো ফোটানো যার মনোমুগ্ধকর এক খেলা।...যদি কোনো কারণে সে অনুপস্থিত থাকতো আমাদের গলির কপালে একরত্তি আলোও জুটত না। গলিটা মুখ গোমড়া করে ডুবে থাকত ছমছমে অন্ধকারে।...আমার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিধ্বস্ত নীলিমা' যারা পড়েছেন তাদের হয়তো মনে পড়বে 'শৈশবের বাতিঅলা আমাকে' কবিতাটি, এই কবিতার উৎস আমার ছেলেবেলার সেই বাতিঅলা, যার প্রতীক্ষায় থাকতাম গোধূলি বেলায়, শৈশবের স্মৃতিগুলো সম্ভবত এভাবেই চিরদিন একজন কবিকে কবিতার উপাদান জুগিয়ে চলে, কি এক উঠে আসে মনের অবচেতন এলাকা থেকে। কখনও কখনও অচেতন অঞ্চলের দান পেয়ে যান কবি।[৬]

কবি কথিত শেষ কয়েকটি বাক্য এক অনির্বচনীয় সত্য তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে। বিধ্বস্ত নীলিমার দ্বিতীয় কবিতাটি হল সেই শৈশবের যাবতীয় মেকি আড়ম্বরতা থেকে দূরে থাকা এক স্বচ্ছ সরোবরের মতো—

> তোমার পাড়ায় আজ বড় অন্ধকার। সম্ভবত/বাতিটা জ্বালাতে ভুলে গেছ, আমি অভ্যাসবশত/ কেবলই আলোর কথা বলে ফেলি। মত্ত উজবুক/এ লোকটা বলে দাও দ্বিধাহীন। ভয় নেই, দেখাবো না মুখ/ভুলেও কস্মিনকালে, তোমরা কি অন্ধকার-প্রিয়?/চলি আমি, এই লণ্ঠনের আলো যে চায় তাকেই পৌঁছে দিও।[৭] (শৈশবের বাতিঅলা আমাকে: বিধ্বস্ত নীলিমা ১৯৬৭)

এই আলোরই অন্বেষণ যেন কবির জীবনভর যে আলো দ্বিধারহিত, উন্মুক্ত, অন্ধকারের খুব একটা ধার সে ধারে না। 'জীবনের পাঠশালা'-কে কবি যেন এভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছেন চিরদিন। প্রসঙ্গত কবির মাকে নিয়ে রচিত একটি কবিতার বিশেষ কিছু অংশ তুলে ধরতে মন চাইছে প্রবল ভাবে—

> কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি।/সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে/আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কিনা আজ মনেই পড়ে না।/...যেন তিনি সব গান দুঃখ-জাগানিয়া কোনো কাঠের সিন্দুকে/রেখেছেন বন্ধ করে আজীবন, এখন তাদের/গ্রন্থিল শরীর থেকে কালেভদ্রে সুর নয় শুধু/ন্যাপথলিন এর তীব্র ঘ্রাণ ভেসে আসে![৮] (কখনো আমার মাকে : বিধস্ত নীলিমা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭)

এমন কিছু হৃদয়ের নিভৃতে সত্য থাকে যা হয়তো কেবল কবিতাকে জানানো যায়, কবিতাই তার ভাষারূপ স্থাপন করে নেয় তেমন একটি কবিতা হল কবির 'কখনো আমার মাকে' নামক এই কবিতাটি, সমগ্র কবিতাটিতে জীবনের চলার পথ আমৃত্যু হয়তো চলতে থাকে বহমান কালকে স্বীকার করেই কিন্তু এমন কিছু সময় ও স্মৃতি বিজড়িত ব্যক্তি আমাদের জীবনে থাকেই যার সঙ্গে আত্মগত নৈকট্য বড়ো নিবিড়, বড়ো প্রকট হয় তেমনি হলেন 'মা' তিনি অনায়াসে সমস্ত দুঃখ কষ্টকে 'সিন্দুকে' জমা করে রাখতে পারেন সন্তানের মুখ চেয়ে আর এখানেই কবির কবিতায়

তাঁর জীবনীকথার সঙ্গে আমরাও প্রবল ভাবে একাত্মবোধ করি। কবির প্রবহমান জীবনে ছড়িয়ে স্মৃতিপ্রাবল্য যা কবির কবিতাগুলিকে অন্য মাত্রা দান করেছে বলা যায়, এ প্রসঙ্গে কবির আরও কয়েকটি কবিতাংশ তুলে ধরার মাধ্যমে বিষয়টির যথাযোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে—

> কিছুদিন আমি খুব একা বোধ করেছি একেলা/ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি ভারী দুঃখ পাই।/অরুণ, সুনীল, সুবিমল, সূর্যকিশোর, তাহের/আজ কয়েকটি নাম, শুধু নাম/মাঝেমধ্যে জোনাকির মত জ্বলে আর নেভে।/ধূসর কিশোর সব সহপাঠী কোথায় যে করেছে প্রস্থান।[৯] (ছেলেবেলা থেকে: এক ধরনের অহংকার প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫)

অথবা—"না তারা জানে না কেউ আমার একান্ত পরিচয়,/আমি কে কী করি সারাক্ষণ সমাজের চৌহদ্দিতে/কেন যাই চিত্র প্রদর্শনী, বারে, বইয়ের দোকানে,/তর্কের তুফান তুলি বুদ্ধিজীবী বন্ধুর ডেরায়/না, তারা জানে না কেউ।[১০] (আত্মপ্রতিকৃতি: রৌদ্র করোটিতে, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫)

এমনই নানা প্রকার কবিতার ছত্রে ছত্রে শামসুর রাহমানের জীবন ও তা সম্পর্কিত কথা নানাভাবেই উঠে এসেছে সে পোগজ স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে কাটানোর মুহূর্তের কথাই হোক কিংবা ছেলেবেলা থেকে চিত্র-চিত্রকরের দোকান, বইয়ের দোকান তাঁর যে প্রবল আকর্ষণের অন্যতম ছিল সে কথা প্রকাশেই হোক সর্বদাই তিনি নির্দ্বিধান্বিত এবং উচ্ছ্বসিত থেকেছেন পরবর্তীকালে কবি শামসুর রাহমানের কবিতার যে লেখনীধারা সেখানে রাজনৈতিক পটভূমি যতই স্পর্শ করুক না কেন কবি তাঁর জীবন ও জীবনযাত্রার প্রতি নিয়মিত গ্রহণ ও বর্জন যে চালিয়ে গেছেন উক্ত কবিতা গুলি তারই স্বাক্ষর বহন করছে, পঞ্চাশের কবিতার যে আত্মমগ্নতা আমরা ভারতীয় কবিদের ক্ষেত্রে পাই শামসুর রাহমান এর ক্ষেত্রে সেকথা ও প্রবণতা ভীষণভাবেই অর্থপূর্ণ, এক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের সঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষ গ্রহণযোগ্যভাবেই যেন তুলনীয় যা অবশ্য আলোচনা সাপেক্ষেই বিচার্য।

উৎসের সন্ধানে

১. শামসুর রাহমান : 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৫, পুনঃ মুদ্রণ-ডিসেম্বর ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১২৪
২. শামসুর রাহমান : 'কালের ধুলোয় লেখা' প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৪, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৭ অন্য প্রকাশ ঢাকা ৩৮/২ ক বাংলাবাজার-১১০০, পৃ. ৮
৩. তদেব : পৃ. ৭
৪. উৎস-১, পৃ. ২০
৫. তদেব : পৃ. ২৬
৬. উৎস-২, পৃ. ২৭-২৮
৭. উৎস-১, পৃ. ৫০
৮. তদেব : পৃ. ৫৬
৯. তদেব : পৃ. ১২৬
১০. তদেব : পৃ. ৩৭

তথ্যের সন্ধানে

১. শামসুর রাহমান : 'কালের ধুলোয় লেখা', তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, নভেম্বর ২০১৭

কবি মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় বিষণ্ণতাবোধ

শোভনলাল বিশ্বাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে রক্তাক্ত আলেখ্য নির্ণিত হতে থাকা বাংলা সাহিত্যের আঙিনার রূপ পরিবর্তনে আশির দশকের সঙ্গে নব্বই দশকের গুরুত্ব অপরিসীম। একাধারে সমষ্টির সমস্যার চাপে প্রজন্মের অন্তঃস্থল শুকনো হয়ে আসছিল। চার দেওয়াল থেকে বেরোতে পারার আনন্দ, সুখকে ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে তার সঙ্গে নিযুক্ত ছিল অব্যক্ত চাওয়া, আর অনুশাসনের ফলে দমে থাকা প্রজাপতি ইচ্ছে। ফলে অবসাদগ্রস্থ মনের ওপর বসন্তের হাওয়া লাগল আশি-নব্বই দশকে। প্রেমের পাশাপাশি অপ্রেমের কথা, আর ক্রমাগত না-পাওয়া থেকে অবসাদের উদ্যাপন করতে থাকে আত্মযন্ত্রণায় ভুগতে থাকে চিলেকোঠার একাকী মানুষটি। চেতন থেকে অচেতন মনে যার নিয়ন্ত্রণ কখনও থাকে নিজের হাতে আবার কখনও থাকে না। ফলে এইরকম উচাটন বৃত্তিতে পড়ে খুঁজে নিতে হয় আত্মমুক্তির পথ। আবার কখনও ডুবে যায় অবসাদের ঘুমে। কবি এমতাবস্থায় লেখেন—"সারাদিন বিছানায়/ধূ ধূ করে নোনতা অবসাদ/কোন মতে শুয়ে আছি/গড়ালেই চারিদিকে খাদ।"[১] গোটা দিনটা কবির কাটছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। মন খারাপের জন্য সবকিছু কেমন স্বাদহীন মনে হচ্ছে। নোনতা অবসাদে কবিকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, শূন্য করে দিচ্ছে। কবি তাই অনুভব করছেন এই যন্ত্রণার জন্য তার বাহ্যিক বোধ বিলুপ্ত হয়েছে। এটার জন্যই তিনি প্রধানভাবে কাতর। পাখি যেমন ডানায় ভর করে দুনিয়া জুড়ে উড়ে উড়ে বেড়াতে পারে, এই উড়ে বেড়ানোয় আছে আনন্দ আছে দুঃখ। যেমনটি দেখেছি কবি জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতায়—

হায় চিল, সোনালী ডানার চিল এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।[২]

এখানে চিলের কান্না যে বিষণ্ণতার সুর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে বলা হচ্ছে

হৃদয় খুড়ে বেদনা জাগানোর কথা তাতে করে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। কবি মন্তাক্রান্তা সেনও এই চিল নিয়ে 'চিলজন্ম' কবিতায় যে বিষণ্ণতাকে ফুটিয়ে তুললেন তার সঙ্গে মনের শূন্যতার যোগ ঘটে সেখানে উঠে এল—"দ্রুত ছিড়ে ফেলা রক্ত মুখ/গভীর অসুখী ডানা সারাদিন চক্রাকারে ঘোরে।"[৩] লক্ষ করার মতো শব্দ 'গভীর অসুখী ডানা' আসলে কিসের অসুখ বহন করছে অসুখ তো মনের। মন যেদিকে চায় সেদিকে পাখি ডানা মেলে ওড়ে। বিষণ্ণ মন নিয়ে পাখির ডানা মেলে ওড়া আসলে নির্থক। জীবন অন্য কথা বলে। জীবনে চলে একটা পর্যায় থেকে আর একটা পর্যায়ে পালাবদল। কবিতায় উদ্দিষ্ট বালক এই চিল জন্মের অধিকারী।

জীবনে যখন স্মৃতিগুলো চেপে ধরে যখন মনকে অশান্ত করে তোলে তখন নিজের একাকী সত্তা থেকে পালানোর পথ খুঁজে নিতে চায় মানুষ। সমস্ত জিজ্ঞাসার বাইরে থাকতে চেয়ে কাটাতে চায় মুহূর্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আদৌ কি পারা যায় এই নিঃসঙ্গতা যাপন যখন একে একে পুরোনো মুখগুলো সামনে এসে দাঁড়াবে তখন কী হবে এসব প্রশ্ন মনে আসে মনে, আসে এইসব ভেঙে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের কথা। এজন্যই আমরা শুনতে পাই—

> পুরনো সম্পর্কগুলো সার বেঁধে দেখা করতে আসে;/ভেঙে যাওয়া ভুলে যাওয়া অসফল সম্পর্ক সকল/ছায়া হয়ে ঘিরে ধরে ঠিক যেন ভাসমান ভিড়/আমি পরিত্রাণ চাই।[৪]

'পরিত্রাণ' শব্দটি ব্যবহারে কবি ইচ্ছাটাকে তীব্রভাবে জোর দিলেন আর ফিরে পেতে চান না এই মুখগুলোকে, সম্পর্কগুলোকে। যার জন্য পরিত্রাণ চাওয়া মেয়েটি পূজার নতুন শাড়ির গন্ধ মেখে প্যান্ডেল থেকে পালিয়ে নির্জন দুপুরে তিন তলা ঘরের অভিমুখে যাত্রা করেছে শুধুমাত্র নিজের কাছে পৌঁছবে বলে। কবি পারছেন না স্মৃতি মুছে ফেলতে। কখনও কি পারা যাবে সেই অসীম আনন্দ ছুঁয়ে জীবনকে নতুন ভাবে নতুন পথে চালনা করা 'একা, একা তিন' কবিতায় দেখি কবি বলছেন'একা থাকা ভালো নয়'। মনে হচ্ছে যেন এই কথাটি কবি নিজেই নিজেকে বলছেন। এই আত্মকথনের মাঝে শুধু একটি মুখ ভেসে ওঠে যাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেও অপারগ হয়ে যাচ্ছেন কবি। তাই কবি লিখছেন—"তবুও কি একটা নাম, ফেলে আসা, ভেঙে যাওয়া মুখ/মন থেকে এখনো ঝরলো না।" 'এখনো ঝরলো না' শব্দটির ব্যবহার দেখে মনে হয় কবি কি চেষ্টা করে চলেছেন এইসব মুখগুলোকে ঝরিয়ে ফেলতে চেতনার কোঠায় এই মুখগুলোকে বসন্তের ঝরা পাতা হয়ে থাকবে এমনটাই দেখতে চেয়েছি কি আমরা এর উত্তর আমাদের কাছে নেই শুধু এটা প্রকাশ পাচ্ছে কবি এই মুখগুলোকে ঝরাতে পারেননি বরং তারা সবাই না হলেও কয়েকজন বিশেষত একজন কবির মনের মধ্যে আজও বেঁচে আছে। এই একা থাকার মধ্যে নিঃসঙ্গতা কতখানি তার খোঁজ নাই বা পেলাম কিন্তু এই যে একের মধ্যে অনেকের সম্মেলন বা একের অধিকের সম্মেলন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই জন্যই প্রথমে বলে রেখেছেন 'একা থাকা ভালো নয়'। কবি তাই কখনও কখনও অবসাদ, ঈর্ষা, ভয় এগুলো ব্যতিরেকে খুঁজে চলেন পরিচিত মুখ। পরিচিত মুখের জন্য তার আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে। কবিতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বিষণ্ণতার, অবসাদের উত্থাপনে নির্জন দুপুরকে বারবার তুলে ধরেছেন প্রতীকী অর্থে।

নির্জন দুপুর আসলে অনেক কথা, অনেক যন্ত্রণা, অনেক অভিমানের সাক্ষী হয়ে আছে। সাক্ষী হয়ে আছে বিষণ্ণতার সুর মাখা ভরদুপুরের স্বপ্নগুলো। কবি খুঁজে পান এই দুপুরের একাকিত্বে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। কখনও এই বিষাদের রং শ্যামলাবরণ ধারণ করে। যে বরণটি মালয়ালি একটি মেয়ের ভুরুর উপরের কাটা দাগের মতো। যে বিষাদে ধর্ষণ আর হত্যার নৃশংসতা মেখে আছে সেই

বিষাদের মাঝে কবি থাকতে চান না। যেখানে পোস্টম্যান বিষণ্ণ সাইকেল ঠেলে ঠেলে চলে যায় একটার পর একটা বাঁক ঘুরে। কবি অনুভব করেন এই যাতনা, এই ক্ষত। তাই অকপটে বলেন"ভাসতে ভাসতে পেরোবো বসতি বন্দর/ধর্ষণ আর হত্যার ভূমিখণ্ড।" কবি চাননি এই নৃশংসতার মধ্যে থাকতে। মাথার মধ্যে সবসময় ঘটে চলেছে নানারকম ভাবনাচিন্তা। কবির 'বিষণ্ণ কবিতাগুচ্ছ' কাব্যের কবিতাগুলি এই বিষাদ চেতনার ফল। কবিতাগুলির মধ্যে চেতনার পরিস্ফুটনে জল, মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে বারে বারে। কাব্যের মধ্যে একটি মেয়ে জীবনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকে। সাংসারিক কাজে কর্মে তায় মগজ, ঘিলু, রক্ত, হৃদপিণ্ড, চোখ, প্রভৃতির সঙ্গে রান্নাবাটির সম্পর্ক তুলে ধরলেন। তুলে ধরলে দৈনন্দিন জীবনের নানান রিক্ত উপাদানগুলোকে। আসলে ঘরের মধ্যে আটকে থাকা মেয়েদের জীবনের অধিকাংশ সময় কেটে যায় এই রান্না ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। নিজেদের নানান চাওয়া পাওয়াগুলিকে নিত্য আহুতি দেয় রান্নার আগুনে। যে আগুন দিয়ে বিষণ্ণমনে অন্ন রান্না হয়। যে মেয়েটি শেষরাতে নিরিবিলি ছাদে একলা পদচারণ করে, যে মেয়েটির কান্না শুধু দেখে আকাশের তারা, যে মেয়েটি সাগরের তটে হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করে জলের গন্ধ বড় বিষণ্ণ, সেই মেয়েটিই বলে ওঠে—"সে বারিষ তো বারিষ তো নয়, অশ্রুকণা/সে জলের খবর তোমরা কেউ রখো না/যেখানে গল্প শুরু, সেখানে শেষ/এ শহর পেরিয়ে আছে আমার স্বদেশ।"[৫]

একই বিন্দুতে শুরু এবং শেষের খেলা চলে। চোখের জল রূপ নেয় অঝোর বৃষ্টির ধারাপাতে। এক অচেনা অজানা জগৎ এই মেয়েটি খুঁজে নিতে চায়, যেতে চায় তার প্রিয় নির্জনে। যে দেশ শহরের বাইরে, কবি 'সীমান্ত শহর' কবিতায় জানিয়েছেন—"মন খারাপ হলে কোন সীমান্ত শহরে চলে যাব/চোখের সমুদ্র থেকে সরে সরে যাবে ধান ক্ষেত।" এই মন খারাপ, এই কষ্ট পাওয়া, কান্না এসবের থেকে দূরে থাকতে চান তিনি।

মন যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমস্ত কিছুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয় তখন শূন্যতা গ্রাস করে। না-পাওয়া উত্তরের মাঝে বেপথুভাব সদা জাগ্রত থাকে। অনিশ্চিত জীবনের এই রূপ যাপনচিত্রে লেগে যায় পুরুষ্টু ও শাঁসালো বিষাদ। যার ফলে চাঁদকে মনে হয় চুয়া ঢেকুরের মতো। ফলে নিরন্তর বিষাদ লেগে নারী হয়ে ওঠে ডাকিনি, হয়ে ওঠে কালীর এক রূপ। কবি জয় গোস্বামী 'গোঁসাইবাগান' এর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন কালী, কলহান্তরিতা, স্বপ্নরূপেণ কবিতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—"প্রেমের তীব্র আনন্দ ও বিষাদ, অন্ধকার ও আলোময় জীবনতৃষ্ণার পাশাপাশি, আত্মধ্বংসের বাসনাও রয়ে গিয়েছে মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায়।"[৬]

কবিতা গুলির আলোচনাকালে দৈনন্দিন ঘরকন্নায় যে তখন রান্নাবাটি করে মনের বিষাদ মাখিয়ে। মনের মধ্যে যে যন্ত্রণা, দুঃখ, রক্তক্ষরণ তার সহযোগে সংসার চালায় নারী। আগুন ধরায় উনুনে সেই লেলিহান বিষাদাগ্নি দিয়েই। দিনের শেষে কবি ফিরে আসেন নিজের ঘরে। যে ঘরে চার দেওয়াল জুড়ে শুধু লেগে আছে একাকিত্ব। শূন্যতার আবহে জীবন যেখানে মৃতপ্রায়। লড়াইয়ের ছবির পাশাপাশি উঠে আসে আত্মমুক্তির ছবি। 'মেসেজ' কবিতায় দেখি চিঠি লেখার প্রসঙ্গ। এই চিঠি লেখা হচ্ছে আসলে নিজেকেই। 'স্ত্রীর পত্র' তো ছিল এই মুক্তির কথাতেই নিহিত। কবি লিখছেন—"সেই খাম ঠিকানা বিহীন/এভাবেই কেটে যাবে দিন/নিজেকেই চিঠি লিখে লিখে।"[৭] এই চিঠি পাঠানোর ঠিকানা নেই ফলে প্রতিনিয়ত যে দুঃখ যন্ত্রণার কথা মনের বিকল অবস্থার কথা লিখিত হচ্ছে সাদা কাগজে তাই ছাপ ফেলে যাচ্ছে মনের গভীরে। কোনোভাবেই এই নির্জনতা,

একাকিত্ব ঘোচে না। আছড়ে ল্যাপটপ ভেঙে ফেলে। বন্ধুদের পাঠানো মেসেজ, শহরের দশ বাই বারো মাপের কামরার বন্ধ জীবন, চার দেওয়াল বিষণ্ণতার রূপ ধরে কাঁধে হাত রাখে। কবি লিখছেন—'শোনো কথা আছে' কাব্যগ্রন্থের 'সাড়া' কবিতায়—"এভাবেও কেটে যায় দিন/মোবাইলে বেজে যায় রিং।" কবি এখানে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছেন। সাড়া-শব্দহীন জীবনযাপনে দিন কাটে। দিন কাটে এক ঘর অন্ধকারে। গোটা সংসার জুড়ে মনে হয় বিষণ্ণতায় একমাত্র সত্যি। কবি আসলে একা হয়ে যাচ্ছেন। সেখানে তিনিই প্রথম তিনিই শেষ। ফলে মনের নানা রকম অবস্থান থেকে নানা রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলেও আসলে সেগুলো নির্জনতা অসহায়তা ও একাকিত্বের সুর বহন করে চলেছে। যেখানে আনন্দ, উন্মাদনা, উল্লাস চাপা পড়ে যায়। জীবনের জলছবিতে আর কোনো রংয়ের দোলা লাগে না। লাগে শুধু নির্জন দুপুরের মতো নিঃস্ব একরাশ বিষণ্ণতা। ভালোবাসার রূপও তাই কবি যখন বুঝতে পারেন না, তখন লেখেন—"পিরীতি রে তোর চলনটি বোঝা ভার/হরষ হইতে বিষাদেতে যাস বেঁকে/পিরীতি তো, আহা, আমার সহিত তার/তবু একাকিনী এমন মরেছে কে কে।"[৮]

এই প্রেম, ভালোবাসা বিষণ্ণতার দিকে মুখ ঘোরায়। তাই 'মেঘলা তিথি' কবিতায় দেখি মন খারাপের মরশুম। মন খারাপ চেপে বসেছে, এই একাকিত্ব বড়োই করুণ। অভিমান এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে মিশে আছে মনের নানারকম ইচ্ছা, পাওয়া, না-পাওয়া। ফলে কবি মনে করেন এই বোধ ক্ষতিকারক। এ বিষাদভাব বিপদের সুর টেনে আনে। 'নিজস্ব নির্জনে' কাব্যগ্রন্থের 'শীতকালীন, দুই', 'বিষণ্ণ লেখা' কবিতাগুলির মূল সুর এই অবসাদ। যেখানে কবি লিখছেন—"থমকে থেমে আছে বিষণ্ণতা/অবসাদ ভরে অবনতা।" থমকে আর থেমে শব্দ দুটির পাশাপাশি ব্যবহার বিষাদভাবকে জমিয়ে তুলেছে। এতটাই গভীর ছাপ যে এর থেকে মুক্তির উপায় কী যে অসম্ভাব্যতার জন্য প্রাত্যহিক জীবনের মোড় ঘুরে যায়, ভুগতে থাকেন ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস রোগে। 'নিজস্ব নির্জনে' কাব্যগ্রন্থের 'বাইপোলার' সিরিজের কবিতাগুলি তারই নিদর্শন। অদ্ভুতভাবে এই কাব্যগ্রন্থটির নামের ক্ষেত্রেও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন লক্ষ করি। 'নিজস্ব নির্জনে' আসলে তো নিজের কাছে নিজের সঙ্গে একাকী কথা বলা, পথ চলার ইঙ্গিত বহন করে চলেছে। রাতের পর রাত জেগে জেগে মাথা থেকে স্বপ্নগুলো সরাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পুনরায় জেগে থাকে এই স্বপ্নগুলো, এই স্বপ্নের সাথে কবির চলে কথোপকথন। কবিকে পুনরায় রাতে আসতে বলে। দ্বিধাবিভক্ত দুটি সত্তা তখন মুখোমুখি বসে আলাপ জমায়। সেই আলাপের মধ্যে উঠে আসে না-পাওয়ার কথা, অসহায়তার কথা, বিচ্ছেদের কথা। 'নিজস্ব নির্জনে'র 'বাইপোলার, তিন' কবিতায় কবি লিখছেন—

> ভাবনাই তো আমার রোগ নিজে ভাবি অত কী ভাবিস/আমার ছেচল্লিশ তোমার লাজুক ছাব্বিশ/ছেচল্লিশ শীত আমি পেরিয়েছি তোমাকেই চেয়ে/আজকে বরফ গলে আমি এক বসন্তের মেয়ে।[৯]

এর মধ্যে মনের একঘেয়েমি লিপ্ত আছে। কবিতাটির মধ্যে শীতকাল আর বসন্তকালের দুটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে উপমার সূত্রে। এই শীত শরীরের মধ্যে জাঁকিয়ে থাকা স্থবিরতাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। তেমনি কবি তার প্রিয়কে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তাকে ভেবে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতার পথে ছেদ পড়ল বসন্ত এসে যাওয়ায়। এখানে জড়তা অভিমান, একাকিত্ব কান্নার মধ্যে দিয়ে গলতে শুরু করেছে। কবি হয়ে উঠছেন বসন্তের নতুন মেয়ে। আবারও নতুন হয়ে উঠবেন কবি নব

পাতার উন্মিলনে, নিজের নব প্রেমানুরাগের নিষিক্তকরণের মধ্যে দিয়ে। ভালোবাসার গ্রন্থিগুলো প্রেমের রাগ ক্ষরণ করে এইসময়।

ফলে একটা চক্র তৈরি হচ্ছে কবির কবিতায়। প্রারম্ভিক একাকিত্ব থেকে একঘেয়েমির দিনযাপন করে অবশেষে গভীর অবসাদ। মনের এরূপ ক্রিয়াশীলতা আমদের অবাক করে দিলেও এর মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে অবসাদ থেকে উত্তরণের সুরও বেজে উঠেছে কবিতায়। আসলে তাঁর কবিতা শুধু বিষণ্ণতার কথা বলে না। সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থা থেকে মুক্তির কথাও বলে। ঘোর অবসাদে ডুবে তিনি লিখে চলেন মুক্তির কথা, লেখাটাই মুক্তি। উঠে আসে তাঁরই কলমে আরেকটি বিষণ্ণতাবোধের কবিতা। যন্ত্রণার ভূমি থেকে আরেকটি কবিতা লিখতে পারাতেই মুক্তির স্বাদ খুঁজে পান তিনি।

উৎসের সন্ধানে

১. মন্দাক্রান্তা সেন : 'হৃদয় অবাধ্য মেয়ে', "বিষাদ ও অম্লুতাঞ্জন", আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ৪০

২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত : 'বনলতা সেন', অবসর, সূত্রাপুর, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ৩৫

৩. উৎস-১, পৃ. ৫১

৪. মন্দাক্রান্তা সেন : 'বলো অন্যভাবে,' "পুজো সিরিজের লেখা ৪", আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৩৮

৫. মন্দাক্রান্তা সেন : 'বিষণ্ণ কবিতাগুচ্ছ,' "স্বদেশ", ২ পরম্পরা প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৭

৬. জয় গোস্বামী : 'গোঁসাইবাগান' প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৯

৭. মন্দাক্রান্তা সেন : 'চাঁদের গলায় শালা দড়ি', "মেসেজ", সপ্তর্ষি প্রকাশন, শ্রীরামপুর, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৫৪

৮. মন্দাক্রান্তা সেন : 'পিরীতি', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৭

৯. মন্দাক্রান্তা সেন : 'নিজস্ব নির্জনে', "বাইপোলার তিন", প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৪৮

নিশীথ ভড়-এর কবিতার বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ

শুভম চক্রবর্তী

কবিতা এবং সময় সবসময় একে অপরের হাত-ধরে হাঁটে না। কখনও হাঁটে পাশাপাশি, কখনও সমান্তরাল না-মেলা রেখার মতো, কখনও কেন্দ্রানুগ, কখনও-বা কেন্দ্রবিমুখ জল-বুদ্‌বুদের মতো। কারণ সময়, খণ্ডার্থে যা ঘটছে তারই প্রতিভাসন, আর কবিতা শুধু যা ঘটছে তারই কোনো এক মেটের প্রতিমা নয়, কবির 'যা-হওয়া উচিত'-এই ঔচিত্যবোধও তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবে সময় ও কবিতার এক দ্বান্দ্বিক সন্দর্ভ রচিত হয়। নিশীথ ভড়-এর কবিতাকে বুঝতে এই দোরোখা দ্যোতনা খুব কার্যকরী বলে বোধ হয়। তাঁর 'কবিতা সংগ্রহ'-এর সূচনাতেই একটি গদ্যে কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল লিখেছেন—"বালক গরুড় পড়ছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল; দেখতে হচ্ছে সস্তার রংমাখা যৌনকর্মীদের।"[১] সময় ও কবিতার এই দ্বান্দ্বিক পরিসরকে আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করব নিশীথের কবিতায়। যেখানে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা এবং আদর্শবাদী বাস্তবতার এক 'দ্বন্দ্ব-সমন্বয়' ঘটেছে। 'দ্বন্দ্ব-সমন্বয়' শব্দবন্ধটি কিছুটা প্যারাডক্সের মতো শোনালেও নিশীথের রিয়াল অথচ মরমী আখর অনুধাবনের একটি প্রকৃত চিহ্নায়ক বলেই মনে হয়।

খুব বেশি লেখেননি নিশীথ ভড়, কিন্তু তাতেই অর্জন করেছেন বিশিষ্টতা। সাতের দশকের বাংলা কবিতায় তিনি একটি বিশিষ্ট পরিসরের পরিচায়ক। সমর সেনের কবিতায় আমরা আধুনিক নাগরিক অবক্ষয়ের যে আদিকল্পকে প্রত্যক্ষ করি, সেই আদিকল্পকে ধরেই নিশীথ ভড় অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু তাতে মিশেছে উত্তর-আধুনিক বীক্ষণ। এই উত্তরাধুনিকতা ব্যঞ্জনায় Post Modern-এর অনুরূপ নয়। নিশীথের ভড়ের উত্তরাধুনিক-বীক্ষণে প্রিয়বন্ধু এবং কবি অমিতাভ গুপ্তের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। 'উত্তর-আধুনিক কবিতা' এই আন্দোলনটির প্রবক্তা অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন ও বীরেন্দ্র চক্রবর্তী। অঞ্জন সেন অবক্ষয়িত আধুনিকতার বিপ্রতীপে সাত ও আটের দশকের উত্তর-আধুনিক কবিতার কতগুলি বৈশিষ্ট্যকে

সুচিহ্নিত করেছেন। যার মধ্যে ঐতিহ্যময়তা, সংযুক্তি এবং সামগ্রিকতার প্রসঙ্গটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আসলে আদিকল্পগতভাবে নিশীথের কবিতায় আধুনিক অবক্ষয়িত মূল্যবোধের জীবনচিত্র পরিলক্ষিত হলেও তাতে অন্তিমে আসে এক মরমিসহ-অনুভূতির প্রতিভাস, যা ঐতিহ্যময়তাকে স্বীকার করা উত্তর-আধুনিকতার একটি চিহ্নায়ক। এই মরমি সহ-অনুভূতির প্রসঙ্গেই একটি কবিতায় অবলোকন করা যাক। কবিতাটি নিশীথ ভড়-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নিজের পায়ের শব্দ'(১৯৮৪) থেকে—

> সারাদিন আমি এলোমেলো লোকের সঙ্গে/এলোমেলো কথা বললাম/সারাদিন যেন মর্মরের সঙ্গে একটা কাঁটাগাছের সন্ধি/এখানে প্রেত জন্মায়, মরে যায় এখানেই, শুধু মানুষ থাকে না।/কিছু করিডর আর বিজ্ঞাপন, কিছু ট্রাম আর কুকুরের ডাক।/তুমি এসময় এসো না, আরো রাত্রি হোক, শহর/ঢুকে যাক জরায়ুর ভিতর, আলো নিভে যাক/রাত্তিরে শুয়ে থাকতে-থাকতে আমি উঠে বসব যখন/তুমি/শান্তভাবে, তোমার গতজীবনের ধর্ষণের কথা বলো আমাকে।[২]

উপরিদ্ধৃত কবিতায় 'দ্বন্দ্ব-সমন্বয়' প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হবে। 'মর্মরের সঙ্গে কাঁটাগাছের সন্ধি'-এই সন্ধি মরমি কবিপ্রাণের সঙ্গে জান্তব পথবাস্তবতার। এই সন্ধি ধর্ষণের কথা শুনতে চাওয়া, শুনে সমমর্মী হতে চাওয়া কবিপ্রাণের। আর 'দ্বন্দ্ব-সমন্বয়'-এর প্রসঙ্গটি এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবক্ষয়িত আধুনিক নাগরিকতার আদিকল্পের সঙ্গে ঐতিহ্যময় উত্তর-আধুনিক বোধ ও বীক্ষণের দ্বিরালাপ আমরা তাঁর অনেক কবিতাতেই প্রত্যক্ষ করি। আর অবক্ষয়িত আধুনিক নাগরিকতাকেই কেন নিশীথের কবিমনের 'আদিকল্প' বলে বারবার উল্লেখ করছি তার উত্তরে বলা যায়—নিশীথের শৈশব কেটেছে যৌনপল্লির কাছেই এক পাড়ায়, তাই অবক্ষয়িত জীবনছবি শৈশবেই তাঁর নির্জনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এমন ভাবলে ভুল ভাবা হবে না। অন্তত তাঁর কবিতায় বারবার ঘুরেফিরে আসা যৌনপল্লির অনুষঙ্গ এই মন্তব্যের যথার্থতাকেই ইঙ্গিত করে। আর এই অবক্ষয়িত আধুনিক নাগরিক আদিকল্পেরই ভিন্ন একটি প্রতিভাসন আমরা প্রত্যক্ষ করব নিশীথেরই সমসাময়িক কবি ফালগুণী রায়-এর কবিতায়। আর নিশীথের কবিতায় পাই এক 'দ্বন্দ্ব-সমন্বয়' যারই অনুভাবনায় নিশীথ লেখেন—"যাকে কাছে পেতে চাই কোনোমতে তাকে না পেলেই/সংসার মায়াবী লাগে সুপ্রাচীন হিন্দুর মতন।"[৩] লক্ষণীয় এখানে 'মায়াবাদ' কোনো স্থিতপ্রজ্ঞ বিশ্বাসের নয়, এখানে 'মায়াবাদ' প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কার্যকারণে মণ্ডিত 'অভাব-বৈরাগী'র। আবার ঠিক তারপরের কবিতাতেই দেখি দ্রষ্টাসুলভ স্থিতপ্রজ্ঞ দৃষ্টিকোণ—"পথের চরিত্র থাকে পথিকের হয়তো থাকে না/যেভাবে আলোয় দেখি আলো আর আঁধারে আঁধার।"[৪]

এই আলোয় আলো দেখা এবং আঁধারে আঁধার দেখা একটি অনেকার্থদ্যোতক পঙ্‌ক্তি। তা যেমন কবির দ্রষ্টাসুলভ মনোভঙ্গিকে চিহ্নিত করে, তেমনই বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষভাবেই বাস্তবতা বলে গ্রহণ করার প্রতীতির জন্ম দেয়, যে প্রতীতি 'আইডিয়াল'-এর রঙিন চশমা খুলে ফেলার প্রতীতি। তরুণ বয়সে রচিত নিশীথের 'নিজের পায়ের শব্দ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে যৌবনের তীব্র সংবেগ ও বেদনাবোধের প্রকাশ গাঢ় হলেও আপ্তবাক্যের আদলে এসেছে প্রচ্ছন্ন দার্শনিকতা। যে দার্শনিকতায় সবকিছুর পরেও এক নিশ্চয়াত্মক নির্লিপ্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রেম ও ঈশ্বরহীন'-এ পাই Bisexuality-এর অনুষঙ্গ। যৌনানুভূতির প্রকাশে নিশীথ সহজ, অনাড়ষ্ট। তাঁরই সমসাময়িক ফালগুণী রায়-এর কবিতায় যৌনতা যেমন Dominant Discourse-এর পরিসর এবং পরিসর-ভাঙার দোরোখা নিয়ে উপস্থিত হয়। নিশীথের কবিতায়

যৌনতা এরকম কোনো Discourse-এর অঙ্গ নয়, নিতান্তই মানবিক এবং আত্মনিষ্ঠ, Monological বলা যেতে পারে। আর এই আত্মনিষ্ঠতা আত্মমগ্নতারই সারাৎসার, Hegemonist কোনো বয়নকে ভেঙেচুরে দেওয়ার অভিপ্রায় এখানে প্রত্যক্ষ নয়। নিশীথ ভড়-এর কবিতা প্রসঙ্গে বারবার ফালগুণী রায়ের কবিতার সঙ্গে তুলনায়, প্রতিতুলনায় যাচ্ছি কারণ এই কবিদ্বয়ের কবিমন আদিকল্পগতভাবে অবক্ষয়িত নাগরিক আধুনিকতারই প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও পরিশেষে ফালগুণী ও নিশীথের কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক মাত্রাগুলিকে আমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারব।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা' গ্রন্থের 'রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন---"যতদিন মানুষ তার নিজের ও চারদিককার আভাসপ্রকাশ সম্পর্কে ভেবে চলবে—ভাবনার কিনারা খুঁজে পাবে—সোজাসুজি তর্কে নয়, ভাষারও কম আয়াসে বেশি আলোকিত করবার শক্তির ভিতর ততদিন পর্যন্ত থেকে যাবে এসব কবিতা।"[৫] নিশীথের 'নিজের পায়ের শব্দ'-এর কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমরা জীবনানন্দের 'ভাষারও কম আয়াসে' শব্দবন্ধটির তাৎপর্য উপলব্ধি করব। যেমন নিশীথের 'তোমাকে' কবিতায় 'মর্মরের সঙ্গে কাঁটাগাছের সন্ধি' হয় 'ভাষারও কম আয়াসে'। নিশীথ ভড়-এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খেলার তুচ্ছে প্রতিমা' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মাত্র দু'বছর পরে। তাই সংগতকারণেই এই কাব্যগ্রন্থে কোনো বাঁকবদল আমরা প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু তীব্র সংবেগ ও আপ্তবাক্যাশ্রিত প্রচ্ছন্ন দার্শনিক উদ্ভাসন এই গ্রন্থেও পরিলক্ষিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের শিরোনামসূচক কবিতাটি পাঠ করা যাক—

> রাস্তা তো নয়, নালা নর্দমা ঢিবি/তারই মাঝখানে বসিয়ে মদের আসর/হল্লাও চলে, পুলিশেও মাঝে-মাঝে/হানা দেয়, আমি তার পাশে পড়ে আছি।/...পড়ে আছি, তবু, নিমেষী প্রগলভতায়/পেরিয়ে ডিঙিয়ে সব কিছু যদি কেউ/মাঠ ভাবে এই নয়-বাই-দশ ঘর/আমিই-বা কেন ছাড়ব কবিতা লেখা!/...লিখব এখনও যা হয়েছে তার বেশি/রয়েছে তোমার শিরায়-শিরায় তাকে কি/ছেড়ে দেওয়া যায়, যেখানে-সেখানে অযথা/যার-তার সাথে ঘুরতে-ফিরতে হয়রান/অতএব, চলো, গলির ভিতর গলিতেও/আরো গলি দিয়ে সোরগোল শেষে স্তব্ধ/এক মুহূর্ত, যেখানে মুঠোয় মিলছে/একটি শিশুর খেলার তুচ্ছে প্রতিমা।[৬]

উপরিধৃত কবিতায় আমরা কবিতার বাণী মূর্তি লাভ করাকে প্রত্যক্ষ করি নালা, নর্দমা, ঢিবি সরিয়ে। হল্লার থেকে দূরে 'নয়-বাই-দশ' ঘরে নিশীথের কবিতা লেখা। গলির ভিতর গলিতে, সোরগোলের শেষে এক বিনম্র স্তব্ধতায়, একটি শিশুর খেলার সরলতা নিয়েই তাঁর লেখা। 'আরো গলি দিয়ে সোরগোল শেষে স্তব্ধ' পঙ্‌ক্তিটি আমাদের মনে পড়ায়—'ভাষারও কম আয়াসে বেশি আলোকিত করবার শক্তি'র কথা, বলাবাহুল্য এই শক্তি শুধু আলোকসম্পাতের নয়, আঁধারসম্পাতেরও। পূর্বেই বলেছি নিশীথের কবিমনে অবক্ষয়িত নাগরিক আধুনিকতার আদিকল্প আছে, কিন্তু ঐতিহ্যময়তাকে তিনি অস্বীকার করেননি, তাই মায়াসিক্ত গৃহচ্ছবি তাঁর কবিতায় 'ফুলের মতো সহজ' হয়ে অবভাসিত হয়েছে—

> আমার বাবার অসুখ করলে মা যান মন্দিরে/তাঁর চোখের তারায়-তারায় কাঁপতে থাকা ভয়/সর্বাঙ্গে মেখে স্নান করেন পুরোহিত, আর সুদূর দেবতা/ধূপধুনোর ধোঁয়ায় নাচতে নাচতে নাচতে নাচতে/ভেঙে পড়েন শব্দে, ঘণ্টার শব্দে/বাগানের সব ফুল নত হয়ে আরোগ্যের অনুমতি দেয়, আর/মা অল্পবয়সীর মতো রাঙা হয়ে বাড়িতে এসে আলতা পরেন অনেকদিন পর।[৭]

এই কাব্যগ্রন্থের 'অভিমান' কবিতায় আমরা দেখি 'শাঁখ' যে সন্ধ্যায় বাজানো হয় না তাতে কবির স্পষ্ট 'অভিমান' জেগে থাকে। এই অভিমানই তাঁকে উত্তর-আধুনিক বীক্ষায় উত্তীর্ণ করে। অবক্ষয়িত আধুনিকদের মতো তিনি স্বস্থানচ্যুত নন, তাই সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধ তাঁর কবিতায় আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রায়শই। এই মূল্যবোধই আর পাঁচজন অবক্ষয়িত আধুনিক নাগরিকের থেকে তাঁকে 'অপর' করে। আর এই অপরতার বোধই তাঁর লেখায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে পরম মমতায়, যে মমতা উত্তর-আধুনিক বীক্ষায় 'সমন্বয়ী' ও 'সামগ্রিকতা'-নির্ভর, সে মমতাই অবক্ষয়িত ইউরোসেন্টিক মনোভঙ্গি থেকে 'অপর' করে রাখে 'খেলার তুচ্ছে প্রতিমা'র কবিকে। আদিকল্পগতভাবে অবক্ষয়িত আধুনিক নাগরিকতার হয়েও তাই তিনি লিখতে পারেন 'ঋণ' কবিতাটি—

> তোমার শরীরের আলো এসে পড়ুক আমার চোখের ওপর/আমার অন্তরাত্মায়/আর অল্পে-অল্পে জেগে উঠুক ছোটোবেলার সকাল/সূর্য ওঠার আগে শুকতারার শুচিতার কাছে ঋণ/ওগো মেয়ে, তোমার দু'হাতের অঞ্জলিতে/মনে পড়ল নীলিমাময় শান্তিপ্রতিমা/আর আমার আনন্দ চতুর্দিকের হাওয়ায় হাওয়ায়/বাজিয়ে তুলছে নিবেদনের গান।[৮]

নিশীথ ভড়-এর তৃতীয় এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ 'তীর্থসংহার' প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। এই কাব্যগ্রন্থের 'তীর্থসংহার' নামক দীর্ঘকবিতাটির পূর্বনাম ছিল 'জবাকুসুমসঙ্কাশ'। কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' কবিতার প্রতিবাচন বলা যেতে পারে। কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল এই দিকটিতে আলোকপাত করেছেন—'রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির হজম না হওয়া ধাক্কায়'[৯] নিশীথ 'তীর্থসংহার' নামক কবিতাটি রচনা করেন। নিশীথের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'তীর্থসংহার'-এর কবিতাগুলিকে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল 'যুক্তিহীনভাবে শান্তায়নবাদী' বলে অভিহিত করেছেন। তবে এই 'শান্তায়ন' শুধুই আকস্মিক চিত্তবিকারের ফল নয়, এর পূর্বসূত্র ছিল বলেই কবি অমিতাভ গুপ্ত নিশীথ ভড়কে 'সন্তাপের কবি' নামে অভিহিত করেছিলেন।

নিশীথ ভড়-এর 'শ্রাবণের লোপামুদ্রা' কবিতা প্রসঙ্গে কবি জয় গোস্বামী তাঁর 'গোঁসাইবাগান' গদ্যগ্রন্থে লিখেছেন—"এই শ্রাবণের লোপামুদ্রা যে মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের পূর্বসূরী তাতে আমি সন্দেহ করছি না।" আর একটি কবিতা পড়ে আমার 'শ্রাবণের লোপামুদ্রা'র কথা মনে পড়ে, সেটি কবি রণজিৎ দাশ-এর 'সম্বোধন'। আসলে নিশীথ, রণজিৎ, জয় বাংলা কবিতায় প্রায় একই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আর সেই সময়ই সানুপুঙ্খতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁদের কাব্যদর্পণে, আর অবশ্যই তাতে চিত্রিত হয়েছে সময় ও কবিতার দ্বান্দ্বিক সন্দর্ভ।

নিশীথ ভড় খুব বেশি লেখেননি। যা লিখেছেন তার প্রায়ই সবই প্রকাশিত (পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের মতে মস্তিষ্কব্যাধিতে ভোগার সময় নিশীথ 'অসম্পূর্ণ দুটি উপন্যাস, আটটি ছোটোগল্প এবং দুশো সত্তরের বেশি কবিতার পাণ্ডুলিপি আগুনে দিলেন')। নিশীথ ভড়-এর 'কবিতা সংগ্রহ'-এর 'অগ্রন্থিত কবিতা' অংশে মাত্র চারটি কবিতা সংকলিত হয়েছে, যেগুলি যথাক্রমে 'অন্বিষ্ট', 'ঋতুপর্ণা', 'নিশান', 'বারবেলা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এই অংশের প্রথম কবিতা 'মাসীমা' যেন 'আটবছর আগের একদিন' কবিতার একটি প্রতিসন্দর্ভ। 'প্রতিসন্দর্ভ' এই অর্থে যে—"অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—/আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়।" জীবনানন্দের কথক সাংসারিকতার ঊর্ধ্বে 'বিপন্ন বিস্ময়'-এর রোমান্টিক প্রণোদনায় আত্মনাশ করলেন। এই প্রণোদনায় অন্তত 'বিপন্ন বিস্ময়'-এর অ-দেখা, না-শোনা, না-শোঁকা একটি অদৃশ্য আশ্বাস আছে, কিন্তু নিশীথ ভড়-এর 'মাসিমা'র

বেদনা আরও বস্তুনিষ্ঠ বর্গায়তনের প্রত্যক্ষ ভূমিতে, তার মৃত্যুও ততোধিক ভয়াবহ, কারণ তাঁর মৃত্যুর পর নেই কোনো লাশকাটা ঘরের বস্তুস্পর্শ এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বেও নেই কোনো 'প্রেম ছিল, আশা ছিল'-এর দৃশ্যমান জীবনচিত্র। নিশীথ ভড়-এর মাসিমার আছে সুমহৎ নাস্তিক্য, সত্তাশূন্য এক ভয়াল থাকা আর থাকার না-থাকা। তাই—

> মুখে তাঁর রহস্যের নীল আভা, কেরোসিন কুপি নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে/মাথায় জ্বালান মদ, আগুনের আলিঙ্গান, আহা নাচ সমস্ত শরীরে/এমনটি সেজেছিল রক্ত যেন সেই দিন, ফুলশয্যা প্রথম বিস্ময়/বহুদিন বাদে প্রৌঢ়া মাসিমার আলিঙ্গান, আহা সুখ, আলো মৃত্যু নাচ/ এমন পুড়িয়ে দেয় হৃদয়ে কম্পন ওঠে, চুলে-স্তনে-যোনি ও গ্রীবায়/এমন পূজার স্তব, আর কেউ করেছিল কোনোদিন শরীর আঘ্রাণে![১০]

এই গদ্যের প্রথম পরিচ্ছদে যে 'দ্বন্দ্ব-সমন্বয়'-এর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলাম তা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। আদিকল্পগতভাবে অবক্ষয়িত আধুনিক নাগরিকতার প্রসঙ্গটিও বারবার উল্লেখ করেছি কিন্তু লক্ষণীয় আধুনিকতায় যেভাবে 'বিস্ময়বোধের অবলুপ্তি' চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে নিশীথের কবিতায় তা পরিলক্ষিত হয় না। নিশীথ 'আলতা পরা পা' দেখেও বিস্ময়ে আবিষ্ট হন। আর এখানেই উত্তর-আধুনিক বীক্ষণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। কবিতায় বিস্ময়বোধের প্রসঙ্গে কবি বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> কবি হঠাৎ, হঠাৎই ঢুকে পড়েন গভীর ধ্যানলোকে। ঘুরে ঘুরে দেখেন তাঁর চৈতন্যের প্রতিটি বাঁকে লুকিয়ে থাকে যুগযুগান্তরের এই বিস্ময়, যা সৃষ্টি হয়েই আছে, তিনি আবিষ্কার করেন, মুগ্ধ হন আর ভাষার উপকরণ দিয়ে মূর্তি গড়ে প্রকাশ করতে চান সেই অপরূপ সৌন্দর্য। যিনি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, রচয়িতা তিনিই সৃষ্টি করেছেন সেই সৌন্দর্য স্বরূপ কাব্যলোক; কবি তাঁকে দেখেন মগ্নতায় আর লিপিবদ্ধ করেন।[১১]

নিশীথ ভড়-এর কবিতাতেও আমরা অনুরূপ বিস্ময়বোধের দ্যোতনা প্রত্যক্ষ করি। External Reality আমাদের মনে ছায়া ফেলে না এমন নয়। হিউম্যান জিওগ্রাফার Yi- Fun Tuan তাঁর 'টোপোফিলিয়া' ও 'টোপোফোবিয়া' প্রতর্ক দুটিতে মানবমনে স্থানের সুপ্রভাব এবং কুপ্রভাব-এর প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। সমসাময়িক কলকাতার অবক্ষয়িত অংশের মিশ্রণ-বিমিশ্রণে নির্মিত হয়েছে নিশীথ ভড়ের কবিমনের বহির্মুখ। তাই তাঁর কবিতায় গণিকা, অন্তঃসারশূন্য সম্পর্ক, ধর্ষিতা নারী, দালাল, সোনাগাছি প্রভৃতি অনুষঙ্গ বারবার এসেছে। আর তাঁর কবিমনের অন্তর্মুখ নির্মিত হয়েছে মরমি সৃজন আকুলতার শতজলঝরনায় এবং এই মরমি-প্রবণতাই তাঁর কবিতার বয়নকে স্বগতোক্তিনির্ভর করেছে। তাই—"নিজের দরজার সামনে কাঠ হয়ে এই প্রশ্ন কাঠকে করেছি।"[১২] লক্ষণীয় 'কাঠ হয়ে' শব্দবন্ধটি, কাঠ হওয়া অর্থাৎ আড়ষ্টতা, জড়তা। এই আড়ষ্টতা, জড়তা তাঁর কবিতার স্বগতোক্তি নির্ভরতার দিকটিকেই দ্যোতিত করে। এমনকী তাঁর কবিতায় যখন 'অপর'-এর উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখনও এমন সাংকেতিক নির্জনতা নির্মিত হয়, যে 'অপর'-এর সঙ্গে কবির 'আত্ম'র কথোপকথনও হয়ে ওঠে শেষত 'আত্ম'র সঙ্গে 'আত্ম'রই কথোপকথন। যেমন 'তোমাকে' কবিতাটিতে আমরা দেখি—সারাদিন এলোমেলো লোকের সঙ্গে অপমানজনক সন্ধি করার পর, রাত্রে, কবিতার 'তুমি'র কাছে গতজীবনের ধর্ষণের কথা শুনতে চাওয়া যেন নিজেরই প্রাণের কাছ থেকে অপমানজনক সন্ধিগুলির বিষয়ে নিজেরই স্বগতোক্তি শোনার চেষ্টা। আর এই শুনতে চাওয়াকে তীব্র ব্যঞ্জনাময় মনে হয় যখন পড়ি—

পথেরই চরিত্র থাকে পথিকের হয়তো থাকে না/যেভাবে আলোয় দেখি আলো আর আঁধারে আঁধার,/ ঘুরি কিছুক্ষণ আর তারপর ঘরে ফিরে আসি/নিজের পায়ের শব্দ হয়ে ওঠে শান্ত অস্বীকার।[১৩]

এই 'শান্ত অস্বীকার' আসলে 'মর্মরের সঙ্গে কাঁটাগাছের' অপমানজনক সন্ধি এবং 'গতজীবনের' মর্মবেদনাকে অস্বীকার করা। 'শান্ত' শব্দটি লক্ষ করার মতো। 'আত্ম'র সঙ্গে 'আত্ম'র স্বগতোক্তি বলেই অস্বীকারটি শান্ত। 'নিজের পায়ের শব্দ' এখানে 'আত্ম'র বয়ান। যে বয়ানেই কবি অস্বীকার করেন অহেতুক যূথ-আক্রমণের প্রকল্পগুলিকে। আর 'নিজের পায়ের শব্দ'ই হয়ে ওঠে কবির 'পরম'। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' বা জীবনানন্দের 'প্রাণের কাছে', তেমনই। বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ-এর 'দ্বন্দ্ব-সমন্বয়'-এ এভাবেই নির্মিত হয়েছে নিশীথ ভড়ের কবিতাপৃথিবী।

উৎসের সন্ধানে

১. নিশীথ ভড় : 'কবিতা সংগ্রহ', রাবণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৫
২. তদেব : পৃ. ৫০
৩. তদেব : পৃ. ৫১
৪. তদেব : পৃ. ৫২
৫. জীবনানন্দ দাশ : 'কবিতার কথা', সিগনেট প্রেস, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মার্চ ২০১৬, পৃ. ৮৩
৬. উৎস-১, পৃ. ৬৩
৭. তদেব : পৃ. ৬১
৮. তদেব : পৃ. ৬৪
৯. তদেব : পৃ. ১৫
১০. তদেব : পৃ. ৯৩
১১. বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় : 'কবি... তার অভিযাত্রা', ছোঁয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৪২
১২. উৎস-১, পৃ. ৫২
১৩. তদেব : পৃ. ৫১

‘শতভিষা’ : বাংলা কাব্যজগতের একটি উত্তরণ

ঋদ্ধি পান

তরুণ কবির স্পর্ধায়’ কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন—“যথার্থ উত্তরসূরী যিনি, তাঁর তো চাই বৃত্ত ভাঙার ঝোঁক। এই বৃত্ত বা স্কুলের বাইরে তার চাই নিজস্ব কোনো পথ। তিনি খুঁজে পেতে চান তাঁর অদ্বিতীয় নিজের স্বর অদ্বিতীয় নিজের ঘর।” বাংলা কাব্যজগতের এমন পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস যে সেই মহাকাব্য লেখার ইতিহাস বা প্রাচীন লেখা গাথা থেকেই শুরু হয়ে গেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাও বারবার এর উল্লেখের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ—(ক) সময়ের ধারাবাহিকতা বা গতিপ্রবাহমানতা, (খ) নতুনত্বের প্রকাশ, যা আরও নতুনকে জায়গা করে দেয়।

বাংলা কাব্যজগতের ইতিহাসে ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ে কবিতার বিষয়, আঙ্গিকের বদল যেন বেশি করে ছিল। প্রথমত, সেইসময় প্রাতিষ্ঠানিকতা কোথাও গিয়ে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে দিতে চাইছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছিল। সাহিত্যের সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছিল। তাই লিটিল ম্যাগাজিনের প্রচলন শুরু হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় এই ক্ষুদ্র প্রক্রিয়ায় চালু লিটল ম্যাগাজিন ক্রমে ক্রমে বড়ো নামকরা সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত হতে শুরু করে। ‘শতভিষা’ তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ‘শতভিষা’ শুরু করেছিলেন আলোক সরকার এবং দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। এদের মধ্যে আলোক সরকার তখন সদ্য বিএ পাশ করা বেকার যুবক এবং দীপঙ্কর দাশগুপ্ত দৈনিক গণবার্তায় সাংবাদিকতা বিষয়ে শিক্ষানবিশী করে অল্প অর্থ রোজগার করা যুবক। অল্প অর্থে পত্রিকা চালু করার উদ্দেশ্যই ছিল—“ ‘শতভিষা’র প্রথম পরিকল্পনার সময় আমরা যে উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছিলাম তার মৌল কোন পরিবর্তন ঘটল না। কবিতার কাগজ বার করতে হবে যার লক্ষ হবে শুধু কবিতাই?”[১] এর একটু পূর্ববর্তী ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকা। পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা কবিতাকে স্থানই দিতেন না স্বতন্ত্রভাবে। গল্প বা উপন্যাসের শেষ

অংশ হিসাবে জুড়ে দিতেন। কবিতাকে একক স্বতন্ত্র রূপ দিতেই 'কবিতা'র প্রকাশ হয়েছিল একদিন কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকায় তার গদ্য কবিতার প্রকাশ, গদ্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র বা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতান্তর হয় এবং তাঁরা 'কবিতা' থেকে বেরিয়ে আসেন। 'নিরুক্ত'র মত পত্রিকা প্রকাশ পায় যেখানে নবীন প্রবীণ সব কবিরাই লিখেছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' বহু আগে প্রকাশিত হলেও—"৫০-৫১ এর দিনগুলিতেই এর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি।"[২] 'পূর্বাশা', 'নিরুক্ত', 'অগ্রনী', 'পরিচয়', 'একক' এবং 'কবিতা' অনেক পত্রিকা পেরিয়ে আসতে হয়েছিল 'শতভিষা'কে। 'শতভিষা'য় খোঁজা হচ্ছিল "কবিতার এক শুদ্ধ স্বত্তা।" সম্পাদক আলোক সরকার লিখেছেন—" 'শতভিষা' তরুণ কবিদের মুখপত্র নয়; প্রবীণ কবিদের মুখপত্র নয়, কবিতার ব্যাপারে বয়স বিচার হাস্যকর; 'শতভিষা' কবিতারই মুখপত্র, যে কবিতা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে না, ফ্যাশনের দাসত্ব করে না, হুজুগে মাতে না, যে কবিতা ব্যাক্তিত্ব চিহ্নিত, একই সঙ্গে সৌন্দর্যময় অপূর্ব এবং অ-পূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমতার প্রজ্ঞা প্রমাণ করতে সক্ষম।"[৩] ১৯৫১ সালে প্রকাশিত এক ফর্মার কাগজ, সূচিপত্র নেই, পাতার নম্বর নেই তাও তার প্রতি অসংখ্যের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা ছিল—

> এ-সব ১৯৫১ সালের ঘটনা, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। 'শতভিষা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলফা কাফেতে হৈ হৈ পড়ে গেল, আমাদের অগ্রজ কবিরা, আলফা কাফের বাইরের তরুণ কবিরা অভিনন্দন জানালেন।[৪]

ছোট্ট চায়ের দোকানের আড্ডা থেকেই উঠে এসেছে 'শতভিষা'। যাদের মধ্যে ছিল সংগীতজ্ঞ, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, রাজনীতিজ্ঞ। মহীশূর রোডের মোড়ের সেই চায়ের দোকান যে বিখ্যাত হয়ে উঠবে তা কেই বা জানত। 'শতভিষা' প্রকাশের পরপর রোহিন্দ্র চক্রবর্তীর 'কবিতাপত্র', সত্যেন্দ্র আচার্য ও অমিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সব শেষের কবিতা' এবং ভূমেন্দ্র গুহরায় ও স্নেহাকর ভট্টাচার্যের 'ময়ূখ' প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দ বাগচী, দীপক মজুমদার ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা—

> 'শতভিষা' প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ষোলো পাতার কবিতা কাগজ যে কতো প্রকাশিত হয়েছিলো তার হিশেব-নিকেশ করে কুলিয়ে ওঠা যাবে না। আজ আর এ-কথা স্বীকার করতে কষ্ট হয় না, পঞ্চাশের পর বাংলা কবিতা আন্দোলন এই সমস্ত ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে, কোনো বানিজ্যিক পত্রিকার সহায়তা লাভ অথবা মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন অনুভব করেনি।[৫]

কোনো পত্রিকাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব প্রথম থেকেই কী নিপুণভাবে পালন করেছেন 'শতভিষা'র সম্পাদকগণ তার কথা স্বীকার করতেই হয়। সাহায্য পেয়েছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার সরকার, জীবনানন্দ দাশের মতো উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠিত কবিদের থেকে। এঁনারা এই পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত লিখেছেন, পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন নানাভাবে। একটি উদাহরণ—"অদ্ভুত কাছে টেনে নেবার কাছে টেনে নেবার ক্ষমতা বীরেনদার, 'শতভিষা'কে তিনি সহজেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। ঠিক এইরকমই 'শতভিষা'র নিকটজন ছিলো শংকর চট্টোপাধ্যায় আর সত্যেন্দ্র আচার্য।"[৬]

নতুন কবিদের মধ্যে এলেন বটকৃষ্ণ দে, রবীন্দ্র বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র আচার্য, কবিতা সিংহ। এসেছিল ইস্কুলের ছাত্র মানস রায়চৌধুরীর কবিতা। পাওয়া গিয়েছিল আলফা কাফের অনেক ভিড়ের মধ্যে তরুণ কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়, সুধেন্দু মল্লিকের লেখা। 'শতভিষা'র তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের আগে

'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা 'আমার ঠাকুমা' সংগ্রহ করা হয়। ১৯৫২-র শেষদিকে পঞ্চম সংকলন প্রকাশের আগে 'শতভিষা' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজনের কবিতা পায়। পরের সংখ্যাগুলোতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং শঙ্খ ঘোষের লেখা পাওয়া যায়। শঙ্খ ঘোষের লেখা পাওয়াইয়ার প্রসঙ্গে আলোক সরকার জানিয়েছেন—"আমরা তাঁর কবিতা পেতে চাইতুম কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না, তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করতে করতেই 'শতভিষা'র অনেকগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে গেল।"[৭] উৎপল কুমার বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদারের কবিতাও প্রকাশিত হয়। 'বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা'য় অরুণকুমার সরকার বলেছেন—"আধুনিক জীবনের বাইরের উপকরণ—যন্ত্র, শহর, শোষিতের সংগ্রাম, বিকৃত যৌন আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি, এঁদের কাব্যের উপজীব্য নয়। অথচ একটা সুস্থ মানব—সম্বন্ধের উত্তাপ এঁদের কবিতায় সার্বজনীন।"[৮] তিনি এও উল্লেখ করেন পত্রিকাটির বিজ্ঞাপনের তেমন কোনো দায় ছিল না। হয়তো বিশুদ্ধ কবিতা প্রকাশের আদর্শচ্যুতি ঘটাতে চাননি শতভিষার পরিচালকবর্গ। যারা লিখেছেন তারাই এর পাঠক ছিলেন।

দীর্ঘ সময় ধরে পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যারা পাশে ছিলেন তারা কেউ ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক কবি কেউ ছিলেন তরুণ কবি। এইভাবে দুইয়ের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন সেখানে ছিল। পঞ্চাশের কবিতা যেন একটি বিস্তার। বাংলা কাব্যজগতে এইসময় নানান পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে এক বিপুল পাঠকসমাজও গড়ে ওঠে। তরুণতম কবিতা নিয়ে যেমন—'কৃত্তিবাস'এর তরুণ কবিরা সেখানে এক স্পর্ধা দেখিয়েছেন, প্রবীণদের লেখা সেখানে প্রায় গ্রহণ করাই হয়নি। তেমনি 'শতভিষা'য় ছিল—"শিকড় অভিলাষী চৈতন্যের কবিতা।"[৯] 'শতভিষা'র সম্পাদক আলোক সরকার উপলব্ধি করতেন—"আজকের দিনের কবি স্বাধিকারে, সপ্রতিষ্ঠ পটভূমিতে জাগরণকেই আকাঙ্খা করে; বিদেশী কবিদের মতো চৈতন্যের বিনাশে তাদের অভিলাশ নয়।"[১০] যে বিদ্রোহ রবীন্দ্র পরবর্তী নজরুল বা মোহিতলালকে করতে হয়েছে তার কিছু শুভ উদ্দেশ্য ছিল। যৌনতার জয়গান, খিস্তি খেউড়ের ভাষা প্রকাশের সেদিন প্রয়োজন ছিল, তখন সেইটেই ছিল সত্য। তিনি মনে করতেন 'শতভিষা'র দিনগুলোতে সেই বাধা অনুপস্থিত ছিল। প্রতিবাদ করার বিষয় তাদের সঙ্গে ছিলনা। নিজের অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনে তারা ব্যস্ত। তাই চৈতন্যকে জাগ্রত রাখতে হবে যাতে অকারণ সংস্কার গ্রাস করে না ফেলতে পারে। 'শতভিষা'র আরেক সম্পাদক দীপঙ্কর দাশগুপ্ত কবিতা এবং আধুনিকতা নিয়ে অনেক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলতে চান কবিতাকে আধুনিক করে প্রকাশ কম পরিশ্রমসাপেক্ষ। কবিতাকে কবিতা করে গড়ে তুলতে কোনো কাব্যাদর্শ বা আনুষ্ঠানিকতার মোড়কে আচ্ছন্ন করতে হয় না— "কবিতার প্রথম এবং শেষ কথা সে কবিতা।"[১১] 'শতভিষা'য় যারা লিখতেন তাদের রচনার সমালোচনাও 'শতভিষা'র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অরুণকুমার সরকারের 'দূরের আকাশ', নরেশ গুহ, তারাপদ রায়, মনোরঞ্জন রায়ের কবিতা এবং আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর 'যৌবনবাউল' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা রয়েছে।

কবিতা সম্পর্কে, কবিতা কেমন হতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়েও 'শতভিষা'র বিভিন্ন সংকলনে আলোচিত হয়েছে। তার দু-একটি উল্লেখের প্রয়োজন—'শতভিষা'র ঊনত্রিংশ সংখ্যায় আলোকরঞ্জন লিখেছেন—কবিতার স্থির বিষয়ে হৃদয়ের আবেদন আছে, আছে সামাজিকতা থেকে উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা। অকারণ সস্তা, দেহাত্ববাদ, অতিকথন, বিকারোক্তি প্রবণতা সেখানে থাকতে পারে না। অন্তর্লীন না করলে নিজেদের কীভাবে বিব্রত করা যাবে! 'পূর্বরঙ্গে' একেবারে প্রথম

দিকের সংখ্যায় দীপঙ্কর দাশগুপ্ত লিখেছিলেন—"স্পষ্টত কবিতা সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই আমরা আপাতত মর্যাদা দেব, সেটি হল কবিতার রসোত্তীর্ণতা, তা কবিতার বিষয় চাঁদ-ফুল-পাখিই হোক আর মিছিল-ধর্মঘট নিয়েই হোক।"[১২] ষটিংশ সংকলনে দীপঙ্কর দাশগুপ্ত কবিতার যশপ্রার্থী দ্বিতীয় ব্যাক্তি থেকে কোনো কবিকে দূরে রাখতে চান। কারণ তারা ঠিক করেন কবি কোন দশকের। তাই দ্বিতীয় ব্যাক্তির ভালোলাগা না লাগা সম্পূর্ণ আলাদা। কবি নিজের জন্যই কবিতা লেখেন। একটা কবিতা দুরকমভাবে দুটো চৈতন্যকে স্পর্শ করতে পারে। তাই কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কবিতার আধুনিকতা বিষয়ে বিভিন্ন কবিমতকে একত্রিত করা হয়েছে। আলোকরঞ্জন যাকে বলেছেন—"দায়িত্বশীল মন্ময়তা।" সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলা এবং পুরোনো সংস্কারের প্রতি আঘাত—দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই মানুষের এক সামাজিক দায়িত্ববোধ লেখার ক্ষেত্রে যেন কাজ করে। কবি প্রনবেন্দু দাশগুপ্ত—সংস্কারহীনতাকেই আধুনিকতার সংজ্ঞা হিসেবে হিসেবে দেখেছেন। অনেকসময় চিরন্তন হওয়ার কথাও বলেছেন। ১৯৫১-৫২ সালে মানস রায়চৌধুরীর 'উপলব্ধি' আর 'লোকগীতিকা' কবিতাগুলিতে দেখা যায় অনেক বেশি ছন্দের প্রয়োগ এবং সেগুলি পূর্ববর্তী কবিদের অনুসারী কবিতা। কিন্তু প্রতিটি কবিতায় স্বগতোক্তি রয়েছে। পাতার মর্মর, 'পরাণ সঁপা' তার প্রমাণ। কিন্তু পরবর্তী কালে ৬-এর দশকে তাঁর ভাষণ কবিতা, রংগনের চোখ দিয়ে কবিতা পড়লে বোঝা যায় একজন কবির কিভাবে উত্তরণ ঘটেছে। অনেক বেশি পরিণত কিন্তু কোনোভাবেই 'শতভিষা'র কবিতা বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি বেড়িয়েছিল তাঁর আদর্শ নষ্ট হয়নি। 'শূন্যতাই শুষে নেই তোমার বুকের উষ্ণতাকে', এবং 'জলের উপরে ভাসে পদ্মের কুঁড়ির অভিমান', কোথাও গিয়ে প্রেমের সহজতাকেই প্রকাশ করে। অলোকরঞ্জনের 'ধ্বংসাবশেষ' কবিতায় এবং পরবর্তী কালের 'তিনভাগ জলের আগুন' কবিতাটির পারস্পরিক তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে দুটিতেই অনুপ্রাসের অপূর্ব প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু কবিতার ভাষা অনেকাংশে বদলে গেছে 'তিনভাগ জলের আগুন'-এ। কবিতা কোথাও গিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে সমাজের সান্নিধ্যে চলে এসেছে। তিনি যে মননশীল দায়িত্ব পালনের কথা বলেছেন তাঁর কবিতায় তিনি সেই ছাপ রেখেছেন—"বারান্দায় অনেক অতিথি অভ্যর্থনা করে/তারা সবাই যখন ফিরে যাবে/ তুমি একা সঞ্চয়িতা স্মৃতি।" তাহলে 'শতভিষা'র দীর্ঘ ইতিহাস বারংবার তাঁর উদ্দেশ্যকেই প্রতিফলিত করে। তাই 'শতভিষা' 'কৃত্তিবাস'-এর মত তারুণ্যের স্পর্ধা, অ্যালেন গিনসবার্গের প্রভাব সম্পন্ন কবিতার প্রকাশ ঘটাতে পারেনি কিন্তু প্রচুর বিদেশি কবিতা অনুবাদ করেছে। বিদেশি কাব্যচর্চা 'শতভিষা'য় ছিল তাই শতভিষা একটি বিশেষ ভঙ্গি। কবিতা এবং কবিতাভাবনার কাগজ। 'শতভিষা'র উদ্যোগে সাতটি কাব্যনাটক মঞ্চস্থ হয় যেমন, 'উত্তরমেঘ', 'অশথগাছ' কবিরা তাতে অংশগ্রহণ করতেন। এইভাবে সাহিত্যে বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি আধুনিকতা এইসব বিষয় নিয়ে একমাত্র 'শতভিষা' পত্রিকাতেই আলোচনা হত। আলোক সরকার নিজেই 'শতভিষা'র সার্থকতা প্রসঙ্গে বলেছেন 'শতভিষা'র অতিকথন, অমিতকথন অপছন্দের হওয়ায় কোনো কবি 'শতভিষা' থেকে পরবর্তীকালে চলে গিয়েছেন। হৈ হৈ করতে না পারা, বিলিব্যাবস্থার দুর্বলতা, মৃদু উচ্চারণ, 'শতভিষা'র ব্যর্থতা বলে মনে করেছেন। আলোক সরকারের এই বক্তব্যকে অনেক বেশি বিনয়ী মনে হয়েছে। 'শতভিষা' না থাকলে 'কৃত্তিবাস'কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যেত না।

উৎসের সন্ধানে

১. সুরজিৎ ঘোষ, অভিরূপ সরকার সম্পাদিত : 'শতভিষা' রজত জয়ন্তী বর্ষ, শতভিষার পঁচিশ বছর, শ্রাবণ ১৩৮৩, পৃ. ৩৩
২. শঙ্খ ঘোষ : 'এখন সব অলীক', 'আর এক আরম্ভের জন্য', দে'জ পাবলিশিং, শ্রাবণ ১৪০১, পৃ. ১৫২
৩. উৎস-১, পৃ. ৩৪
৪. তদেব : পৃ. ৩৫
৫. তদেব : পৃ. ৩৬
৬. তদেব : পৃ. ৩৬
৭. তদেব : পৃ. ৪১
৮. মুহম্মদ মতিউল্লাহ সম্পাদিত : 'শতভিষা সংকলন', 'বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা', অরুণকুমার সরকার, পৃ. ৪০১
৯. মুহম্মদ মতিউল্লাহ সম্পাদিত : 'শতভিষা সংকলন', 'শিকড় অভিলাষী চৈতন্য', আলোক সরকার, পৃ. ৬৬০
১০. তদেব : পৃ. ৬৬২
১১. মুহম্মদ মতিউল্লাহ সম্পাদিত : 'শতভিষা সংকলন', 'কবিতা : আধুনিক কবিতা', দীপংকর দাশগুপ্ত, পৃ. ৬৬৬
১২. মুহম্মদ মতিউল্লাহ সম্পাদিত : 'শতভিষা সংকলন', 'পূর্বরঙ্গ', দীপংকর দাশগুপ্ত, পৃ. ৬৭